প্রস্তাবনা

আধুনিক মারাঠি উপন্যাসের মধ্যে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তনের কৃতিত্ব শ্রীহরি নারায়ণ আপ্টেকেই দেওয়া হয়ে থাকে। হরি ভাউএর পর প্রায় পঁচাত্তর বৎসরে মারাঠি উপন্যাসের মধ্যে অনেক ব্যাপকতা, অনেক বিচার-বিশ্লেষণের ধারা এসে গেছে। আর এই দিক দিয়ে হরি ভাউ-এর উপন্যাস মারাঠি উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়। এঁর উপন্যাস নূতন দিগ্দর্শনের প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই হরি ভাউ-এর সাহিত্যিক গরিমা শুধু তাঁর যুগেই নয়, বর্তমান যুগেও এঁর প্রভাব অনস্বীকার্য।

মারাঠি সাহিত্যের পরম্পরা প্রাচীন হলেও, মারাঠি উপন্যাসের অভ্যুদয় একশো-সওয়াশো বছরের বেশি নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে মারাঠি ভাষায় গ্রন্থ লেখার প্রয়াস প্রথম শুরু হলেও, মারাঠি উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। বাবা পদমজীর— 'যমুনা পর্যটন' (১৮৫৭) মারাঠি ভাষার প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য হয়। ঐ যুগের তৎকালীন সমস্যাকে বিশদভাবে তুলে ধরে উপন্যাসটি মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। হিন্দু বিধবাদের জীবন এবং নির্যাতিত নারীদের অধঃপতনের করুণ কাহিনী মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করার প্রয়াস ঐ গ্রন্থে দেখা যায়। এই উপন্যাসে ইংরাজী ভাষার শৈলী অনুকরণ করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে খৃস্ট-ধর্মের মহত্বও দেখানো হয়েছে, কারণ বাবা পদমজী স্বয়ং খৃস্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হরি ভাউ-এর পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়দের ভিতর শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী হল্‌বের 'মুক্তা-মালা' নামক উপন্যাসের (১৮৬১) মধ্যে এক গভীর বৈশ্লেষিক চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। মারাঠি উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য উপাদানের মধ্যে বিশেষভাবে পাই— বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, চমৎকার দৃশ্য, শৃঙ্গার, তৎসম শব্দ-শৈলী এবং "সজ্জনের অন্তিম বিজয় ও দুর্জনের পরাজয়।" প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গেই রা. বি. গুঞ্জীকরের 'মোচন-গড়' (১৮৬৭) ঐতিহাসিক উপন্যাসের এক নবতর ধারার প্রবর্তন করে। হরি ভাউ-এর পূর্বের যুগকে বলা

হয় 'মুক্তা-মালা'র যুগ। এ-সব উপন্যাসের মধ্যে কোনও মৌলিকতা ছিল না, ভাবলে ভুল করা হবে। তবু, জীবন ও সাহিত্যকলার দিক থেকে বিচার করলে মারাঠি উপন্যাস তখন এক প্রারম্ভিক অপরিণত অবস্থাতেই ছিল। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই যুগ হরিভাউ-এর যুগের পাদপীঠ ছিল।

হরি ভাউয়ের জন্ম যে যুগে হয়েছিল সে যুগ মহারাষ্ট্রীয়দের জীবনে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির তত্ত্ব-বিচার ও অন্বিষ্ট সাধনার যুগ। ব্যাপকভাবে আর-এক সামাজিক নবচেতনার আন্দোলন তখন শুরু হয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্ত্য সংঘর্ষে সারা ভারতে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রেও এই নবজাগরণের উপযুক্ত বাতাবরণ প্রস্তুত ছিল। এই নব জাগৃতির প্রশস্ত ক্ষেত্রে অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অনেক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রগতিশীল নূতন চেতনার উদ্ভব হয়।

"মধলী স্থিতি" হরি ভাউ-এর প্রথম উপন্যাস। 'পুণে বৈভব' পত্রিকায় ১৮৮৫ সালে ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই মারাঠি পাঠকদের মনে এই উপন্যাসের প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয়ে ওঠে। আসলে তখন তিনি রেনল্ডসের 'গোল্ড লণ্ডন' নামক উপন্যাস অনুবাদ করছিলেন এবং এই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু তাঁকে নূতন উপন্যাস লেখায় প্রণোদিত করে। হরি ভাউ এই উপন্যাসের নাম দেন— 'আজকালচ্যা গোষ্ঠী' অর্থাৎ— আজকালকার কাহিনী। আট-ন'টা আলাদা আলাদা কাহিনী লিখে তাতে নানা ঘটনার মশলা মিশিয়ে রচনা করেন এই উপন্যাস। কিছুদিন বাদে উনি 'করমণুক' নাম দিয়ে ('মনোরঞ্জন', ১৮৯০) এক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর এই উপন্যাসই মুখ্য আকর্ষণের বস্তু ছিল। ১৯১৭, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এই পত্রিকা চলে। ইতিমধ্যে, হরিভাউ তাঁর বাইশটি উপন্যাস, চারটি গল্প-সংগ্রহ, আটটি নাটক আর কিছু আলোচনাত্মক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করেন।

সাহিত্যই ছিল হরিভাউ-এর জীবনে একমাত্র সাধনা। এই অমোঘ

সাহিত্যনিষ্ঠার দ্বারা হরিভাউ মারাঠি উপন্যাসকে অবাস্তব জীবনের চমৎকারিত্বের পরিবেশ থেকে মুক্ত করে বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর দাঁড় করান। তিনি জানতেন পাঠকদের রুচি কোন্ দিকে। তিনি জানতেন মারাঠি সাহিত্যের পরম্পরা অনুযায়ী, পাঠকেরা চায় বৈচিত্র্য, চায় কল্পনার রঙিন বাতাবরণ এবং তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকদের এই চাহিদাও মিটিয়েছিলেন। তৎকালে পাশ্চাত্ত্য ঔপন্যাসিক স্কট ঐতিহাসিক উপন্যাসের আধারে বিচিত্র ও রোমান্টিক সব বিষয়বস্তু আরোপ করে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করছিলেন। শৌর্য, প্রণয়, রহস্য, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি বিষয় দ্বারা আখ্যানবস্তুকে রসায়িত ক'রে হরি ভাউ তাঁর উপন্যাস রচনাতেও বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের শুভারম্ভ করেন। এই-ভাবে হরি ভাউ-এর উপন্যাস মারাঠি পাঠকসমাজের কাছে বিশেষ প্রিয় ও মনোরঞ্জক হয়ে ওঠে। এইভাবেই বিচার-বিশ্লেষণ-প্রধান উপন্যাস-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। 'মুক্তা-মালা' যুগের উপন্যাসের মধ্যে যে বৈচিত্র্য তার থেকে এটা কিছু ভিন্ন প্রকারের। পাঠকদের মনে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি যে আত্মগরিমা ও প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল হরি ভাউ তাকে জাতীয়তা ও স্বাধীনতা বোধের দিকে প্রবাহিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক সামগ্রীর আধারে দেশপ্রেমের ভাবনা অন্তর্প্রবিষ্ট ছিল। তিনি সাহিত্যের মধ্যে সরসতা ও সজীবতা আনার সঙ্গে সঙ্গে মানবোচিত গুণেরও স্থাপনা করেন। সংবাদ এবং তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি, রীতি-নীতি, নারী-সমস্যা ইত্যাদি সব বিষয়ের প্রতি ধ্যান রেখে হরিভাউ নিজের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'রূপনগরচী রাজকন্যা', 'কালকূট' ইত্যাদি সব উপন্যাসগুলির মধ্যে যে ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন তা কেবল মহারাষ্ট্রেরই নয়, মহারাষ্ট্রের বাইরের বাতাবরণকেও স্পর্শ করেছিল। 'উষঃকাল', 'গড আলাপণ সিংহ গেলা', 'বজ্রাঘাত' ইত্যাদি সব ঐতিহাসিক উপন্যাস তৎকালীন পরিবেশকে পরিপূর্ণভাবে চিত্রিত করতে সফল হয়। সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে, এ উপন্যাসগুলি হরি ভাউ-এর অতি উচ্চস্তরের সাহিত্য-সৃষ্টি।

হরিভাউ-এর সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ধ্যান রেখে হরিভাউ তাঁর সাহিত্যিক বিচার-বোধকে কলাত্মক দৃষ্টির দ্বারা প্রতিপাদিত করে গেছেন। হরিভাউ-এর যুগে মারাঠি উপন্যাসে কলাত্মক দৃষ্টি আর সামাজিক জীবন-দৃষ্টি, এ দুটোকে আলাদা ভাবা হত না। জীবনের বিচিত্র পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে এ এক সহজ মাধ্যম ছিল। এই জন্যে হরিভাউয়ের প্রায় সব উপন্যাসে এই দুইটি তত্ত্বের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায়, যার ফলে তৎকালীন সমাজ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে শিল্পিত হয়ে ওঠে।

হরি ভাউ-এর সামাজিক মূল্যবোধ তাঁর 'মধ্‌লী স্থিতি' নামক উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে মারাঠি ভাষীদের হাব-ভাব, আচরণ, চারিত্র্য সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তিনি নিজের উপন্যাস সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন—'আমার উপন্যাসের একজন পাত্রও কাল্পনিক নয়—।' নিজের জীবনে যা গভীরভাবে দেখেছেন, তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অসংখ্য চরিত্রে। প্রত্যেক ভাব ও ব্যক্তিমানসের মূলে পৌঁছতে তাঁর কথাবস্তুর মধ্যে অনেক সময় দীর্ঘ তত্ত্ববিচার এসে পড়ত, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'পণ্‌ লক্ষাং কোণ্‌ ঘেতো' নামক উপন্যাসের নায়িকা যমু আর তার পুত্র সর্বত্র আত্মকথনের ভঙ্গীতে তাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করে চলে, ফলে পাঠকবর্গের মনে হয় তারা যেন কোনো অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিরই আত্মজীবনী পড়ছে।

হরিভাউ-এর উপন্যাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক চিত্র পাওয়া যায়। এঁর লেখায় রাষ্ট্রীয় চেতনার বাস্তব দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'মধ্‌লী স্থিতি' (১৮৮৫) থেকে 'কর্মযোগ' (১৯১৭) পর্যন্ত এক ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে মহারাষ্ট্রীয়দের জীবনে যে চিন্তাধারার পরিবর্তন এসেছিল তার নিদর্শন হরিভাউ-এর উপন্যাসে পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয়

সৈনিকেরা যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে আমাদের আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। ওদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বিশিষ্ট নেতাদের আবির্ভাবে স্বাধীনতা-আন্দোলন আরও বলশালী হয়। এঁদের প্রেরণায় নূতন নূতন দিকে অভিযানের রাস্তা খুলে যায়। নূতন কর্মপ্রণালী নিয়ে আসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ঢেউ। অন্যায় শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিপুল শক্তি জেগে ওঠে। সামন্ততন্ত্র পুঁজিপতি ও বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ভিত নড়িয়ে দেবার অভূতপূর্ব সাহস জাগে। এই নবজাগৃতির আন্দোলনে বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রভাবও যথেষ্ট পড়ে। এইভাবে হরিভাউ-এর উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক রাষ্ট্রীয় জাগরণ, আধ্যাত্মিক ও লৌকিক আদর্শের নানা পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও নূতন মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও শ্রেণীচেতনা— এই সবই তাঁর বিশাল দৃষ্টিকোণের ভিতর এসে মিশেছে। এই বিশাল জীবনপটে আশে-পাশের অনেক ছোটো বড়ো চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে এঁকে গেছেন। এঁর উপন্যাসে এই যুগপ্রভাবের স্পষ্ট ছাপ। অর্থাৎ, বিষয়-নির্বাচন, জীবন-দর্শন ও চিত্রণ-শৈলী— এই তিনটি ক্ষেত্রে এই প্রভাব স্পষ্ট। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের রূপরেখা, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করে গেছেন। পরিবারের মধ্যে নানারকম নূতন নূতন সমস্যা এবং নবজাগৃতির ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি সব বিষয়ের আধারে তাঁর মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন। 'পণ্ লক্ষাত্ কোণ্ ঘেতো' উপন্যাসে পাত্রের করুণা-উদ্রেককারী দৃশ্যে পাঠক নিজের জীবনকেই দেখে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভয়ংকর দিব্য'তে বলবন্ত রাও আর দ্বারকা বাই-এর পুনর্বিবাহ দেখিয়ে পুরাতন সমাজমূল্যবোধের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ ও শেষে সুখী পরিবারের চিত্র এঁকে, লেখক নূতন যুগের অভ্যুদয় বোঝাতে চেয়েছেন। নূতন যুগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন মূল্যবোধকেও আত্মসাৎ করা উচিত। সাধারণ ও শিক্ষিত পরিবারে সুখী জীবনের পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল পর্যাপ্ত শ্রম ও শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই-সব নিয়েই হরিভাউ-এর উপন্যাস।

হরি ভাউ-এর সামাজিক উপন্যাস 'মী' (আমি) ওঁর 'করমনুক' নামক সাপ্তাহিকে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পরে ১৯১৬ সনে গ্রন্থাকারে বের হয়। আত্ম-জীবনী লেখার পদ্ধতি অবলম্বন করে উপন্যাসের নায়ক ভাবানন্দের জীবন কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলেন। এই উপন্যাসে তাঁর সমাজ-সংস্কার ও কলাবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ওঁর বক্তব্য ছিল, উপযুক্ততা ও সৌন্দর্য; এই দুই গুণে এই উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। বিশিষ্টতার এই সংজ্ঞা নূতন সাহিত্যকর্মের ভূমিকা রচনা করে। এই ভূমিকা পুরাতন প্রথা ও রীতি-নীতির প্রচারস্থল না হয়ে, হয়েছিল স্বাধীন চিন্তাধারার পরিবাহক। মহৎ সাহিত্যিকের গুণ হৃদয়ের বিশালতা। এ গুণ হরিভাউ-এর ছিল। ভাবানন্দ, গণপত রাও বা যশবন্ত রাও-এর চরিত্র-চিত্রণে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। হরিভাউএর কল্পনায় ব্যক্তিত্বের রূপ ছিল, এক উচ্চ-শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারকের, প্রচারক ও পথনির্দেশকের। তাই তিনি শুধুমাত্র কলা-কৈবল্যের সাধক না হয়ে আদর্শবাদী লেখকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অপরিণত কাল্পনিক আদর্শবাদ ও উগ্র রাষ্ট্রাভিমানকে জীবনে স্থান দেন নি। তিনি মনের পবিত্রতাকে এক শ্রেষ্ঠতম সাধন বলে মানতেন। তাই তাঁর উপন্যাসের নায়ক চিত্রিত হয় পথ-প্রদর্শক রূপে, যিনি মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলেন এবং সংভাবনারাশির সঞ্চার করেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে, প্রাচীন সমাজের অন্তর্গত কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও দাসসুলভ মনোবৃত্তি একটা সংঘাতের সৃষ্টি করছিল। ভারতীয় জননেতারা জনতার বিপুল শক্তির প্রতি আস্থা রেখে তাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে লেগেছিল উদ্দাম আলোড়নের ঢেউ। নেতাদের সামনে প্রশ্ন এসেছিল, কোন্ পরিবর্তন আগে হওয়া উচিত— রাষ্ট্রীয় না সামাজিক ? লোকমান্য তিলক ও সমাজসেবী আগরকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র এক নূতন দিকে মোড় নিচ্ছিল। এই সময় হরিভাউ-এর উপন্যাসে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সমাজ-সংস্কারবাদী আন্দোলনের চিত্র

পাঠকদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। হরিভাউ-এর উপন্যাসের দুই চরিত্র গোবিন্দরাও ও কাশীতাই কানিট্‌কর তৎকালীন সুশিক্ষিত পরিমার্জিত সংস্কারবাদী মনোবৃত্তির প্রতীকরূপে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক গণপৎ রাও পাশ্চাত্ত্য লেখক মিল্‌ ও স্পেন্‌সারের একজন নিষ্ঠাবান পাঠক এবং মিল্‌-এর গ্রন্থ স্পর্শ করে তিনি নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করেন। ম্যাজিনির জীবনচরিত-এর পাঠক যশবন্ত রাও হয়ে পড়লেন রাষ্ট্রীয় সংস্কারকের প্রতিনিধি। ভাবানন্দের ব্যক্তিচরিত্রে, গণপৎ রাও ও যশবন্ত রাও-এর ভাবাদর্শ মিশে গেছে। ভাবানন্দের জীবনতত্ত্ব সর্বাঙ্গীণ সংস্কারবাদের ভিত্তি রচনা করে। ভাবানন্দের চরিত্র চিত্রণে আধ্যাত্মিক বিকাশের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সনাতন ধর্মের অন্তর্গত ত্যাগের সংস্কারও হরিভাউ-এর মধ্যে ছিল, যা ভাবানন্দের চরিত্রেও অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

ভাবানন্দের মঠ-স্থাপনের পরিকল্পনা অবাস্তব বা অব্যাবহারিক না হয়ে, কোনও সমাজ প্রগতিবাদী, ত্যাগী ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তির প্রসঙ্গেই এসেছিল। হরিভাউ-এর অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখলের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ভারত সেবক সমাজ'-এর স্থাপনা হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে রাজনীতিক, সামাজিক ও মানসিক জাগৃতির প্রচেষ্টা চলে। এই ভাবাদর্শ ভাবানন্দের মঠস্থাপনার পিছনে ছিল। এটা সত্যি যে, সাহিত্যস্রষ্টারা যুগদ্রষ্টা হয়ে থাকেন এবং হরিভাউ-এর ক্ষেত্রে এ সত্য উপলব্ধ হয়। হরিভাউ-এর যথার্থ্যবাদ এক বিশেষ আদর্শ ও সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে চলেছিল।

আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তাঁর উপন্যাসের এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুধু জীবনের সমস্যাকেই উপস্থাপিত করতেন না। পরন্তু গোটা জীবনটাকে এনে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। সেইজন্যে তাঁর উপন্যাসের পাত্র মুখ্য হোক বা গৌণ হোক, তারা তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করত। ওঁর কথাবস্তু ছোটোখাটো ঘরোয়া পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিকে নিয়ে এগিয়ে চলে। ওঁর উপন্যাসের পাত্রদের পরিবার

সাধারণত বড়ো হয়ে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখানো যায়, তাঁর 'পণ লক্ষাৎ কোণ ঘেতো' নামক উপন্যাসে সব মিলিয়ে প্রায় একান্ন জন পাত্র-পাত্রীর ভিড়। 'মী' উপন্যাসেও মোট সাতাশ জন পাত্র-পাত্রী আছে। হরিভাউ এই উপন্যাসে হৃদয়ের সমস্ত মমতা ঢেলে অত্যন্ত স্বাভাবিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে চরিত্রগুলি এঁকেছেন।

ভাবানন্দের প্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হত। ভাবানন্দের শৈশবকাল থেকে— অর্থাৎ যখন সকলে তাকে ভাউ বলে ডাকত— তখন থেকে নিয়ে একবারে অন্তিমকাল পর্যন্ত একটানা তার জীবনপট অঙ্কিত হয়েছে। এই জীবন-পটে ভারতবর্ষের ক্রম-পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির চিত্রণও পাওয়া যায়। ইংরাজের শাসনে ভারত স্বকীয় জাতীয়তা প্রায় ভুলতে বসেছিল। এই পরিস্থিতিতে ভাবানন্দ দেশভক্তি ও স্বাধীনতার ধ্যান হৃদয়ে রেখে গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে এই পুণ্য কর্মে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিল।

রাওজীর মতো খামখেয়ালী লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবনে ওঁর স্ত্রী সুখী ছিলেন না। ওঁর স্ত্রী অর্থাৎ ভাউ-এর মা নিজের মেয়েকে এক আধা-বয়সী ব্যসনাসক্ত লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। যদি শিবরাম পন্থের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন তা হলে ভাউ-এর ভগ্নীর জীবন হয়তো বদলে যেত। হরিভাউ এখানে পুরাতন-পন্থী রুগ্ণ নারী-সমাজেরই বর্ণনা করেছেন। এরপর হরিভাউ নিজের ভগ্নী তাই-এর করুণ জীবন হৃদয়ে অনুভব করে তাকে তেজস্বিনী নারী-সংস্কারবাদী এক মহিলার চরিত্রে পরিবর্তিত করেছিলেন।

এমনিতে, হরিভাউ এই উপন্যাসে প্রণয়-ঘটিত শৃঙ্গার রসের অবতারণা করতে পারতেন কিন্তু তা না করে, তিনি ভাউ-এর জীবনের সান্নিধ্যে এসে পড়া সুন্দরীর সংযমপূর্ণ জীবনযাত্রা চিত্রিত করে উপন্যাসের বাতাবরণ শুদ্ধ ও স্বাভাবিক রাখবার পূর্ণ প্রয়াস করেন। দেখা যায়, আড়াই-তিন বছরের বালিকা সুন্দরী প্রথম দর্শনেই ভাউকে, শিশুসুলভ নিষ্পাপ মনে আধো-আধো ভাষায় স্বামী বলে ডেকেছিল আর তখন থেকেই তা ভাউ-এর

ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হরিভাউ সুন্দরীর এই বালিকাসুলভ স্বভাবের দিকটা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরে সুন্দরীর জীবনের স্থায়ী পরিণতি আসে প্রেম-মুগ্ধা নায়িকা রূপে। নানা ভাবে হরিভাউ এই অব্যক্ত প্রেমকে চিত্রায়িত করেছেন। এই চরিত্রে একাধারে, সংযম, গাম্ভীর্য, কলা প্রেম শিক্ষা-প্রেম ও হৃদয়-উৎসারিত স্নেহের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

একটু বিলম্বের জন্য সুন্দরীর সঙ্গে ভাউ-এর বিবাহযোগ বিঘ্নিত হয়। হরিভাউএর মতে এটা নিয়তি-নির্দিষ্ট। অপর দিকে পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও শিবরাম পন্থ ওকে সমাজ-সেবিকা রূপে তৈরি করতে সক্ষম হন নি। অথচ সুন্দরীর সান্নিধ্যে এসে তাই—অর্থাৎ ভাউ-এর ভগ্নী সমাজ-সেবার কাজ অধিক পরিশ্রমের সঙ্গে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদক্ষ শিল্পীর মুনসিয়ানায় হরিভাউ দেখিয়েছেন—যে সকলে, প্রসন্ন পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও আদর্শকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করতে পারে না। সুন্দরীকে বিবাহ না করে ভাউ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এটাই ওঁর ব্যক্তিত্বের এক বিশিষ্ট রূপরেখা।

ভাউ-এর আদর্শবাদে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ ছিল, যার উপাদান ছিল করুণা ও প্রেম। এই তার স্বভাবধর্ম। মা, দিদিমা, খুড়িমার জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। এঁদের সান্নিধ্যে এসে এবং প্রচুর মারপিট সহ্য করে ভাউ বড়ো হয়, পড়াশুনা করে এবং শেষে উকিল হয়। শিবরাম পন্থ ছিলেন ওর গুরু, পথপ্রদর্শক এবং সুন্দরী ছিল ওর আদর্শবাদী জীবনের প্রেরণা। ভাউ থেকে ভাবানন্দ হতে হতে এর জীবন ফুলের পাপড়ির মতো সৌন্দর্যে নিটোল হয়ে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

ভাবানন্দের হঠাৎ মৃত্যু এই উপন্যাসে স্বাভাবিকতা এনে দেয়। তখন, তৎকালীন এমনই পরিস্থিতি ছিল, যে বড়ো বড়ো চিন্তা-নায়কদের সমাজ-সংস্কারের কাজ একলাই করতে গিয়ে প্রচুর শক্তিক্ষয় হত। ফলে শীঘ্রই তাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। ভাবা-নন্দের চরিত্রের এই হল ভিত্তিভূমি। ওকে অসাধারণ ব্যক্তিরূপে গণ্য করা যেতে পারে। পরিশেষে রামানন্দ ভাবানন্দের চরিত্রের

ব্যাখ্যান করতে গিয়ে তার অলৌকিকত্বের দিক তুলে ধরেন, যা ছিল যুগোন্নয়নের ও নবজাগৃতির। ন্যায় ও সত্যপন্থী ভাবানন্দের দৃষ্টি তার আদর্শের প্রতি কতখানি একাগ্র ছিল, তা লেখক তাঁর অনবদ্য সাহিত্য-কৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন।

এই উপন্যাসের রচনার ক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের নূতন রূপ, নূতন সমস্যা সামনে এসে পড়ে। এই নূতন জীবনতথ্যের অভিব্যক্তির জন্য লেখক কোথাও কোথাও নূতন গদ্য-শৈলীর অবতারণা করেছেন। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনায় হরিভাউ সাধারণ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। সংবাদ শৈলীর নূতন প্রয়োগ ও বক্তব্যের মধ্যে নূতন ভঙ্গী হরিভাউ উপন্যাস রচনার মধ্যে এনেছিলেন। আবার কোথাও উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন অসাধারণত্বের প্রয়োগ, যেমন ধরা যেতে পারে খামের রহস্যের অবতারণা। কোথাও বা তাঁর বর্ণনাশৈলীর মধ্যে রুচি বিগর্হিত কিছু কিছু জিনিস ঢুকে পড়েছে, তবে তা খুবই গৌণ। কথাবস্তু ও চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে স্বাভাবিকতার প্রয়োগ হরিভাউ-এর সাহিত্য-কৃতির বৈশিষ্ট্য।

কল্পনাশ্রয়ী অদ্ভুত বাতাবরণ থেকে বাস্তবানুগ বাতাবরণ পর্যন্ত হরিভাউ-এর সাহিত্যকৃতির চিত্রপট বিস্তৃত। জীবনকে সম্পূর্ণতায় দেখবার প্রয়াস এবং তাকে সুনিয়োজিত কথা দ্বারা অনবদ্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতার গুণে মারাঠি সাহিত্যে হরিভাউ-এর বিশিষ্ট স্থান ও এই তাঁর বিশিষ্ট অবদান।

অনন্ত কাণেকর

দরজায় তালা

আমি কে? এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য নিজের পুরো আত্ম-জীবনীটাই লিখে ফেলব ভেবেছিলাম। আমার এই আত্মকাহিনীর শ্রোতাদের কাছে নিবেদন, আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে বিব্রত করবেন না। সাধারণতঃ বলা হয়, আত্মকাহিনী বড় বড় সব লোকদের নিয়েই লেখা হয়ে থাকে। বড় অবশ্য অনেক রকম ভাবে হওয়া যায়—যেমন, আপন কুল-গৌরবে কেউ বড়। কেউ-বা দেশ সেবা করে বা পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করে মহৎ বলে গণ্য। আবার অনেক দুরাচার কুকীর্তি ও নৃশংস কাজ করে লোকসমাজে কুখ্যাত হয়েও বড় বলে গণ্য হয়েছে। আমার অবশ্য কোনো কুল-গৌরব নেই। শীলে বা চরিত্রে বড় কি ছোট, তাও জানি না। সেইজন্য আমার জীবন-কাহিনী লেখা আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা তাও জানি না। তা ছাড়া এখন থেকেই যদি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা ফাঁস করে দিই তা হলে যাদুর রহস্য দর্শকদের জানা হয়ে গেলে যাদুকরের যা অবস্থা হয় আমারও তাই হবে। অনাবৃতরহস্য যাদুকরের যাদুর মত আমার আত্মকাহিনীও নীরস হয়ে পড়বে। সেইজন্য আমি দেশসেবা করেছিলুম কি না, বা পরোপকার করেছিলুম কি না, বা এ দুটোর কিছুই করি নি, ইত্যাদি সব কথার ফেরে আপনাদের ফেলতে চাই না। কথায় বলে, তালা লাগানো সিন্দুক দেড় লাখ টাকার। তাই আমি আত্মকাহিনী কেন লিখছি জানাতে চাই না। আমার এই চরিত্র পাঠের পর আপনারা আমাকে বড় বলুন বা ছোট বলুন তাতে কিছু আমার এসে যায় না। আমার তরফ থেকে আমার দ্বারা যা-কিছু ভাল কাজ বা মন্দ কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সবই নির্বিচারে হুবহু জানানো আমার কর্তব্য। আর এই কর্তব্য আমি ভাল ভাবেই পালন করব। আপনাদের নিন্দা বা প্রশংসা আমার পক্ষে সবই সমান।

আট বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার শৈশব কিভাবে কেটেছে আমার স্মরণ নেই। তবে কিছু কিছু কথা স্পষ্টভাবে মনে পড়ে। স্মৃতি থেকে যা বলতে বসেছি তা সব যথাযথই ঘটেছিল, না তাতে কিছুটা

কল্পনার রঙ চড়ানো হয়েছিল তা বলতে পারি না। কিন্তু এই ধরনের বাক্যজাল বিস্তার করে আর লাভ কি? সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতি যা আমার মনে আছে, তাই প্রথমে বলে আমার আত্মকথা আরম্ভ করছি। লোকমুখে যে-সব কথা শুনেছিলাম সে-সবও আপনাদের কাছে যথা-সময়ে নিবেদন করব।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে, একদিন এক বুড়ীর সঙ্গে কোনও এক জায়গা থেকে যাত্রা করে বোরীবন্দর স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। সে-সব দিনে বোরীবন্দর স্টেশন আজকের মত ছিল না। তখন সেখানে একটা খুব লম্বা বহুছিদ্র-সমন্বিত কাঠের প্ল্যাটফর্ম ছিল। আমরা প্ল্যাটফর্মের একদিকে নেমে ঠিক উল্‌টো দিকে টিকিটগুলো দেবার জন্য যাচ্ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আর একজন লোক ছিলেন— মনে হচ্ছিল তাঁর গায়ের কালো আচ্‌কানের চেয়ে তাঁর রঙ কালো। এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে আর-একজন তরুণীও ছিলেন। আমি সেই বুড়ীর আঙুল ধরে কতকগুলি ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ ইংরাজ মহিলাদের দেখছিলাম, বিশেষ করে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে ওঁদের পরিহিত ফ্রকের দিকেই তাকিয়ে দেখছিলাম। এমন সময় সেই কৃষ্ণকায় লোকটি বুড়ীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—"রাওজী খুব আশ্চর্য হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তিনি আমাকে বার বার বলে দিয়েছিলেন যে ঘরের লোককে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো না— আর আজ তো আমরা একেবারে তাঁর সাক্ষাতেই গিয়ে হাজির হব। দেখে আবার হকচকিয়ে না যান।" শুনে বুড়ী বলল—"না না, তা হবেন কেন? আরে বাবা, আজ ছয় সাল হল, তা তোমার গিয়ে, সাত সালও বলতে পারো— দু-ছত্তর চিঠি লিখে যে তাঁর স্ত্রীর খবর করবেন, তাই বা হল কই? আমি এমন কী পাপ করেছি বাবা আর ও বেচারীই বা কী এমন নৃশংস কাজ করে বসেছে? আজ সাত সাল হতে চলল, নিজের থেকে একটা চিঠিও লেখে নি। আমাদের কাছ থেকে অন্তত শতাবধি চিঠি গেছে, তা সব চিঠিরই এক উত্তর—"খুব শীঘ্রই আমি আসছি এই একটু কাজে···তা সেও শেষ হল বলে—এইরকম একটা কিছু লিখত···।" বুড়ী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, মাঝখান থেকে ঐ কালো লোকটা বলে উঠল—"আরে

যেতে দিন, এখন তো আপনারা সব এসেই পড়েছেন। নাতীটিকেও সঙ্গে এনেছেন। মেয়েও সঙ্গে রয়েছে। এদের সব দেখেশুনে ওঁর মনে আবার মায়া-মমতা ফিরে আসবে আর আবার তিনি···।"

ওই কালো লোকটার কথা মুখেই রয়ে গেল। ততক্ষণে আমরা টিকিট দেবার জায়গায় পৌঁছে গেছি। লোকটা কথায় এত মশগুল হয়ে গিয়েছিল যে, গোরা চেকার ছোকরাটা যদি তার কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে "টিকিট দেখাও" না বলত তা হলে হয়তো টিকিট না দেখিয়েই বাইরে চলে আসত। চটেমটে কালো লোকটা সেই টিকিটওয়ালা ছোকরার দিকে তাকাল। কিন্তু ও তাকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

তখন সে আবার বুড়ীকে বলল, "দেখলেন তো এই-সব ট্যাঁশ ফিরিঙ্গী ছোকরাদের বেতরিবৎপনা— একটুও যদি ভদ্রতা জ্ঞান থাকে—।" বুড়ীও লোকটার কথায় সায় দিল। ততক্ষণে আমরা স্টেশনের পুরোনো সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে পৌঁছে গেছি। আমি পরমানন্দে আঙুল চুষতে লেগে গেলাম। স্টেশনের বাইরে লোক জনদের প্রচণ্ড কোলাহল, গাড়ীঘোড়ার ভিড় এদিক-ওদিক তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে মশগুল হয়ে দেখতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার হাতের ওপর এমন প্রচণ্ড জোরে এক চাপড় এসে পড়ল যে কী বলব। যে হাতের ওপর এই আঘাতটা এসে পড়ল এবং যে হাত এই আঘাত করল তারাই কেবল জানল এর মর্মটা কি! আর শুধু চাপড়ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে 'এই কেলে ছেলেটা! তোমায় বার বার বলেছি ঐ রকম করে আঙুল চুষবে না। জন্মে ইস্তক তোমার এই লক্ষ্মীছাড়ার দশা!' এই রকম ক্রোধান্বিত কিছু গালিগালাজও শোনা গেল তরুণীটির মুখ থেকে। সেই সময় তার চেহারার মধ্যে প্রচণ্ড রোষ ও মানসিক যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছিল। আচমকা ঐ চাপড়টা পড়াতে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আঘাতটা লেগেছিল আমার হাতের নরম রগটার ওপর। ফলে অসম্ভব যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলাম। এতক্ষণ ঐ বুড়ীটা বোম্বাই শহরের ভিড় দেখতে ব্যস্ত ছিল। আমার দিকে চোখ পড়াতে ঐ তরুণী

স্ত্রীলোকটিকে বলল—"আরে, ছাখ কাণ্ড! তোর মনে কি দয়ামায়া একটুও নেই। কী করেছে ও বেচারী, যে তাকে অমন জোরে চাপড় মারলে?"

"ঠিক হয়েছে! ওই কেলেটার উচিত শাস্তিই হয়েছে। ব্যাটা জন্মে অবধি আজ পর্যন্ত সুখের মুখ দেখল না—শালা হতভাগা—!" এই রকম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবার পর তরুণীটি আবার একবার চাপড় মারতে উঠে আমার গালটা এমন ভাবে মুচড়ে দিল, যে কী বলব! বুড়ীটা এক ঝটকায় তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে বলল—"ওরে চাঁড়ালনী, ওর জন্ম দিয়েছিলি কি করতে? সারাটা সময় ছেলেটাকে খুঁড়ছে দেখ না— ওর কী দোষ, নিজের পোড়া কপালের দোষ দে—।" এখন বোধহয় আর বলে দিতে হবে না, ঐ তরুণী স্ত্রীলোকটি আমার কে হয়। বুড়ীর ঐ কথা শুনে তরুণীটি উত্তরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল— এমন সময়, কিছু দূর থেকে, একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে এসে সেই কালো লোকটি হাজির হল, বললে—

"হ্যাঁ, চলুন এবার, গরুর গাড়ী ঠিক করে এনেছি, তাড়াতাড়ি ভেতরে উঠে বসুন। আমরা হঠাৎ রাওজীর ওখানে গিয়ে হাজির হলে, রাওজী কী বলবেন, এই ভেবেই মনটা বেশ খুশীতে ভরে উঠছে। কি করব দিদিমা, আমি হয়ত এতটা গরজ দেখাতাম না, কিন্তু ওর দুরবস্থা তো চোখে দেখা যায় না। সেইজন্যে মনে করলাম, এমনিতে আপনাদের গ্রামে আমার যাবার কথা ছিল, তাই আপনাদের সম্মতি নিয়ে, ভাবলাম সকলকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাই। আমাকে আমার স্নেহ-ধর্মের অনুশাসন তো মানতেই হবে। সত্যি, এমন সুন্দর একটা সংসার থাকতে তাকে কি ভাঙতে দেওয়া যায়? দেখুন না আট দিনের মধ্যে আপনাদের সংসার কেমন শ্রী-সম্পন্ন করে তুলি।" এই-সব কথা চলছিল যখন লোকটা আমার মাকে আর বুড়ীকে হাত ধরে গাড়ীতে ওঠাচ্ছিল তার পর আমাকে ঐ দুজনের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে বলল—"বাঃ বেশ সুন্দর ছেলেটি—আমার তো খুব ভাল লাগেই" বলতে বলতে গরুর গাড়ীর সামনের

এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। ততক্ষণে গাড়োয়ান বলদ দুটোর পেটে পা দিয়ে গুঁতো মেরে ল্যাজ মলতে মলতে মুখে হিস্ হিস্ শব্দ করে চলবার ইশারা হিসাবে দুই বলদের পিঠে লাঠির বাড়ি মারল। গাড়ি চলতে সুরু করল। আর বলদ দুটোর গলায় বাঁধা ঘুঙুরগুচ্ছ গাড়ি চলার ছন্দে তালে তালে বাজতে লাগল। বলদ দুটোও যেন ঘুঙুরের বাজনার পায়ে-আপন পথ ধরে চলতে লাগল। এর পর ঐ লোকটির কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। তার সঙ্গে আমার আত্মপ্রশস্তির যে প্রসঙ্গ চলছিল তাও সমাপ্ত হল। অনেকক্ষণ ধরে কেউ আর কথাবার্তা বলে নি, সকলেই পরস্পরের দিকে চেয়ে ছিল। আমি শুধু এধার ওধার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ঐ লোকটি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন সময় সে দিদিমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল, "আজকাল রাওজীর স্বভাবেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার বিশ্বাস, মানুষ যদি আবার সংসারের কর্তব্যে মন বসায় তা হলে সব-কিছু ভুলে যেতে পারে—।"

"আরে বাবা, সংসার মানে কি? ·· ও কি সংসার গেরস্তী করছিল না? খুব করছিল। নিজের হাতে নিজের সংসারটা নষ্ট করে দিলে আর কে কী করতে পারে? কত ভাল চাকরী করত। নিজেই..."

"লোকটা খুবই তেজী স্বভাবের। ওর চাকরী ও যে কোনো সময়ে জোটাতে পারে। যদি মনে করে চার দিনের মধ্যেই ঐ চাকরী···কিন্তু···"

"ঐ 'কিন্তু'ই হয়েছে কাল— সব জায়গায় বাধার সৃষ্টি করেছে।"

"কিন্তু লোকটা কিরকম? কিছু বলবার নেই। আমার জানাশোনা আলাপী আড্ডার মধ্যে এরকম লোক একটাও নেই যে ওর এই দুরবস্থা দেখে দুঃখিত না হয়েছে। চাকরী দেবার জন্য কত লোক ওর পিছনে লাগত। কিন্তু ওর ঐ এক কথা—"চাকরীর কথা ছেড়ে অন্য কিছু বলবার থাকে তো বলুন— ।"

"হ্যাঁ এই তো মহৎ লোকের উপযুক্ত। আমি এখন আর তো কিছু বলছি না— এখন এ আমার ঘরে কতদিন থাকবে আপনিই

বলুন ! ওর মনের কী অবস্থা একবার বুঝুন— এক ফোঁটা দানাও মুখে দেয় নি মেয়েটি। সারাদিন মনের মধ্যে হাহুতাশ। কী করবে বেচারী ?"

"হ্যাঁ, সত্যি কথা, কী করবে বেচারী ? কিন্তু এখন ও-সব চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিন। আপনি দেখে নিন, আমি সব বন্দোবস্ত এমন করব, যে ঠিক প্রথমে যেরকম গৃহস্থালি চলছিল সেই রকমই আবার সব হবে। আমার সমাজমণ্ডলীর মধ্যে এই কথা পাকা হয়েছে, যে ওর এই দুরবস্থা থেকে ওকে টেনে তুলতেই হবে। না বাবা, মানুষটা যদি মূর্খ হত, পাজী বাউণ্ডুলে হত তা হলেও না-হয় কথা ছিল। কী মানুষ ! খুঁজে দেখুন এমন আর পাবেন না—এ লাখের মধ্যে এক। কিরকম বুদ্ধিমান, কত সরল সাদাসিদে, কত স্নেহশীল। কর্মে কত উৎসাহ। কিন্তু এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এমন কী করে হল ? ওর মগজের মধ্যে এই সব ছাই মাথা কি করে ঢুকেছে জানি না। যাক গে, যেতে দিন— যা হয়েছে তা নিয়ে আর বাদবিসম্বাদের দরকার কি ! এখন সামনের কথা ভাবা যাক।"

ঐ লোকটি যেমন যেমন রাওজীর প্রশংসার সেতু রচনা করে চলেছিল আমার মার মনে দুঃখের বেগও বেড়ে যেতে লাগল। জানি না, ওঁর পুরনো স্মৃতি মনে আসছিল, না অন্য কিছু। দিদিমাও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন কিন্তু নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। ঐ লোকটির বাক্যস্রোত চলতেই লাগল। মাঝে মাঝে থেমে বিশেষ বিশেষ দেখবার জায়গাগুলো দেখাচ্ছিল—এই বাড়ীটা অমুক কারণে বানানো হয়েছিল। এই বাড়ীটা তৈরী করতে লাখ টাকা খরচ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কথা বলতে লাগল। এরই মধ্যে কোন্ জিনিসের কত দাম—এ সব খবরও দিতে লাগল এবং ঘুরে ফিরে আবার রাওজীর প্রসঙ্গেই এসে পড়ে। এই রকমভাবে গরুর গাড়ী চড়ে যেতে যেতে গরুর গলার ঘুঙুরের একটানা আওয়াজে আমার ঢুলুনি আসছিল। এর মধ্যে আবার শুনতে পেলাম—"আরে এই তো স্রেফ্ দশ-পনর দিন আগে রাওজী আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, তখন

আমার মার সঙ্গে কথাবার্তা হল যে আমার ছেলের উপনয়ন সংস্কার কবে ও কোথায় দেওয়া হবে ? তখন আমার মা রাওজীকে বললেন যে আপনার ছেলেরও তো উপনয়ন সংস্কারের বয়স হয়েছে। একদিন ওকে আনিয়ে উপনয়ন সংস্কার করিয়ে দিন। তখন রাওজী যেন একটু গরম হয়েই বললেন-- আরে বাবা, কিছুদিন একটু চুপ করে থাকুন। আমার গ্রহ এখন প্রতিকূল। শনির দৃষ্টির সাড়েসাত মাসের আর অল্প কয়েকদিন রয়ে গেছে— এটা হয়ে যাবার পর··· আমার আবার দশ পাঁচ হাজার টাকাও পাবার কথা আছে। আপনারা মনে করেন আমি কিছু কাজ না করে এমনি বেকার বসে আছি। মশায় তা নয়। একটু আমার গ্রহটা অনুকূল হতে দিন তারপর দেখবেন কি হয়—মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতা, বোম্বাইতে এমন সমারোহের সঙ্গে করব যে···।" শুনে আমরা সব হেসে উঠেছিলাম। ওঁর উৎসাহ সত্যি খুব প্রশংসনীয়।

"এমন কী কাজ আছে যে একেবারে, দশ হাজার পেয়ে যাবে ?" দিদিমা তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু লোকটি নিজের মনেই হেসে বললে—"আমিও এই প্রশ্নই করেছিলাম কিন্তু উত্তর মেলে নি।" আমার উপনয়ন সংস্কার খুব জাঁকজমক সহকারে হবে, সেই খুশীতে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর কল্পনার জাল বুনতে লাগলাম। সেবার প্রথম আমি বোম্বাই শহর দেখলাম সে জন্য বোম্বাইএর গ্যাসের বাতির জৌলুস ঠাটবাট সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকলেও নিজের গ্রাম-দেশে যা আমি উপনয়ন সংস্কার উপলক্ষে দেখেছি, তাই কল্পনা করে কিছুক্ষণ সুখস্বপ্নে কাটালুম।

এমন সময় আমাদের গাড়ী একটা তিনতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। ঐ বাড়ীটা রেল গাড়ীর মত লম্বা দেখতে। দেখলাম অনেক বাসিন্দায় ভর্তি। বাপ রে! এত লম্বা বাড়ী কখনও এর আগে দেখি নি। এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সব নিচে নেবে গেল। আমাকে যে কখন লোকটি গাড়ী থেকে নাবিয়ে নিল টেরই পেলাম না। এতই

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ঐ লম্বা বাড়ীটা দেখতে মশ্গুল হয়ে গিয়েছিলাম। শেষে ঐ কালো লোকটি হাত ধরে বলল "চলো রাজশ্রী, চলো তোমার বাপের কাছে— এর আগে কি কখনও তাঁকে দেখেছ?" এই সব কথা বলতে বলতে আমাকে ঐ লম্বা-চওড়া বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। আমাদের পিছনে মা আর দিদিমাও নিজেদের বোঁচকা নিয়ে আসতে লাগলেন। আমি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। দেখলাম প্রথম তলাটা যেমন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাটাও ঠিক তেমনি। ভেবেছিলাম এখনও বুঝি উপরে এসে পৌছই নি, তবে পা দিয়ে মালুম করলাম কোথায় পৌছেছি। তিন তলায় পৌছাবার পর ঐ লোকটি হাসতে হাসতে হাঁক দিল— 'রাওজী, ও রাওজী, আপনার পরিবারের লোকজন সব এসে গেছেন। এই দেখুন চিরঞ্জীব!" কিন্তু রাওজীর তরফ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আমরা তালা লাগানো এক ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। এই দেখে ঐ লোকটি খুব আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল —"অ্যা! এ কী ব্যাপার? দরজায় তালা? তালা লাগিয়ে কোথাও চলে গেছে না কি?" মা আর দিদিমাও ততক্ষণে এসে পৌঁছেছেন। তখন লোকটি খুব লজ্জিত হয়ে বলল "মনে হচ্ছে বাইরে কোথাও গেছে। এখনই এসে পড়বে। ততক্ষণ আমার ঘরে চলুন।" এমন সময় সামনের থেকে দু-তিনটে ছেলে 'বাবা! বাবা!' বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে এল আর তাদের বাবাও তার জবাব দিল। ছেলেদের ঐ রকম আনন্দ করতে দেখে ও তাদের পিতার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দেখে মনে হল আমিও রাওজীর কোমর জড়িয়ে ধরে আনন্দ করতে পারতাম। আর উনিও আমাকে দেখে বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারতেন। কিন্তু আমি রাওজীকে বেশী দেখিনি। হয়ত লোকেদের উৎসাহে ও রাওজীর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে ওর কাছে যেতে সাহস পেতাম। কিন্তু এই সময় রাওজী ঘরে তালা লাগিয়ে কোথায় চলে গেলেন জানি না।

রাওজীর ঘরে তালা দেখে লোকটি খুব নিরাশ হল। দিদিমা

আর মায়ের অবস্থা তো ওর চেয়েও (আরো খারাপ, বিশেষ করে মায়ের অবস্থা) খুবই করুণ হয়ে পড়েছিল। চোখের জল ঝেপে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবু মা প্রচণ্ড ধৈর্যে বোধহয় খানিকটা জেদের বশেই, চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আমি বার বার ভাবছি ঐ সময় ও'র চেহারাটা কী রকম দেখতে হয়েছিল।

'নানা'র কথায় আমরা সব ওর ঘরেই চললাম। শেষ-বেশ যাবই বা কোথায় ? আমার সমস্ত ধ্যান, অভিনিবেশ রাওজীয় ঘরের দিকেই ছিল। রাওজীর আসার অপেক্ষায় সব ছিলাম। খাওয়া -দাওয়াও ভরপেট হয়েছে। আমি তো, যা থাকে কুল কপালে, বলে সবচেয়ে বেশী খেয়ে ফেলেছি। মা তো একটি দানাও মুখে তোলেন নি। দিদিমার অবস্থাও তাই। গোযানের এই সফরজনিত ক্লান্তি আমাকে ঘিরে ধরল আর চট্ করে ঘুমিয়েও পড়লাম। আমি কোথায় শুয়েছিলাম, কখন শুয়েছিলাম কিছুই জানি না। ঘুমের ভিতর আমি মিষ্টি সব স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিছু দুঃখের স্বপ্নও হয়ত দেখে থাকব। ঠিক মনে নেই। আবার এও হতে পারে রাওজীকেই হয়ত দেখেছি, কিন্তু মনে নেই হয়তো স্বপ্নে দেখেছি।

ভোরের দিকে ঘুম পাতলা হয়ে এল। অভ্যাস অনুযায়ী হাতড়ে হাতড়ে দেখছিলাম দিদিমার পাশে আমি আছি কিনা। আমি যে নিজের ঘরে নেই, শুয়ে আছি বোম্বাইয়ের এক রেলগাড়ির মত লম্বা বিরাট বাড়ীর তৃতীয় তলার এক ছোট ঘরের মধ্যে সেটা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

চারদিকে আমি হাতড়াতে লাগলাম কিন্তু এক ঘরের মেঝে ছাড়া আর কিছুই আমার হাতে ঠেকল না। সারা শরীরটার নিচে খালি মেঝের মাটিটাই ছিল আর এটা অনুভব করে ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম 'আরে কেউ এসো, কাছে এসো' বলে কান্না শুরু করতে গিয়েছিলাম কিন্তু কানে এল বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কেউ বলছেন "কেন, আসবে কেন ? আমার সারা জন্ম এই করেই নষ্ট হয়ে যাবে" —ইত্যাদি। এই শব্দ শুনতেই আমি একদম চুপ হয়ে গেলাম। আমার ক্রন্দনাবেগ একেবারে চলে গেল। দিদিমা মাকে সান্ত্বনা

দেবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু মা একই কথা ঘুরেফিরে বলতে লাগলেন। আমি নিজের কান্না ভুলেই গেলাম। কিন্তু আমার এই বয়সে রাত্রে একলা ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে বেশ ঠাণ্ডা লেগেছিল। নিজের কান্নার বেগ কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। আমি মাকে দেখে ভয় পেতাম। তাই দিদিমার উদ্দেশেই জোরে আওয়াজ করলাম। দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠলেন "আরে ও মেয়েটা, ঘুমের মধ্যে ছেলেটা মাটিতে এসে যায় কি করে? কিরকম বিশ্রী অভ্যাস বল তো? আয় কোথায় গেলি বাবা?"

"আরে কেলেটা কিরকমভাবে শোয় দেখেছেন— এক মুহূর্ত ও যদি বিছানার ওপর থাকে তো আমার দিব্যি রইল।"

"বাপু যদি একটু মাটিতে গিয়েই পড়ে তাতে এত চেল্লাবার কী দরকার পড়ল, তা তো বুঝিনা। কোথায় গেল ওটা— একটু উপরে টেনে নে না।" এই দুই ঢঙের কথাবার্তা কার কার মুখ দিয়ে আসছিল পাঠকদের বলবার দরকার বোধ করছি না। যদি ভয়টা এসেই থাকে তা হলে দিদিমার তরফের ভাষ্য শুনলে আপনাদের বিশ্বাস হবে "আরে এ সব কি বলিস ওকে সারাক্ষণ? বাইরের কেউ শুনলে ভাববে এ ছেলে তোর নয়, তোর সতীনের। তোমার আজকাল একেবারে···"আরো কিছু হয়ত বলতেন। কিন্তু তাঁর কথা অসমাপ্তই রয়ে গেল, তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম, উনি আমাকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। আমি এই জন্য ভয় পাচ্ছিলাম যে যদি দিদিমা বলে ভুলে মার কাছে চলে যাই তা হলে আমার ভাগ্যে যে কী ঘটতো বলা মুস্কিল। কিন্তু স্বয়ং ভগবানও হয়তো আমার জন্য চিন্তা করছিলেন। তাই আমি মার হাতে গিয়ে পড়ি নি।

দিদিমা ও মার ভেতর পরস্পর সম্ভাষণ চলছিল। আমিও আবার শুয়ে পড়েছিলাম। যখন চোখ মেললাম, তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে। ঐদিন আমাদের কৃষ্ণকায় ভদ্রলোকটি— নানাজী, রাওজীর সন্ধানে বহু জায়গায় খোঁজ করে দেখলেন কিন্তু কোনো সন্ধানই পেলেন না। 'এক্ষুনি আসবেন, আর-একটু বাদেই

আসবেন, দুপুরবেলায় এসে পৌঁছবেন, সন্ধ্যায় এসে পড়বেন—এই রকম করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাওজীর ঘরে তালা লাগানেই রইল। আমি ঐ দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে এধার-ওধার চক্কর কাটি আর ঘুরেফিরে এসে রাওজীর ঘরের তালাটা দেখে যাই। কখনও নানাজীর দুই ছেলের চোখ এড়িয়ে দৌড়ে এসে তালাটা দেখে যাই ঠিক যেমন বেড়াল দুধের বাটির দিকে ঘুরেফিরে চোরা দৃষ্টি দেয়। কখনও ভাবছিলাম অনেকক্ষণ ধরে তালাটাকে দেখছি বলে হয়ত রাওজী এসে পৌঁছচ্ছেন না। তার চেয়ে কিছুক্ষণ না দেখাই ভাল। আবার মনে মনে বিচার করি অনেকক্ষণ না দেখার ফাঁকে রাওজী হয়ত—এসে তালা খুলে ফেলবেন। তাই আবার গিয়ে তালাটা দেখি। সমস্ত দিন এই প্রকার চলতে লাগল। এভাবে দুদিন চলে গেল, তৃতীয় দিনও তাই। চতুর্থ দিনও এসে পড়ল। রাওজীর কোনো খবর নেই। আমরা যেমন তাঁকে স্মরণ করে হঠাৎ তাঁর এখানে চলে এসেছি, দিদিমার মনে হোলো, হয়ত রাওজীও তেমনি হঠাৎ দেশে চলে গেছেন। তাই দেশের বাড়ীতে এক চিঠি পাঠালেন। তার উত্তর এল যে রাওজী সেখানে আসেন নি। এই উত্তর পেয়ে সকলেই খুব নিরাশ হলেন। মা যখন একলা থাকতেন তখন খুব কাঁদতেন। আবার যখন সকলের মাঝখানে গিয়ে বসতেন তখন একেবারে চুপচাপ, নির্বাক্। এই রকম করে আরো দুদিন চলে গেল। দিদিমা নানাজীকে ঘরে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে বললে নানাজী খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন—"আমি আপনাদের এই দৃঢ় নিশ্চয় করেই এনেছি যে রাওজীর সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেব, আর সেই সাক্ষাৎকার হয়ে যাবার পরই আপনাদের যেতে দিতে পারি।" কিন্তু এই আগ্রহ এই উৎসাহ কতদিন আর থাকে! ওদিকে রাওজীর কোনো খবর কোনো জায়গা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। আবার ঘরে ফিরবার প্রসঙ্গ উঠলেই নানাজী বলে "আর একটু থামুন, জিজ্ঞাসাবাদ করতে আজ অমুক লোককে অমুক জায়গায় পাঠিয়েছি। ও ফিরে আসুক, তারপর আর আপনাদের থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করব না। মনে

হচ্ছে ঐ লোকটা কিছু খবর নিয়ে আসতে পারবে। আর ও যদি কোনো খবর না পায়, তা হলে আর কোনো রাস্তা নেই।" এই রকম করে আরো তিন-চার দিন কাটল। এই রকম করে করে আমরা ওখানে প্রায় পনের দিন পর্যন্ত ছিলাম। তবু রাওজীর কোনো খবর পাওয়া গেল না। নানাজীও যথাশীঘ্র ঘরে ফিরবার তাগিদ দিয়ে দুটি পত্র পেলেন। এর পর দ্বিতীয় দিনে আমরা ওখান থেকে রওনা হব, এই রকম ঠিক হল।

যেদিন আমরা চলে যাব বলে ঠিক করলাম সেদিন মাকে খুবই ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। আমি তো মার কাছে যেতামই না। ঐ দিন আমার মনে হতে লাগল যে রাওজীর সঙ্গে দেখা নাই-বা হল তার ঘরের তালাটা তো অন্তত দেখে নিই। সমস্ত দিন আমি তালাটা দেখেই কাটিয়ে দিলাম। এমন সময় বিকাল প্রায় চারটা নাগাদ একে একে চারজন লোক, "রাওজী, রাওজী" বলে ডাকতে ডাকতে সিঁড়িতে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে আমি যেখানে বসে ছিলাম ঠিক সেখানেই উঠে এল। প্রথম ব্যক্তিটির মাথায় হলদে পাগড়ি, কালো লম্বা কোর্তাপরা, হাতে একটি লাঠি। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি মারোয়াড়ী। আর দু-জনের গলায় ঝোলানো ছিল চামড়ার ব্যাগ। ভয় পেয়ে ওখান থেকে পালাব না খুশীর সম্ভাবনায় ওখানেই বসে থাকব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই ভেবে বসে রইলাম যে, রাওজীর সঙ্গে দেখা না হলেও এই লোকগুলির সঙ্গে অন্তত দেখা হবে। আর এই করে হয়ত শেষে রাওজীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। রাওজীর এবার শীঘ্রই দেখা পাব এই কল্পনার আনন্দে ওখান থেকে এক দৌড়ে দিদিমার কাছে পৌঁছে বললাম "রাওজীর কাছে কিছু লোক এসেছে, রাওজীকে ডাকছে। রাওজী এবার আসবেন।" এই-সব বলে দিদিমাকে বাইরে নিয়ে এলাম।

দিদিমার পিছন পিছন মাও এলেন। বললেন "আরে, এই কেলে ছেলেটার কথা কী শুনছেন? ও নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর নিয়ে আসবে!" এই রকম বলতে বলতে খুব অধীরতার সঙ্গে বাইরে এলেন আর ঐ লোকদের দেখে তৎক্ষণাৎ ভিতরে চলে গেলেন,

আর যাবার সময় অস্পষ্টভাবে কী সব বলতে বলতে গেলেন, বুঝলাম না। মনে হল আমাকে লক্ষ্য করে কিছু বলছিলেন। আমি ঐ সময় ঠিক শুনতে পেলে পাঠকদের কাছেও তা পৌঁছে দিতাম। মা খুব মন খারাপ করে ভিতরে চলে গেলেন। দিহু একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঐ মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটির বেঢক্ কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। ঐ মারোয়াড়ীটি সব জিনিস দেখছে আর গালিগালাজ করে উঠছে। গালিটা ঠিক কাকে দিচ্ছে জানি না। ও যে আদৌ গালি দিচ্ছে না এটা পরে টের পেলাম। মারোয়াড়ীটি সমস্ত জিনিস একত্র করে বেঁধে নিচ্ছিল, এরই মধ্যে নানাজী এসে গেল। জানি না কী করে আজ হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। এসে দেখেন রাওজীর ঘরে হুলুস্থুল কাণ্ড। উনি, রাওজী হয়ত এসে গেছেন ভেবে বলে উঠলেন—"কি রাওজী, আপনি তো বেশ চালাক লোক দেখতে পাচ্ছি—অ্যাঁ—" বলতেই মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ঐ তিন টিকিওয়ালা মারোয়াড়ীটাকে একদম বাইরে আসতে দেখে উনি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভিতরের ঘরে গেলেন। সেখানে দেখলেন ঐ মারোয়াড়ী আর পেয়াদাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা চলছে। আর-একবার ফিরে ঘরের চারিদিকে দেখে বের হয়ে এলেন। আমি রাওজীর ঘরের আশেপাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম ঐ মারোয়াড়ীটি এক চাটাইর ওপর জিনিসপত্রগুলো একত্র করে রেখে ঐ চাটাইটা জড়িয়ে কাঁধের ওপর ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। আমি ঘরের ভিতর যাবার জন্য প্রথম থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। জানি না কি করে কি হল! আমি সকলের নজর এড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। আমাকে যাতে কেউ না দেখতে পায়, আমি তাই একটু কোণের দিকে লুকিয়ে রইলাম। এ দরজা বন্ধ করে দিলে আমার কী হবে সেদিকে খেয়াল ছিল না।

সত্যি সত্যি ক্রোক্ করবার জন্য আগত কর্মচারীটির সঙ্গে ছিল পেয়াদা হাবিলদার ও অন্যান্য কর্মচারী। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাইল। (এদের এই মণ্ডলী এই ভাবেই হয়। পরে জানতে

পারি) এখনও পর্যন্ত কোনো মারোয়াড়ী দেখলেই আমার ঐ মারোয়াড়ীর তিন টিকির কথা মনে পড়ে। ঐ মারোয়াড়ীর কথায় সঙ্গের লোকজন তালা ভেঙে দরজা খোলে।

আমি এত অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে কী বলব ? আমার উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছিল। ওখানে কী কী ঘটে, দেখতে ইচ্ছা করল। কিন্তু ঐ হলদে পাগড়িপরা সিপাহীটি লাঠি উঁচিয়ে আমাকে আগে যেতে দিল না। আমি দূরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ঐ লোকগুলো দরজা খুলে ঘরের ভিতর যা-কিছু জিনিসপত্র ছিল সব একত্র করতে লাগল। আমি দরজার থেকেই উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কী কী জিনিস জড়ো করছিল এটা আমি দেখতে পারছিলাম না বা এটাও বলতে পারেন, ভেতরে এমন কিছু ছিল না যা চোখে পড়তে পারে। মারোয়াড়ীটা যা কিছু জিনিস সংগ্রহ করছিল সব চাটাইএর ওপর রাখছিল। কিছু কাগজপত্র একটা-দুটো কেরোসিনের বাতি, কিছু খালি পাত্র, কেরোসিন সংক্রান্ত কিছু ফালতু জিনিস— ব্যস্, এইটুকুই শুধু মনে আছে। আমি ভিতরে উঁকি মেরে দেখে ঝট্ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কেমন লোকটাকে ঠকালাম, এই ভেবে মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠলাম। বাইরে থেকে ও যে ছিটকিনি লাগিয়ে দেবে এ খেয়াল একেবারেই আমার হয় নি। এইবার আমি আরাম করে সব দেখব, এই খুশীতে এধার ওধার ঘুরেফিরে দেখতে লাগলাম।

ভয়াবহ পরিস্থিতি

বেশ কায়দা করে ভিতরে ঢুকে গেছি, কেউ টের পায় নি, এই ভেবে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। সব মিলিয়ে ঘরটা লম্বায় চওড়ায় সাত-আট ফুট হবে। মাঝখানে একটা দরজা, ওপাশে আর একটা ঘর। একই মাপের। প্রথমে আমি বাইরের

ঘরটা দেখলাম তারপর ভিতরেরটায় গেলাম। সেখানে তাঁর সম্পত্তির মধ্যে দেখলাম একটা ভাঙা উনান, একটা দড়ি, দুটো কাঠের টুকরো, দুটো বিড়ি, একটা মাটির কল্সী, আরো অনেক টুকরো টাকরা জিনিস। অর্থাৎ এতে আমি সন্তুষ্ট হচ্ছিলাম না ; বার বার ভিতরের ঘরে আর বাইরের ঘরে খুঁজে খুঁজে দেখছিলাম। বহুমূল্য জিনিস যদি কিছু লুকানো থাকে! কোথাও কিছু লুকানো আছে এ যেন আমার আগেই জানা ছিল। ঠিক জানি না কোন জায়গাটায় লুকিয়ে রেখেছেন, তবু খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ দিন, ঐ সময়, ঐ জায়গা আর ঐ-সব ঘটনাবলী স্মরণ করলে আজও আমার মন চকিত হয়ে ওঠে।

বার বার অন্দর-বার করতে করতে আমার মনে হল একবার ঐ ছেঁড়া চাটাইএর নিচেটা খুঁজে দেখলে হয়। কী করে যে এটা আমার মনে হল বলতে পারি না। তখন আমার এমন একটা বয়স যা ভাবতাম তাই করে বসতাম। আমি তাড়াতাড়ি চাটাইটা টেনে তুললাম। তার নিচে মাটি, বিড়ির টুকরো আর তার ছাই, পোড়া দিয়াশলাইএর টুকরো, দড়ি আর দু-চারটে কাগজের টুকরো ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। আমার ছোটো হাতে যখন চাটাইটাকে টানলাম তখন টুক করে কি যেন একটা জিনিস নিচে পড়ে গেল। কিন্তু ওটা যে কী বুঝতে পারলাম না, কারণ ঘরটা অন্ধকার ছিল। বালকসুলভ কৌতূহলে জিনিসটা খুঁজতে লাগলাম। কোথায় কী অবস্থায় আছি তা না ভেবেই আমি জিনিসটা খুঁজছি। এই করতেই অনেক সময় কেটে গেল। ওদিকে ঐ জিনিসটা খুঁজে বের করতে এমনই মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে বাইরে যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। আমি কেবল চাটাইটাকে উলটেপালটে দেখতে লাগলাম, হাতড়াতে লাগলাম কিন্তু জিনিসটা পেলাম না। তবু প্রত্যেক কোণায় কোণায় খুঁজে দেখতে লাগলাম। সেই সময়ে আমার মনে অজস্র প্রশ্ন জমা হয়ে উঠেছিল।

প্রতি মুহূর্তে অন্ধকার বেড়ে যেতে লাগল, তবু ঐ জিনিসটার খোঁজ করতে লাগলাম। পায়ে কী যেন একটা জিনিস ঠেকল। উঠিয়ে

দেখি দেশলাই ? খুব নিরাশ হয়ে পড়লাম। ভাবলাম যদি এক-আধটা দেশলাইয়ের কাঠি থেকে থাকে একবার জ্বালিয়ে দেখি। খুলে দেখলাম তিনটে কাঠি রয়েছে। বড় খুশি হলাম দেখে। চট্ করে একটা কাঠি জ্বালালাম আর ঘরটায় আলো ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেলাম দুই ঘরের মাঝের দরজার চৌকাঠে একটা কাগজ আটকে রয়েছে। ঐ কাগজটা সাধারণ কাগজের চেয়ে অন্য রকম মনে হল। কাঠিটা পুড়তে পুড়তে আমার আঙুল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চমকে উঠে এক ঝটকায় কাঠিটা ফেলে দিলাম। দৌড়তে দৌড়তে দরজার কাছে চলে এসে কাগজটা বের করলাম। কাগজটা হাতে একটু পুরুই ঠেকল। হয়ত ভেতরে বিশেষ কিছু বস্তু আছে এই আশায় খুশী হয়ে হাতড়ে দেখতে লাগলাম। ভাবলাম,—এতক্ষণ ধরে বোধ হয় এটাই খুঁজছিলাম। মামুলি কাগজ নয়, একটা খাম। বয়স তো অল্প তাই ঐ খাম অর্থাৎ চিঠিটা হাতে আসতেই কী যে খুশী হয়ে উঠলাম বলতে পারি না। ছোটোবেলা থেকেই আমি কিছু অদ্ভুত প্রকৃতির। যা মনে আসত তা পূরণ না করা পর্যন্ত শান্তি পেতাম না। এই অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য কখনো কখনো আমাকে অনুশোচনা করতে হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে আবার উপকারও পেয়েছি। যাই হোক, এর দ্বারা আমার উপকার হয়েছে কি অপকার হয়েছে বা যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রয়েছে তার কল্যাণ হয়েছে না অকল্যাণ, এ-সব কথা এখন থেকে বলব কেন ?

ঐ খাম আমি তিন-চারবার হাতড়ে দেখলাম। ভিতরে কী আছে বোঝা গেল না। ভিতরে কী আছে, আর একবার দেখে নি, এই ভেবে আমি ভিতরের ঘরের জানালার কাছে গেলাম। ওখানে খুব অন্ধকার। আবার দেশলাইয়ের কথা স্মরণে এল। আমি একটা কাঠি জ্বালালাম। আলোয় দেখলাম খামের ওপর জড়ানো অক্ষরে কী যেন সব লেখা ; ইংরাজী হতে পারে, বা অন্য কোনো অক্ষর। অর্থাৎ যে অক্ষরে আমার সাধারণ জ্ঞান ছিল, তেমন কোনো অক্ষরে লেখা ছিল না।

খামটা বন্ধ ছিল অর্থাৎ এর ভিতর কোনো চিঠি আছে মনে হতেই বাইরে নানাজীকে চিঠিটা দেখাতে ইচ্ছা হল। "বাইরে" এই শব্দটা মনের মধ্যে ঘুরতে থাকল। আমি এক-দৌড়ে দরজার কাছে গেলাম। দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, একি! দরজা যে একেবারেই খোলা যাচ্ছে না। এতক্ষণ অন্ধকারে একটুকুও ভয় পাই নি কিন্তু এখন ভয় করতে লাগল। যতক্ষণ আমার বাবার সম্পত্তি খুঁজতে ব্যস্ত ছিলাম ততক্ষণ অন্ধকার সম্বন্ধে কোনো খেয়াল ছিল না। মনে হয় নি আমি একলা। বাইরে যে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় তা একেবারেই মনে আসে নি। যখন আমার সমস্ত চিন্তা দরজার ওপর গিয়ে পড়ল তখন ভাবতে লাগলাম,—আমাকে মা, দিহু, নানাজীরা নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এই ভেবে ওদের মানসিক অবস্থা না জানি কী হয়েছে। এই-সব ভাবনা আমার মনের মধ্যে ভিড় করে এল। অন্ধকার এখন আরো গাঢ় হয়েছে। আমি খুব জোরে জোরে দরজা খট্‌খটাতে লাগলাম।

"দিহু", "মা", "নানাসাহেব" এই-সব নামে চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু আমার এই চীৎকারের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর-কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

এতক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো বোধ ছিল না, যখন বোধগম্য হল তখনো খেয়াল করি নি। কিন্তু এখন? এখন ঐ অন্ধকার আমার কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মনে হতে লাগল। এমন সময় আমার মনে পড়ল দিয়াশলাইয়ের বাক্‌সে আর-একটা কাঠি রয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি জ্বালালাম। জ্বালাবার সময় দিয়াশলাই-এর কাঠিটা মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়ে কোথায় পড়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে বালকের যা উপযোগী সাধন অর্থাৎ কান্না তাতেই মনোনিবেশ করলাম। অন্ধকারে আমি কোথায় বসে রয়েছি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দরজার কাছে যাই, তো দেয়ালে হাত লাগে। আবার ভিতরের ঘরে যাই, তো আচমকা কোথাও আঘাত লাগে। এই রকম খুবই একটা বিচিত্র

পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম। শেষে আমি ঐখানেই কোথাও বসে পড়ে খুব জোরে কান্না শুরু করে দিলাম। ঐ সময় আমার কোমল স্পর্শকাতর মনের কী যে অবস্থা হয়েছিল! পাঠক! আপনি কি কখনো এ রকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় পড়েছেন? কেউ যদি আমার মতে পূর্বে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন তিনিই কেবল কল্পনা করতে পারবেন আমার অবস্থা। অন্যের পক্ষে এ অনুভব করা সম্ভব কি? আপনার পিতা-মাতার সঙ্গে বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়ে যদি আপনি হারিয়ে যান তা হলে আপনার কী অবস্থা হবে বলুন তো? কান্না ছাড়া আর কিছু করবার আছে ভাবতে পারছিলাম না। এখন আমার কি হবে? এখন কোথায় যাব? কে খাবার খাওয়াবে? তৃষ্ণা পেলে কে জল দেবে? ইত্যাদি সব কথা মনে আসতেই আরো জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিলাম। যে ছেলে হারিয়ে যায় তার অনেক কিছু সমাধানের রাস্তা আছে— যেমন, পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে সে নাম জিজ্ঞাসা করে, বাপ-মা কোথায় থাকে, কী নাম, বাড়ি কোন্ দিকে ইত্যাদি সব বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারে। অথবা কোনো দয়ালু ব্যক্তি তার এই অবস্থা দেখে কিছু খাইয়ে দিল। আমার চেয়ে ঐ পথ-হারানো ছেলেটির অবস্থা অনেক ভাল। আজও আমার ঐ ভয়ঙ্কর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা মনে হলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। চারিদিক থেকে ঘিরে ধরা কালো কালো অন্ধকার— অন্ধকার ঘরের মেঝেতে একলা বসে রয়েছি, আর "মা", "দিদু", "নানাসাহেব", এই-সব বলে চেঁচাচ্ছি আর জোরে জোরে কাঁদছি— আমার মানসচক্ষে এই-সব ভয়াবহ চিত্র ভেসে উঠলেই চোখ বুঁজে ফেলি, আর মনে হয় এক দৌড়ে কোথাও পালিয়ে যাই।

আমি উপরে যা বর্ণনা করলাম সেই অনুসারে আমি কতক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম, কতক্ষণ বাদে কেউ হয়ত দরজার পাশে এসেছিল, আর কত জোরে জোরে চেঁচিয়ে হাঁক-ডাক পাড়ছিলাম, তা জানি না। মনে হয় কমপক্ষে দু'ঘন্টা পর্যন্ত এই ব্যাপার চলেছিল। কিন্তু এতক্ষণ ধরে আশেপাশের বা বারান্দায় চলাফেরা করছে এরকম

লোকদের কানে আমার গলার আওয়াজ একেবারেই পৌঁছল না, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমার ভাগ্যই এরকম; সবরকম বিপদ-আপদের সঙ্গে লড়বার জন্যই বোধ হয় আমার জন্ম, অন্তত আমার মা তো তাই বলতেন। সেটা যে সত্যি তাই তারই প্রমাণ পাচ্ছি নাকি? আমি ছটফট্ করছিলাম। আমার নাকেমুখে কিছু ধোঁয়া ঢুকতে লাগল। ঐ ধোঁয়ার চোটে আমার প্রাণ চোখের ডগায় এসে হাজির। খুব কষ্ট হতে লাগল চোখে। এ-সব যে কী ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম না। চোখ খোলবার চেষ্টা করতেই সমস্ত ধোঁয়া চোখের ভিতর এসে ঢোকে। চোখ খোলবার অবস্থা ছিল না। ধোঁয়া নাকে গলায় আর চোখের ভিতর ঢুকছিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়াতে কষ্ট হতে লাগল। বার বার নিজের কান্না থামিয়ে পিছনের দিকে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ একটু আরাম পেলাম, কিন্তু সেখানেও ধোঁয়া। কেঁদে কেঁদে যত-না চোখের জল ফেলেছি, তার চেয়ে শতগুণ চোখের জল ফেলতে লাগলাম এখন। আমার কান্নাও বন্ধ হয়ে গেল। "আ…" শব্দ করতেই ঝট্ করে মুখের ভিতর ধোঁয়া ঢুকতে লাগল আর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। একটা সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আবার সামনের ঘরে এসে দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে চীৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু কোনোই লাভ হল না। ওখানেও ধোঁয়া আসতে লাগল। তাই ফের পাশের ঘরে গেলাম। উনানের মধ্যে বোধহয় কিছু জ্বলছে। কাছে গেলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। পিছনের জানালার পাশে গিয়ে খুব জোরে জোরে চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম। ফের সামনের ঘরে গেলাম দরজায় ধাক্কা দেবার জন্য যত শরীরের শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম ঠিক ততখানি শক্তি দিয়েই আবার চেঁচিয়ে হাঁক দিলাম। পরে আবার পিছনের ঘরের জানালার কাছে গিয়ে চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাপ রে বাপ! একি! কী ভয়ানক ব্যাপার—কোণের থেকে উঁচু হয়ে লক্‌লকিয়ে উঠল এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা!

খাম ! চিঠির খাম !!

ঐ ভয়ংকর অগ্নিশিখা দেখে আমার কী অবস্থা হতে লাগল, সে আমিই জানি। বোধ হয় এও হতে পারে যে, ঐ সময় আমি নিজেই আমার পরিস্থিতি কী জানতাম না, কেননা আজ আমি তা ভাবতে শুরু করেছি। আমার ঠিক স্মরণেও আসছে না। ঐ সময় এটাও ঠিক জানতাম না ঐ ভয়ানক পরিস্থিতির কী পরিণাম হতে পারে। আর এটাও জানতাম না ঐ কোণে হঠাৎ কি করে আগুন জ্বলে উঠল ? একদম কিছুই ভাবি নি। হাঁ, অবশ্য আগুন দেখে আমি ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আমি দরজার কাছে গিয়ে খুব জোরে ধাক্কা মারলাম। এর পরে আমার আর কিছু মনে নেই। কেবল মাত্র ঐ ভয়ানক চেঁচামেচি চীৎকারের কথাটা মনে আছে। সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি ঐ ঘরের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল। তার পর ঐ দরজার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম, তার পর কী হয়েছে, কী হয় নি ইত্যাদি ব্যাপার কিছু মনে নেই।

আমার ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছিল। ঠিক চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে রাওজীর ঘরে কী করে ঢুকেছিলাম, সেখানে কী কী কথা হয়েছিল, কী কী জিনিস খুঁজছিলাম, খুঁজতে খুঁজতে কী পেয়েছিলাম, দেশলাই কি করে পাই, তার মধ্য থেকে কটা কাঠি জ্বালি ইত্যাদি সব কথা মনে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে দিদিমাকে ডাকতে লাগলাম। খুব হালকা স্বরে বললাম "দিদু, আমার খামটা কই ?" "কোন্ খাম ? কিসের খাম ?" দিদু এই-সব প্রশ্ন করতেই আমার হুঁশ হল। আমি দিদুকে কী জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে পড়ছে না। কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ ছিল না। বার বার আমি ঐ খামের কথা স্মরণ করতে লাগলাম আর তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ। দিদিমারও সেই একই প্রশ্ন "কোন্ খাম ? কিসের খাম ? কী সব পাগলের মত বক্‌ছ ?" এই প্রশ্নবাণ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল। খামটা গেল কোথায় ? এই প্রশ্ন বার বার মনে আসছিল আর দিদুর নিরাশাব্যঞ্জক উত্তর বার বার শুনে উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল।

যাই হোক, ঐ খামটা আমাকে কেউ দেয় নি। যখনই ঐ খামের কথা বলতে গেছি, তখনই "আরে কি পাগল ছেলেটা রে" বলে সকলে ঠাট্টা করেছে। দু-দিন বাদে আমার স্বাস্থ্য একেবারে ঠিক হয়ে গেল। যেখানে আমি গিয়েছিলাম সেখানে আবার যাবার ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠল। কিছু দিন পূর্বে যে ঘরে গিয়ে আমি দিগ্‌বিজয়ের আনন্দ পেয়েছিলাম, সেই নিজের পিতার স্থান একবার দেখতে ইচ্ছা হল। ঐ ইচ্ছা এত তীব্র ছিল যে তার প্রভাবে আমি আবার ঐ জায়গায় পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম ঐ ঘরে অন্য কয়েকজন লোক বসে আছেন। ওখানে আমার মার বয়সী এক ভদ্রমহিলাও ছিলেন, সঙ্গে দু-আড়াই বছরের একটি মেয়ে। দু-জন লোক দরজার পাশেই বসে ছিল। ওদের দেখে আমি এক পা পিছনে হটে এলাম। কিন্তু ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখবার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় ফের ঐ ঘরের পাশে গেলাম। ঐ স্ত্রীলোকটির একেবারে পাশে গিয়ে ঘাড়-টাড় বেঁকিয়ে ঘরের ভিতর দেখতে লাগলাম। আমার এই কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটির হাসি পেল। হাসি-হাসি মুখ করে আমাকে বলতে লাগলেন "বাছা, তোমার কী চাই? তুমি উঁকি মেরে দেখছ কেন?" ওঁর ঐ সৌম্য সুন্দর হাস্যময়ী মূর্তি দেখে আমার খুব আনন্দ হল। জবাব দেবারও সাহস বাড়ল। আমি বললাম—"এটা আমার রাওজীর ঘর! ওঁর একটা খাম আমি পেয়েছিলাম, সেটা এখানে আছে কি না তাই দেখছিলাম।" এ কথা যখন বলছি তখন ঐ দুই-আড়াই বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে ধীরে ধীরে আমার সামনে এলো।

সুন্দরীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার

আগেই বলেছি ঐ মেয়েটি ছিল দু-আড়াই বছরের। রঙ বেশ ফর্সা। নাক চোখ মুখের ডৌল বড় সুন্দর। শরীরটা বেশ গোল-গাল ধরনের। শরীর দৈর্ঘ্যের হিসাবে একটু বেঁটে। চেহারার মধ্যে মোহ সৃষ্টি করবার ও ভালোবাসবার উপাদান ছিল। আমার বেশ

মনে আছে, ওকে দেখেই আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। নানাজীর ঘরে ছোট বাচ্চার সংখ্যা একেবারেই ছিল না, তা নয়, তবে ওর মধ্যে কারো প্রতি আমি কোন আকর্ষণ অনুভব করি নি। এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে আমি যেন তাকে ভালোবেসে ফেললাম। ইচ্ছে হল ওকে আমার নিজের কাছে ডেকে নিই আর দু জনে মিলে খেলা করি।

ঐ বাচ্চা মেয়েটির সুন্দর ও সরল মুখ থেকে এই কথাটি উচ্চারিত হল "মা, এই বরই আমার খুব পছন্দ। দাদা যা বলেছেন তা আমার চাই না। একেই আমাকে দাও।" এই কথা বলবার সময় মেয়েটি দুটো হাত পিছনে কোমরের ওপর রাখে। মাঝে মাঝে দুই হাতের আঙুলগুলি একত্র করছিল। চোখের ওপর দু-এক গুচ্ছ চুল এসে পড়ছিল, সেগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে, নির্ভয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আমাকে দেখতে লাগল আর গম্ভীর ভাবে কথাগুলি বলল।

মা-ই তো সব নির্ণয় করবার, নির্দেশ দেবার কর্ত্রী, তাই তাঁর কথা শোনবার জন্যে বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি।

মেয়েটির কথা শুনে এমন লজ্জা পেলাম যে বলবার নয়। আমি তো সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। বর সাজাবার ঝোঁকে থাম-টামের কথাও বেমালুম ভুলে গেছি। এমন সময় মেয়েটির মা বলল, "সুন্দরী, তোমার এই বর চাই? ঐ 'বগ্যা' তোমার চাই না? কী হল ঐ বগ্যার?" এই কথা শুনতে পেয়েই আমার একটু দাঁড়িয়ে যাবার ইচ্ছা হল। উত্তর দিল মেয়েটি শিশুসুলভ আধো আধো ভাষায়, "ও খারাপ। ওর নাক দিয়ে জল ঝরে। আমাকে কামড়ায়। ওকে আমার চাই না। আমার এ-ই চাই। একে আমায় দেবে?" মেয়েটির কথা শুনে একেবারেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তবু লজ্জা করছিল। একবার পালিয়ে যাবার ইচ্ছাও হল। কিন্তু এরকম মিষ্টি কথা শুনে আমি আর নড়তে পারলাম না। শেষে আমি ঐখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম সুন্দরীর মা হাসতে হাসতে বলছেন—"আরে খুব সেয়ানা হয়েছিস দেখছি, এখন

থেকেই ভালো-মন্দ চিনতে শিখেছিস— কিন্তু এইরকম নোংরা অপরিষ্কার কনে ওর পছন্দ হবে না। ছ্যাখো তো চুল কেমন এলো-মেলো উড়ি-খুড়ি, মুখ-হাত ময়লায় ভর্তি।" এই বলে সুন্দরীকে সস্নেহে কোলের ওপর বসিয়ে দোলাতে দোলাতে আদর করে চুম্বন করলেন। আদর করে তিনি নিজের কন্যাটিকে বললেন, "ও এমন পাগলী মেয়েকে কেন নেবে? এরকম মেয়েকে তার একদম চাই না।" সুন্দরীর মায়ের কথা শুনে আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বলে ফেললাম "কেন? না বলছেন কেন? আমার ওকেই চাই।"

পাঠক! আমি কী বলছিলাম, তার তাৎপর্য সত্যিই আমি উপলব্ধি করি নি। তবু, আমি যদি ওরকমভাবে না বলতাম, তাহলে আমার একেবারে কাছে এসে যাওয়া কনেটি হাতছাড়া হত। এই দৃষ্টিতেই আমি অমন হট্ করে বলে ফেলেছিলাম। আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলাটি খুব জোরে হেসে উঠলেন। সুন্দরীও হেসে উঠল। ওদের দুজনকে হাসতে দেখে আমিও জোরে হেসে উঠলাম। ওদের আনন্দে আমিও আনন্দিত হলাম। আমাকে হাসতে দেখে সুন্দরীর মা বলতে লাগলেন—"আচ্ছা! নিজের স্বয়ম্বর নিজেই করছেন! মেয়ের ছেলেকে পছন্দ হয়েছে, ছেলেরও মেয়েকে পছন্দ হয়েছে, আর কি চাই! আচ্ছা বেশ— এখন বলো তো এখানে তুমি কিজন্যে এসেছিলে?"

আমি : এটা রাওজীর ঘর তো? আপনি রাওজীকে জানেন?

সুন্দরীর মা : (হাসতে হাসতে) হাঁ জানি। উনি এই ঘরে থাকতেন— তাই না?

আমি : না থাকতেন না, এখনও থাকেন। এই ঘর ওঁর। আমি তাঁর ছেলে।

সুন্দরীর মা : (আরও জোরে হাসতে হাসতে) তাহলে, এখন কোথায় গেছেন? আর তুমিই বা কি করে এখানে এসে গেলে?

আমি : উনি! উনি, বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবেন। আচ্ছা, সুন্দরীর মা, আপনি এখানে কী সূত্রে এলেন? আপনি কি

আমার বাবার ঘরের তালা ভেঙেছেন ? আপনার কাছে তো চাবি আছে— আমি আসতে পারি আপনার ঘরে ? আমি এই ঘরে ঢুকেছিলাম— ভীষণ আগুন লেগে গিয়েছিল তখন একটা খাম কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ঘরের মধ্যে। আমি হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম খামটা কিন্তু কোথায় যেন পড়ে গেল। আপনার ঘরে সেটা আছে নাকি ?

আমার মনে হল, আমার ঐ রকম ছাড়া-ছাড়া কথা বলার ঢঙে আর অজস্র প্রশ্ন করার জন্যে সুন্দরীর মাকে হয়তো ঘাবড়ে দিয়েছিলাম। তবু বেচারী হেসে হেসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, ঐ খামটা আমার ঘরে খুঁজে দেখতে চাও ? আরে পাগলা, আমি পরশু দিন এসে সমস্ত ঘর সাফ করিয়ে সব আবর্জনা ফেলে দিয়েছি। এখন এখানে কিছু নেই, তোমার খাম কি করে পাবে ?"

আমি : আপনি কি এখানে থাকতে এসেছেন ? আমার বাবা কি এখানে আর আসবেন না ? আমার নানা বলেছিলেন, এ ঘর ওঁর। আপনি বুঝি রাওজীর কাছ থেকে এ ঘরটি নিয়েছেন ?

আমার এ প্রশ্ন শুনে মহিলাটি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আমি কী জিজ্ঞাসা করছি, তার অর্থ হয়তো ধরতে পারছিলেন না। এইজন্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন্ রাওজী ? তিনি যখন এখানে থাকতেন তুমিও কি তাঁর সঙ্গে থাকতে নাকি ?" তিনি এই রকম ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করে চললেন। আমিও তার জবাব দিতে লাগলাম—

"কোন্ রাওজী ?"

"আমাদের রাওজী।"

"তুমি কে ?"

"আমি তাঁর ছেলে। তাঁর সঙ্গে অবশ্য কখনও থাকি নি।"

আমার জবাবে আমার ভাবী শাশুড়ী অনেক কিছুই জানতে পারলেন। এই-সব কথাবার্তা যখন চলছিল তখন আমার সমস্ত দৃষ্টি যে উৎসুকভাবে ভিতরের দিকে ছিল এটা সেই মহিলাটি লক্ষ্য করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের কাজ ছেড়ে আমাকে বলতে

লাগলেন, "আচ্ছা, তা হলে এসো, দেখো, ঘরের ভিতর কী দেখবার আছে। এসো—" মায়ের কথা শুনে সুন্দরী খুব উৎসাহের সঙ্গে ঝট্ করে আমাকে বলল— "এসো! এসো! ও বরটি এসো, মা তোমাকে মিঠাই খাওয়াবেন।"

এই শুনে ওর মা যত হাসতে লাগলেন আমি ততই লজ্জা পেতে থাকলাম। আমার মনে হল যেন আমি নিজের শ্বশুরালয়ে যাচ্ছি। আমি তো ভিতরে গেলাম। দেখলাম প্রথম ঘরটায় কিছু নেই, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কুটোটাও পড়ে নেই। সত্যি, একেবারে পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা। সব জায়গা ঘুরে দেখে মনে হল যে এটা রাওজীর ঘরই না। কারণ প্রথম যখন রাওজীর ঘরে ঢুকেছিলাম তখন সেটা কী অবস্থায় ছিল, তার বর্ণনা আপনাদের কাছে দিয়েছি। তখনকার দুরবস্থা আর এখনকার এই পরিবর্তন দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে এই ঘরটা রাওজীর। মনের ভিতর এই জল্পনা চলছিল, এমনসময় মহিলাটি উপরের একটা তাক্ থেকে কিছু বের করে নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন—"কী, তোমার খামটা পাওয়া গেল?" আমি বললাম—"কই, না তো! আপনি পেয়েছেন নাকি? যদি পেয়ে থাকেন, আমাকে দিয়ে দিন।" "আরে না বাপু, আমি তোমাকে প্রথমেই বলেছি, আমি এসেই ঘর-দোর সব সাফ করিয়ে কুটো-কাটা আবর্জনা সব বাইরে ফেলে দিয়েছি। কেন রে, তুই একরত্তি ছেলে, খাম-টাম দিয়ে কী করবি?"

এখন, এ প্রশ্নের কী উত্তর দিই? খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমি তো পড়তেও পারি না, তবু সুন্দরীর মাকে বললাম "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই খামটাই, আমি এমনিই চাইছি!" বালকের মুখে "এমনিই" শব্দটা খুব কাজে লাগে— শব্দটি প্রয়োগ-সিদ্ধ। আর আমার তো মনে হয় এরকম সুবিধাজনক উপযোগী শব্দ আর দুটি নেই। কেউ হয়তো ধরো, জিজ্ঞাসা করল— তুমি ওরকম কথা বললে কেন?—যদি উচিত জবাব না মনে আসে তা হলে মুখের ডগায় আপনিই এসে পড়ে—'এই এমনিই।' আর এই শব্দটি এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা হয় যে প্রশ্নকর্তা যেন প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যায়। অন্তত বাল্যকালে

আমরা 'এমনিই" এই শব্দটির মহত্ত্ব ও উপযোগিতা বেশি উপলব্ধি করি। যাক্‌গে—

আমি ঐ ছোট্ট জবাবটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি একটা বড় লাড্ডু ভরা কৌটো আমার কাছে রেখে দিয়ে বললেন, "এই লাড্ডু খাও।" সুন্দরীও আমাকে বলল—"এই বর! তুমি খাও, আমি লাড্ডুগুলো ভেঙে দিই?" এই কথা শুনে সত্যি আমার বড় অদ্ভুত লাগল, কারণ সুন্দরী আমার "বর" নামটা একেবারে পাকা করে নিয়েছে।

আমি এটা পছন্দ করি নি তা নয় বরং খুব ভালো লাগছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল ও আমাকে ঐ নামেই ডাকুক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই, ঐ রকম "বর, বর" করে ডাকলে আমার লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। "আমি লাড্ডু ভেঙে দিই" সুন্দরীর এই কথা শুনে তার মা বললেন— "না, না, আপনাকে আর ভেঙে দিতে হবে না—ভেঙে দেবে কি? একবার চেহারাটা দেখো তো। নিজের চুল আগে সামলাও, কি রকম চোখের ওপর এসে পড়েছে দ্যাখো!"

লাড্ডু কেবল আমাকেই দিল, সুন্দরীকে দিল না, এটা আমার ভালো লাগল না। সুন্দরীর মাকে বললাম—"সুন্দরীর মা, আপনি আমাকে লাড্ডু দিলেন আর একে দিলেন না?" শুনে সুন্দরী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না আমার চাই না, আমি খেয়েছি। দাদা এলে আরও খাবোখন।" তবু আমি সাগ্রহে ছোট্ট এক টুকরা ওকে দিতে গেলাম, এমন সময়ে আমার নাম ধরে খুব জোর ডাক শুনতে পেলাম। ডাকতে ডাকতে আমার মা এসে হাজির হলেন। মায়ের ঐ রকম ক্রুদ্ধ আওয়াজ শুনেই আমি ঘাবড়ে গেলাম। এক মিনিটও হয় নি, কেবল মুখের মধ্যে লাড্ডুটা দিয়েছিলাম, এখন এমন পরিস্থিতি হল যে পালাতে পারলে বাঁচি। সুন্দরীর মা সব মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে আমাকে বলতে লাগল—"কি? তোমাকে কেউ ডাকছে নাকি? দেখি তো কে!" বলে তিনি বাইরের দরজার কাছে গেলেন। আমার মাও ওখানে গেলেন। মাকে দেখে সুন্দরীর মা দরজাটা ছেড়ে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন,

"আপনি এই ছেলেটিকে খুঁজছেন ?" আমার গলায় তো লাড্ডুটা আটকেই গেল— আর নিচে নামবেই বা কি করে ? মা কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন, দিদিমা তখন শুয়েছিলেন— এই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চুপিচুপি রাওজীর ঘরের দিকে যাবার জন্যে পালিয়ে এসেছিলাম। আমার মায়ের চেহারা ক্রোধে রক্তবর্ণ দেখলাম। আমাকে দেখেই ঘরের ভিতর ঢুকে এলেন। সুন্দরীকে দরজার পাশ থেকে সরিয়ে আমার কাছে এসেই—"এই কেলে ছোঁড়াটা, তোর এই ভিখারীর দশা কোথা থেকে হল ? কেন তুই সব জায়গায় গিয়ে ভিক্ষা করিস। তোকে আমি বলি নি, দরজার বাইরে এক পা বাড়িয়েছ কি ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। অ্যাঁ, আমাকে কেবল নাজেহাল করার জন্যেই জন্ম নিয়েছিস হতভাগা ! জন্ম থেকেই হতভাগা একেবারে বনবাসের কপাল নিয়ে এসেছে।" এই বলতে বলতে উনি দু-চারটি চাপড় লাগিয়ে দিলেন। অসম্ভব ব্যথা পেয়ে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম।

আমাকে কাঁদতে দেখে সুন্দরী খুব ঘাবড়ে গেল। সে "আমার বরকে কেন মারলে" বলে জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল। সুন্দরীর মা আমার মায়ের কাছে এসে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বললেন—"আরে এ কী, বোন, একি করছেন আপনি ? ছেড়ে দিন ওকে। কী এমন দোষ করেছে ও। ও কোথায় গেছে— বাইরেই তো দাঁড়িয়েছিল। আমিই বরঞ্চ ওকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। দয়া করে আর মারবেন না ওকে। এত মারেন কেন ? আহা, দেখুন তো বাচ্চাটার কত চোট লাগল"— এই বলতে বলতে বেচারীর চোখ দিয়ে সত্যিই জল পড়তে লাগল। কিন্তু আমার মা তাতে একটুও নরম হলেন না। উল্টে বরং বললেন, "আরে, আপনি জানেন না, এই বদমাইস ছেলেটার কুকর্মের বহরটা কি ?" জানেন পরশুদিন কী করেছিল ছেলেটা ? আমাদের সকলকে ফাঁসিতে লটকাবার ব্যবস্থা করেছিল। এই ঘরেই ছেলেটা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। কী আর বলব আপনাকে, আমরা তো টেরও পেতাম না।" এই বলে হঠাৎ কাঁদতে লাগলেন। মাকে

কাঁদতে দেখে একটু ভালোই লাগল। আমাকে পেটবার হাতটা উঁচিয়েই ছিল, সেটা একটু থেমে গেল। স্ত্রীলোকের নিজের পুত্রের প্রতি বাৎসল্য-প্রেম তো প্রথম বস্তু। যখন নিজের ছেলেকে মারা শুরু করে তখন মারতে মারতে নিজেই কাঁদতে থাকে— কারণ এই মায়ের এই বাচ্চা— এটা ঠিক সইতে পারে না, তাই এই তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয় কি করে করব? এক ধার্মিক গ্রন্থকার লিখেছেন, ছেলে যখন হারিয়ে যায় মা তখন খুব করে কাঁদে, আবার পাওয়া গেলে ছেলেটাকে খুব করে মারে— এমন মার যে কি বলব। এই অভিজ্ঞতা আমার কয়েকবার হয়েছে। আমার মনে হয় এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। থাক্‌গে—

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমাকে মারবার সময় মা যখন কাঁদতে লাগলেন তখন ভগবৎ কৃপায় তাঁর হাতটা একটু ঢিলে পড়েছিল। আমার ভালোই লাগছিল। মা তো, আমাকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুন্দরীর মা'র মিষ্টি কথায় আর সুন্দরীর আধো আধো মনোমুগ্ধকর বাণী শুনে মা'র ক্রোধ একটু প্রশমিত হয়েছিল। সুন্দরী যে আমাকে নূতন নাম দিয়েছিল, সেটা ডেকে ওঠার ফলে মা'র ক্রোধ কিছু শান্ত হল। তা ছাড়া সুন্দরীর মা, ঐ ডাকটা নিয়ে সুন্দরীকে একটু খেপাতে লাগলেন, সেটাও সকলকে আনন্দ দিল।

বাঃ! চিঠিতো পাওয়া গেল

দিদিমার কাছে যেতেই আমার মাতৃদেবী ফের একবার মার বর্ষণের উদ্যোগে হাতের সদ্‌ব্যবহার করতে উদ্যত হতেই দিদিমা ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিলেন। দিদিমা বেশি আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথাটা খেয়েছেন— এই ধরনের বাক্যবাণ দিদিমার ওপর চালু হয়ে গেল। দিদিমা বললেন—"কী, আমি বেশি আদর দিই? ছোট বাচ্চা, বেচারা একেবারে নিঃসঙ্গ একলা, আমিও একটু শুয়ে পড়েছিলাম ও বেচারী তাই খেলতে ওধারে চলে গিয়ে থাকবে।

এতে তাকে এত পিট্নি দেবার দরকারটা কি পড়ল? তুমিও এত বড় হয়ে গেছ কিন্তু এক-আধটা কথা যদি বা বলি, তুমিও মান না আর ও তো একটা বাচ্চা।" নিজের সম্বন্ধে এই রকম সব কথাবার্তা শুনে মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হলাম। ভাবলাম এবার মারধোরটা বন্ধ হবে কিন্তু হ্যাঁ, দিদিমার আঁচলের আশ্রয় ছাড়লে চলবে না। এ আমি স্থির সিদ্ধান্ত করে নিলাম। দিদিমার কথা শুনে আমার মাতৃদেবী খুব সন্তুষ্ট হয়ে উঠে ঝট করে আমার কাঁধে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, যা না, যা আরও খেলা কর গিয়ে,—যা। যা। সারা মহল্লায় আগুন লাগিয়ে দে গে যা!" এই রকম শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে আমাকে খোঁটা দিয়ে সত্যি সত্যি ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে বার করে দিলেন। আমিও মনে মনে বললাম, বেশি গণ্ডগোল না পাকিয়ে এ সময় চুপচাপ বাইরে যাওয়াই ঠিক হবে। বলা যায় না, হঠাৎ আবার ঘরের ভিতর চলে এলে বাক্যবাণ শুরু হয়ে যাবে। বাইরের এক ঘরে যেখানে নানাসাহেব বসতেন, সেখানে এক কোণে গিয়ে চুপচাপ চোরের মতন বসে রইলাম। তখন পর্যন্ত নানাসাহেব বা তাঁর ছেলেরা, কেউই ফেরে নি। আমি প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট বসে রইলাম। কিন্তু আমার চাপল্য, উদ্যোগ বা উদ্‌ব্যস্ত স্বভাবের জন্যই হোক, অতক্ষণ চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকা সম্ভব নয়। কোনও ব্যক্তিকে উদ্যোগী বা অনুদ্যোগী বলা তার উপযোগিতা বা অনুপ-যোগিতার ওপর নির্ভর করে। অকর্মণ্য বা ক্ষতিকর কাজে তৎপর এরকম লোককে নিরুদ্যোগী বলে। কিন্তু ঐ নিরুদ্যোগী লোকই যদি সাফল্য লাভ করে তা হলে লোকে তাকেই উদ্যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, এ যাবৎ আমার উদ্যোগগুলি সবই নিরর্থক হওয়ায় আমি অকর্মণ্য বলেই খ্যাত হয়েছি। যাক্‌গে ...আমি বসে বসে আমার নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করে দিলাম—যথা—ডান পাটা বাঁদিকে রাখলাম, আবার বাঁ পা ডান দিকে।—এই রকম চলল কিছুক্ষণ, কার্পেটের এক কোণা ধরে টানতে লাগলাম, আবার ছেড়ে দিতে থাকলাম্। দেওয়ালের গায়ে কতগুলি দাগ গোনা শুরু

করলাম। ঘরের ভিতর সবশুদ্ধ কতগুলি জিনিস গুনতে লাগলাম। ধীরে ধীরে নিজের জায়গা থেকে উঠে কোথায় কী কী জিনিসপত্র আছে দেখবার জন্যে জিনিসগুলোর কাছে গেলাম। এই রকম করতে করতে মনে হল, কেবল দূর থেকে জিনিসগুলোকে ভালোভাবে গোনা যায় না, ভুল হতে পারে, তাই কাছে এসে হাত দিয়ে দেখা দরকার। শেষ পর্যন্ত, আমি ঐ-সব জিনিস পরীক্ষা করবার জন্য হাত বাড়ালাম। তৎক্ষণাৎ, রাগুজীর ঘরে যে চিঠিটা পেয়েছিলাম তার কথা মনে পড়ায় আমি আবার সেটা খোঁজ করতে লাগলাম। এখন আমার আর অন্য কোনো জিনিস দেখার ইচ্ছা রইল না। আমি কেবল ঐ চিঠিটা খুঁজতে থাকলাম। প্রত্যেক জায়গাতে খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখতে লাগলাম। মনে আশা জাগল। টেবিলের পাশে গিয়ে ভাবলাম হয়তো ড্রয়ারের মধ্যে চিঠিটা রাখা আছে। আমি ড্রয়ারটা খোলার জন্য হাত বাড়ালাম। এতক্ষণ ধরে যে চিঠিটার খোঁজ করছিলাম সেটা ওখানেই দেখলাম, কিন্তু খামটা দেখলাম খোলা। এর ভিতরে আর-একটা ছোট খাম ছিল, সেটাও খোলা। বাইরের খামটায় টিকিট লাগানো ছিল না, কিন্তু ভিতরের ছোট খামটায় টিকিটি লাগানো ছিল। আমি যে বড় খামটা নিয়েছিলাম তার ভিতর একটা চিঠি ছিল। ঐ চিঠিটা দেখেই মনটা খুব খুশি হয়ে উঠল।

ঘরে তো পৌঁছলাম, কিন্তু চিঠি কই?

অনেক কথা হয়ে গিয়েছে। আমি দিদিমা, মা সবাই নিজেদের পুরোনো জায়গায় ফিরে এসেছি।

গাড়ী স্টেশনে এলো। মনে হল হয়তো বাড়ীর থেকে কেউ আমাদের নিতে আসবে। আমরা বার বার চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মা আর দিদিমা নিজেদের বোঁচকা ওঠালেন। আমার হাত ধরে এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। কিন্তু

ঘরের থেকে কেউ নিতে আসে নি। নিরাশ হয়ে দিদিমা বলতে লাগলেন "আমাদের কপালই এমন! আমাদের আর কারও প্রয়োজন নেই। এঁর তো আবার, নিজের ঘুম ছাড়া আর কিছুরই খেয়াল থাকে না। অন্ততঃ আনন্দীর তো মনে থাকার কথা। চাপরাশীকে এক-আধবার বললেই সে কি মনে রাখে? আমি এইজন্য প্রথমেই চিঠি লিখেছিলাম যে আমার সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না, কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত কোথায় পাঠাল লোক? নাঃ, ভাই এ ঘর-সংসারে ঘেন্না ধরে গেল। কখনও মন করে, যাই একদিকে কোথাও চলে যাই।" এই ধরনের বাগবিস্তার করে দিদিমা আমাকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এলেন। চাপরাশীটা হয়তো এসেছে। এই ভেবে ফের একবার এদিক-ওদিক ঘুরলেন। দিদু আর মা দুজনে মিলে চাপরাশীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। আমিও আমার সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম। লোকেরা যখন হাসতে লাগল, তখন বুঝতে পারলাম আমাদের গাড়ী নিয়েই যেতে হবে! এমনিতেই আমাকে স্টেশন থেকে বাইরে নিয়ে আসতেই দেরি হয়ে গেছে— কিন্তু উপায় কি? এখন সব ঘোড়ার গাড়ী চলে গেছে। বাইরে এসে চাপরাশীটার খোঁজ নিতে আরও কিছু সময় লাগল। ফলে যাও-বা গাড়ী রয়ে গিয়েছিল তারাও চলে গেছে। দু-একজন টাঙ্গাওয়ালা গাড়ীর জন্য জিজ্ঞাসা করছিল দিদিমাকে, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন—"না দরকার নেই, আমার চাপরাশী এসেছে বোধহয়, সে-ই গাড়ী-টাড়ি ঠিক করে রেখেছে।" তখন পর্যন্ত একটাই গাড়ী ছিল। তার কোচম্যান একটাকা চাইছিল। শেষে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দিদিমা একটা গোরুর গাড়ি ঠিক করলেন। তাতে চড়ে নিজের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। নিজের অর্থাৎ মামার বাড়ি। এটা পাঠক নিশ্চয়ই জানবেন, যে বাড়িতে আমি জন্মেছি, তাকে যদি নিজেব বাড়ি বলেই মানি তাতে দোষ নেই।

গোরু দৌড়াচ্ছিল, এমন জোরে যে আমার চামড়া ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। অস্থি পঞ্জর নরম হয়ে গিয়েছিল। গাড়োয়ান গোরুকে গালি দিয়ে ছড়ির বাড়ি মারতে মারতে আমাদের বাড়ী পৌঁছে

দিয়েছিল। গোরুর গাড়ি থেকে নেমেই লাফাতে লাফাতে একেবারে বাড়ীর ভেতরের উঠানে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখলাম দাদু ঝুলার উপর বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। তাঁর পাশে আমার দেড় বছরের বড় বোন গাংগী বসেছিল। আমাকে দেখেই গাংগী হাত তালি দিয়ে বলে উঠল—"দাদু! দাদু! ঐ দেখ দিদু আর মা এসেছে" তবু দাদু মিষ্টি ঝিমুনিটা ছাড়তে পারলেন না। দিদু অন্দরে ঢুকেই যখন বাক্য-বর্ষণ শুরু করলেন তখন দাদু জেগে উঠে বুঝতে পারলেন, চাপরাশী স্টেশনে পৌঁছয় নি বলে এই ক্রোধাগ্নি, তাই বললেন—"কী ব্যাপার! কী ব্যাপার! আরে, আমি তো তাকে স্টেশনে যেতে বলে দিয়েছিলুম। ও নিশ্চয়ই গেছে। তা আপনারা সব এত তাড়াহুড়া করে চলে এলে ও কী করতে পারে?" ফিস্‌ফাস করে এই ধরনের কিছু বলে আবার ঝিমুতে লাগলেন। দিদু কিছুক্ষণ ধরে গজর-গজর করে ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমি আর গাংগীও গেলাম। একজন স্ত্রীলোক এলেন; মার চেয়ে বয়স একটু বেশি। ওর ওপরেও বাক্য-তাড়না শুরু হল। কিছুক্ষণ বাদে চাপরাশীও এল। এসে বললে "কেউ নেই, স্টেশনে গিয়ে কাউকে দেখলাম না।" তখন মেজাজের তাপ-যন্ত্রে উত্তাপ আরও উপরে চলল কারণ দিদু কল্পনা করলেন চাপরাশীটি নিশ্চয়ই স্টেশনে না গিয়ে নিজের ঘর থেকে ঘুরে এসেছে। দিদু তখন প্রত্যেকের মুণ্ডপাত করে, নিজের পোড়া কপালের দোষ দিয়ে চুপ করে বসে পড়লেন। ততক্ষণে তিনি খুব ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলেন, তাই পা দুটো ছড়িয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ বাদে আনন্দী মামী ধীরে বললেন "চলো, নাইবে চলো, গরম জল রাখা আছে।" দিদু কোনো কথা না বলে চুপচাপ স্নান করতে চলে গেলেন।

আমি আর গাংগী, দু-জনে গিয়ে উঠোনে বসলাম। আজই গ্রাম থেকে এল। তাই নিয়মিত ঝগড়াঝাঁটি এখনই শুরু হয় নি। বোধহয় এ-ও হতে পারে যে, পাঁচদিন অদর্শনের পর আবার দেখা তাই ওর সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছা করছিল না। খুব আদর ফলিয়ে কথাবার্তা চলছিল। আমি ওকে গল্প বলছিলাম বোম্বাইতে কিরকম

ঘরের পর ঘর জুড়ে প্রকাণ্ড লম্বা আর উঁচু সব বাড়ি বানায়।

আজ আমি আমার কোটটার ওপর বিশেষ নজর রাখছিলাম, হয়তো ওর ভিতর কিছু জিনিস আমি লুকিয়ে রেখেছি—এই চিন্তা গংগুতাইএর (গাংগী) মাথায় এসেছিল, মনে হোলো।

হতে হতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। সারাদিন যা ধকল গেছে তাতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ঢুলুনি এসে যাচ্ছিল। কোনো দ্বিতীয় উপায় না দেখে ঐ কোট পরেই শুয়ে পড়লাম। রাতটা গভীর নিদ্রার মধ্যে কেটে গেল। সকালে দিদিমা ঘুম থেকে জাগাতে এলে মনে হল যেন এ কয়েক ঘণ্টা আমি এই দুনিয়াতেই ছিলাম না। সকালে উঠে ঐ চিঠিটার কথা মনেই ছিল না। আটটা-ন'টায় যখন ধোপা এল তখন দিদু আমার কোটটা চাইলেন। আমি দিতে চাইলাম না। কেন দিতে চাইছি না তার কারণও বললাম না। কিন্তু দেখলাম এ কোটটা আর কতক্ষণ আটকে রাখতে পারব। চিঠিটা আগে চুপিচুপি কোথাও লুকিয়ে রাখি. এই মনে করে দৌড়ে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়ে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি —এ কী! চিঠিটা কোথাও নেই— একেবারে গায়েব !!

ষোলো আনা রটানো কলঙ্ক

এখন পর্যন্ত যার জন্যে হাজার বার চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত আমার হাত থেকেই চিঠিটা হারিয়ে গেল। আমার খুব দুঃখ হল। খুবই বিশ্রী ব্যাপার হল। আমার সন্দেহ হতে লাগল খামটা নিশ্চয় গংগুতাই হাতিয়ে নিয়েছে। ও ছাড়া আর কেউ এটা নিতে পারে না। এর চেয়ে একেবারেই চিঠিটা পাওয়া না গেলে ভালো হত। এখন সেটা ফেরত পাবার জন্যে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? গংগুতাইকে—না না ঐ গংগুতাইটলী—গংগীটলীকে আচ্ছা করে কামড়ে দিই, খামচে দিই বা কী যে করি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জানি না ও কোথায় গেছে, কি করে গেছে,—আমি এত করে

খুঁজলাম, কিন্তু সন্ধান পেলাম না। যখন ঐ বাইটলীকে আমি একলা পেলাম তখন ওকে খুব ধমক দিয়ে ঐ খামটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। ও উত্তরে কিছু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ওর হাত এত জোরে কামড়ে দিলাম যে আমিই জানি আর ওর হাত জানে। খুবই স্বাভাবিক, যে হাতটা কামড়ে দিতেই গাংগুতাই চীৎকার করে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার আওয়াজ শুনেই মা পিছন থেকে এসে আমাকে কষে একটা চড় মারলেন। শুধু এক চড়েই মন ভরল না, কানে মোক্ষম এক মোচড় দিয়ে কান গরম করার পর ফের তিন-চার চাপড় পড়ল আমার উপর। দাঁতগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠছিল, ফলে আবার একবার তাইকে কামড়াবার ইচ্ছা দমন করতে হল। কিন্তু চমৎকার ব্যাপারটা হচ্ছে এই, যাকে আমি কামড়াতে গিয়েছিলাম সে বেচারী নিজের কান্না ভুলে মায়ের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে এল আর মায়ের হাত ধরে বলতে লাগল, "মা, এ কী করছ, এরকম করে মেরো না।" ওই সময়ে ওর এই রকম আচরণ দেখে আশ্চর্য হই নি, আর তার বিচার করবার সময়ও ছিল না। আমি কেবল এটাই দেখলাম মায়ের তাড়নার উদ্যতহস্ত, গংগুতাই মাঝখানে এসে পড়ায়, নিবৃত্ত হল, আর, আমিও এই ফাঁকে সহজেই কাঁদতে কাঁদতে মায়ের থাবা থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। ভাবছিলাম এই গংগীই আমার চিঠিটা চুরি করেছে আর উল্‌টে মার খেতে হল আমাকে। এইজন্যে আজ থেকে ওর সঙ্গে একেবারে "কুট্টি" করে দিলাম—আড়ি! আড়ি! আড়ি! ঠিক করলাম আমরণ ওর সঙ্গে কথা বলব না, ওর কাছে যাব না, ওকে ছোঁব না, আমাকেও ছুঁতে দেব না।

'তাই'এর জন্য আমাকে মার খেতে হল, কিন্তু দিদিমাকে দিয়ে ওকে পিটুনি খাওয়াব, মনে মনে স্থির করলাম। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। বেধড়ক মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দিহুর কাছে যাব বলে এসে সারা ঘর খুঁজলাম, দিহুকে কোথাও পেলাম না। বেশি কান্না-কাটি করলে আবার গিয়ে মার খপ্পরে পড়ব, এটা ভেবে আমি

আনন্দী মামীর কাছে যেতে চাইলাম। মামী আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু মামীকেও কোথাও দেখতে পেলাম না। তা ছাড়া এখানে কেঁদে কোনো লাভ হবে না, 'ভাই'কে যত পিটুনি খাওয়াব মনে করছিলাম ততখানি পিটুনি মামীর কাছে জুটবে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত চুপ করে যেতে হল। দোতলায় একটা অন্ধকার কুঠরী ছিল সেখানেই সাধারণতঃ আমার আশ্রয় মিলত। স্থির করলাম, কেউ যদি আমাকে ডাকে, বা কাকুতি-মিনতি করে নামবার জন্য, আমি কিছুতেই নিচে নামব না। যে-কেউ আমাকে ডাকুক্, এরই প্রতীক্ষায় আমি বসেছিলাম।

আমার ঘরটা বেশ বড় ছিল। বাড়িতে লোকজন কম, এইজন্যে উপর তলাটা ভাড়া দেওয়া হত। ফলে ওখানে লোকজনদের যাতায়াত, চলা-ফেরা লেগেই থাকত। কেউ হয়তো সিঁড়ির পাশে এল, অমনি মনে হত কেউ বোঝাতে আমার কাছে এসেছে! তখন আমি আরও দৃঢ় নিশ্চয় করতাম, যে-ই আসুক, নিচে নামা আর কিছুতেই নয়। পরে পায়ের শব্দ টের পাওয়া যেত, যে ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন তিনি আমার ঘরের কেউ নন। ও তো আমার পাশের ঘরে যাচ্ছে। এই-সব কারণে ফের আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। এই রকম এক-আধ ঘণ্টা চলল। কেউ আসছে না দেখে মনে হল একবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে কারও পায়ের শব্দ পাই কি না দেখি। আমি চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম। শুনতে লাগলুম, আমার সম্বন্ধে কেউ কিছু বলছে কিনা। প্রায় অর্ধেক সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলুম। পায়ের শব্দ পেলাম, দেখলাম মধ্যের কোনো ঘরে কেউ কিছু বলছে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, কেউ বলছে—"মা, তুমি এরকম কাঁদছ কেন? ভাইটিকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না— এইজন্যে কি?" শেষের কথাটুকু শুনে মন খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমার মনে হল, মা আমাকে মেরেছেন, এইজন্য বোধহয় তাঁর দুঃখ হয়েছে। তাই তিনি কাঁদছেন। এইবার বোধহয় তিনি আমাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে উপরে আসবেন। এই ভেবেই, আমি চট করে উপরের ঘরে

গিয়ে আবার গাল ফুলিয়ে বসে থাকব মনে করলাম এমন সময় শুনতে পেলাম—"আছে বোধহয় কোথাও হতভাগাটা ডাঁটের মাথায় বসে। আজকাল তো আমার হতভাগাটার নামটা পর্যন্ত শুনতে ইচ্ছা করে না।"

মায়ের ঐ কথা শুনে আমার মনের মধ্যে যে কী অবস্থা হল, কি করে বোঝাবো! আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন, একটু আগে আমি ভাবছিলাম, মা আমাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে আসবেন, আর আমি গাল ফুলিয়ে বসে থাকব— এই আশায় বসেছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনোরাজ্যের এই তাসের প্রাসাদ প্রায় ধসে পড়বার উপক্রম হতেই গংগুতাইএর কথায় তৎক্ষণাৎ কিছু সান্ত্বনা পেলাম। ও বললে, "একবার দেখে আসি উপরতলার কোনো ঘরে আছে কিনা।" এই বলে সে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত উঠে এল। আমি ওখান থেকে পালিয়ে এক দৌড়ে নিজের ঘরে এসে গেলাম। গংগুতাই এসে, প্রথম ঘর, মাঝের ঘর, একেবারে শেষের দিকের ছোট ঘর, সামনের ব্যালকনি, পিছনের বারান্দা, এমন-কি, ভাড়াটেদের ঘবে গিয়েও উঁকি মারল, কিন্তু আমার দেখা পেল না। আমি ঐ অন্ধকার ঘরের কোণে লুকিয়ে বসেছিলাম। শেষে হতাশ হয়ে ঐ অন্ধকার এবং ভিতরে এধার ওধার দেখতে লাগল। আমি আরও সাবধানে লুকিয়ে রইলাম— ঘাড় ঝুঁকিয়ে উপুড় হয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে, একদম্ চুপ্! কিন্তু মনে মনে আশা করছিলাম, যে ও আমাকে দেখতে পাক এবং নিচে যাবার জন্যে অনুরোধ করুক। কিন্তু আমি তাকে অন্ধকারে দেখতে পেলাম,— শুনলাম বলছে— "তাই তো কি করি, কোথায় গেল ভাইটি আমার। একেবারে বেপাত্তা, আর কোথায় বা গিয়ে খুঁজি···।" ভারিক্কী চালে নৈরাশ্যজনক উক্তি করে চলে যেতে উদ্যত হল। তবু আমি সদম্ভে বসে রইলাম। যখন সে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তখন দেখলাম আর কোনও চারা নেই, এখন তো আমাকে নিজেই আমার অবস্থান সম্পর্কে জানান দিতে হবে—, কিন্তু ও যদি চলে গিয়ে থাকে···, তাড়াতাড়ি কাশির আওয়াজ গলা দিয়ে বের করে আমার উপস্থিতি জানিয়ে দিলাম, কিন্তু ঐ অনুসন্ধানীর

কানে প্রথম আওয়াজটা পৌঁছয় নি, কারণ ততক্ষণে সে দু-ধাপ সিঁড়ি নেবে গেছে। এখন কী করি? কিছু বলে ওঠা ছাড়া আর উপায় নেই। এই জন্যে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে গিয়ে রাগত ভাবে বললাম—"কিরে তাইট্‌লী! মার্‌কুট্‌লী!! আমাকে খুঁজতে এসেছিলি কেন? যাও, তোমার কাছে আর যাব না, তোমার সঙ্গে মিশব না—, তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না—আমি তোমার সঙ্গে এ জন্মের মতো আর কথা বলব না, বলব না—বলব না!! খবরদার! আবার কখনও আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ তো টেরটি পাবে। মিছিমিছি আমাকে পিটুনি খাইয়েছ, মনে থাকে যেন—" এই বলে আমি ফের ওই অন্ধকার কোণে গিয়ে বসলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, গংগুতাই ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ফের আমার কাছে আসবে এবং এসেও গেল সে। ওকে দেখে আমিও আবার গাল ফুলিয়ে বসে রইলাম। বললাম—"আমি এ জন্মে তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না, তুমি খামোখা জোর কোরো না।" আমি কমপক্ষে পঁচিশ বার ওকে এই কথা বলেছিলাম, তবু সে বার বার বলতে লাগল—"ভাই, তুমি কেন এমন করছ? —তুমি তো কত জোরে আমাকে কামড়ে দিয়েছিলে, আমি কি মা'কে কিছু বলতে গেছি—বলো? আর সেই কামড়ের জ্বালায় জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম এবং সেই আওয়াজ শুনে মা ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। মা তোমাকে মারলেন, তার আমি কী করব? উল্টে বরঞ্চ আমিই তো ছাড়াতে এসেছিলাম। নাও, চলো,— চলো-না, এখন খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। দিদু মন্দিরে গিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন,--চলো, চলো না।" ও যতই আমার ওপর চাপ দিতে লাগল আমার জেদ ততই বেড়ে যেতে লাগল। ও সত্যিই এত বিনীত ও কোমল স্বভাবের ছিল, আর তেমনি ছিল তার আচরণের ভব্যতা। ন্যায়সংগত ভাবে ওরই আমার ওপর চটে যাবার কথা কারণ আমিই প্রথমে ওকে জোরে কামড়ে দিয়েছিলাম। তখন পর্যন্ত তার হাতে সেই দাগ আর ফোলা ছিল। এই বৃত্তান্ত আজ কত সাল আগে ঘটে গেছে তবু এখন পর্যন্ত আমার দাঁতের জ্বলুনি

ঘোচে নি। সেই সময়ে সে কি ভীষণ ব্যথা পেয়েছিল আজ আমি তা কল্পনা করতে পারছি। এত সব হয়ে যাবার পরও আমার কাছে সে এসেছিল অনুরোধ নিয়ে। কত উদার হৃদয় ছিল।

সেদিন, ও যত বেশি উপরোধ অনুরোধ করতে লাগল, আমিও তত বেশি জেদ করতে লাগলাম। বাস্তবিক, আমি বিনা কারণে, "তুমি এরকম! তুমি সেরকম!!" ইত্যাদি কুবাক্য বলেই চলেছিলাম। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে, 'ভাই' বলল, "দেখো তুমি যদি না আসো আমিও খাবো না—।" ঝট্ করে আমি বলে উঠলাম—"ঠিক আছে, খেয়ো না, কে তোমাকে খেতে বলছে।" এমনিতে ও দেখতে আমার মতনই ছোটো-খাটো ছিল, বয়সের দিক থেকে কিছু বড় হলেও ওরও একটা ধৈর্যের সীমা আছে। এত করে বলবার পরও যখন আমি শুনলাম না, তখন সে বলল—"ঠিক আছে— আমার কথা শুনলে না তো—" বলে রওনা হল। আমিও খুব একচোট দেখালাম বটে! ভাবছিলাম, হয়তো ও আর একটু খোশামোদ করবে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। এমনি সময় দিদিমা নিচের থেকে ডাক দিলেন। দিদুর গলার শব্দ শুনতে পেয়ে খুশি হলাম। মনে ভাবলাম, এইবার যদি আমি কাঁদার ভান করি, তা হলে বেশ মজা হয়, গংগুভাইকে মার খাওয়ানোর ইচ্ছাটাই পূর্ণ হবে। এইজন্যে ঐখানেই আমি খুব বিরক্ত হয়ে বসে থাকলাম, আর উল্টে আমিই রেগেমেগে বলতে লাগলাম—"যাঃ—যাঃ, চলে যা এখান থেকে! আমার সঙ্গে কথা বলিস না—।" 'ভাই' বেচারী খুব হতাশ হয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বলতে বলতে গেল—"মা! ভাইটি এলো না—আমি কত করে ওকে বোঝালাম—।" দিদিমা বললেন—"আছে ও এখানে? না আসুক গে—আমি সব শুনেছি। দেখি তো কোথায় কামড়েছে—আরে বাপ্‌রে বাপ্! হে রাম! আচ্ছা, আসতে দাও ওকে, আজ ওকে খেতেই দেব না। তুমি চলো। এখন দেখছি ওকে কোনও স্কুলেই ভর্তি করে দিতে হবে। ও এখন সকলকে এমন উত্ত্যক্ত করে তুলেছে যে বলার কথা নয়! পড়ে থাক্। এখন ওকে কেউ আর সাধতে যেয়ো না—।" দিদু যে

এরকম বলবেন, আমি ভাবতেই পারি নি। আমার তো ষোলো আনাই কপালের গেরো! মনে হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত আমাকেই এবার নিচে যেতে হবে। বলে না গর্বের বাসা শূন্যে ঠাসা? যদি গংগুতাই আর-একবার এসে যায় তা হলে নিচে চলে যাব, এই ভেবে প্রতীক্ষায় রইলাম। অন্য কেউ যদি নিচে যাবার হুকুম করে আমি এক-পা-ও নড়ব না, এই প্রতিজ্ঞা করলাম। এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেলাম। কেউ হয়তো আমাকে ডাকতে আসছে। কে আসতে পারে? গংগুতাই? না, দিদমাই হবেন বোধহয়। যেমন যেমন সিঁড়ি চড়বার শব্দ আসতে লাগল আমিও ক্রমশঃ অধীর হতে লাগলাম। মা উপরে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—"কি রে! নিচে নামবি? না আমি···" এরপর মা কি বলবেন আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। মা এমনভাবে এই কথাটা বললেন, যে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। এক মুহূর্তে একটিও কথা না বলে ওঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছা জেগেছিল যে নিচে পালিয়ে যাই, এমন সময় মা আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি চুপচাপ ওঁর সাথে নিচে নেমে এলাম। এখন কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলব না। বাড়ীর সব লোক খুব খারাপ। কথা বলবার মতো কেউ নেই। খাবার সময় কারোর সঙ্গে একটা কথাও বলি নি। খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে আমি ফের উপরের ঐ জায়গায় যাবার জন্য অগ্রসর হলাম। দিদিমা খুব কঠোর স্বরে বলে উঠলেন—"উপরের অন্ধকার ঘরে আর যেতে হবে না—।" তবু আমি উপরে যাবার জন্য উদ্যত হলে, মা সামনে এসে পড়লেন। বাপরে বাপ! দিহুর এত নিষ্ঠুর আচরণে আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। চুপচাপ ওখানেই বসে পড়তে হল। দিদিমা, সবার খাওয়াদাওয়া হয়ে যাবার পর "ঠিক আছে, আজ তুমি 'তাই'কে কামড়ে দিয়েছ। আগের মতো তোমাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে।"

বম্বে যাবার কিছুদিন পূর্বে আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সুতরাং বম্বে থেকে ফিরে আসবার দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে যে

স্কুলে যেতে হবে এটা তো কবের থেকে ভেবে নিয়েছিলাম। এই ধমক আমার কাছে নতুন ঠেকল না। তবু ঐ দিনই আমার স্কুলে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কী করলে আমার স্কুলে যাওয়াটা বন্ধ হয় সেটাই তখন ভাবছি। দিদিমা তো আজকে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। আজ তো তিনি একবার ডেকেও আদর করলেন না। এই অবস্থায় কান্নার অভিনয় করে কোনো লাভ হবে না, এটা আমি জানতাম।

দিদিমার ভোজন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি শুয়ে পড়বেন। আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তখন তাঁর কাছে বসে বেশ মিষ্টি করে কথাবার্তা বলব। ভাবছিলাম তোষামোদ করে আমার স্বার্থসিদ্ধির উপায় বের করে নেব। জানি না, ওঁর মনে কী সব কথা উঠেছে। অনেকদিন থেকে, বোম্বাই যাবার কারণে, আরতির প্রদীপের সল্‌তে পাকান নি। আজ তিন জনে—মা, আনন্দীমামী আর দিদিমা, নানান্ কথায় মত্ত হলেন।

খুশি হয়ে পরের দিন স্কুলে যেতেই হল।

এ কী হল!

আমি বেশ মনমরা হয়েই স্কুলে পৌঁছলাম। স্কুল বসবার সময় হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার থেকেই খবর পেলাম, হেড্‌স্যার এখনও স্কুলে পৌঁছন নি। স্কুলে বাচ্চারা বেশ শোরগোল করছিল। যখন স্কুলের ছেলেরা খুব হৈ-চৈ করতে থাকে তখন আমি স্কুলে যাওয়া ভীষণ পছন্দ করি। কারণ সে সময় কেউ যদি স্কুলে যায়, সে-ও হৈ-চৈ আরম্ভ করে। কেউ তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে না। কিন্তু যখন শিক্ষক ক্লাসে এসে বসেন তখন কেউ গোলমাল করলে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ধরে ফেলেন। তখন তার পরিণামও দেখবার মতো হয়। আমার তো ক্লাস শুরু হবার কিছু সময় আগেই স্কুলে পৌঁছতে বেশি ভালো লাগে। তেমনি শাস্তি হিসেবে স্কুলের ছুটি হবার পর এক ঘণ্টার জন্যে স্কুল-ঘরে আটকা থাকতে খুব খারাপ লাগে।

আমি তখনও স্কুল-ঘরে পুরোপুরি ঢুকি নি, এমন সময় বিনায়কের পাশে বসে থাকা ছেলেটি জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"হুর্‌রে! হুর্‌রে! এই যে মহাশয় তা হলে বোম্বাই থেকে এসে গেছেন দেখ্‌ছি। নিজের বাপের কাছে তো গিয়েছিলেন, ফেরত আসবার তো কথা ছিল না, হুর্‌রে! হুর্‌রে!" ওর এই জয়নাদ শুনে সব ছেলেদের আমার ওপর নজর পড়ল, আর আমি লজ্জায় এমন কুঁকড়ে গেলাম যে কী বলব।

বোম্বাই থাকার পূর্বে আমি বিনায়ক আর ওর বন্ধুদের কাছে খুব দিল্‌ খুলে কথাবার্তা বলেছিলাম। ভবিষ্যতে যে এর কী পরিণাম হবে, তা ভাবি নি। আমি বলেছিলাম ওদের—"আমি এ রকম গরিব স্কুলে পড়ব না এবং গরিব ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলব না। আমার বাবা বোম্বাইতে থাকেন, ওঁর কাছেই চলে যাচ্ছি, পুনাতে আর ফিরে আসব না।" আত্মশ্লাঘার বশবর্তী হয়ে এই ধরনের সব গাল-গল্প করেছিলাম।

স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি যে এইরকম কিছু ঘটবে। সত্যি বলতে কি, এরকম একটা ব্যাপার করে গেছি তা আমি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার এই-সব বহ্বাস্ফোট বিনায়ক আর তার বন্ধুরা মনে রেখে ভবিষ্যতে যে সুযোগ পেলে আমাকে টিটকারি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, এটা কল্পনা করতে পারি নি। রাস্তায় ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, বোধ হয় আমার দেরি হয়ে গেছে। "স্যারের" চাপড় আমার ভাগ্যে আছে। কিন্তু এখানে অন্য কিছু ঘটে গেল। ওদের কথা শুনে আমার হৃদয় বিস্বাদে ভরে গেল। প্রথমে অবশ্য লজ্জিত হয়েছিলাম, পরে নিজেকে নিজে সামলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এবং যে ছেলেটি টিট্‌কারি দিচ্ছিল, তার কাঁধ সজোরে পাক্‌ড়ে ধরে বললাম—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করব। ইচ্ছা হয় তো যাব, ইচ্ছা হয় তো চলে আসব—আমার মর্জি! তুমি বলবার কে হে?" আমার এই কথায় অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। বিনায়কের পক্ষ থেকে কয়েকজন ছেলে এবং

বিনায়ক নিজে "হুরিও! হুরিও।" বলে চেঁচাতে লাগল, আর আমার রাগও তত চড়তে লাগল। ছেলেরা অসভ্য চীৎকার করতে লাগল আর ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে চোখ মট্‌কে বলতে লাগল—"ব্যস্, আমি বোম্বাই যাব বাবার কাছে, আর ফিরে আসব না।" ওর সঙ্গে বিনায়কও ধুয়া ধরল—"আরে, বাপ বোধ হয় তাড়িয়ে দিয়েছে রে—ওর মতো ছেলেকে রাখবে না আর কিছু।" আমার দলের কোনও ছেলে ওখানে ছিল না। যাও-বা এক-আধ জন ছিল, তারা একেবারে মুখ বন্ধ করে বসেছিল। জানি না, এই চারদিনের মধ্যে তাদের এত প্রেম, বন্ধু-প্রীতি সব কোথায় উবে গেল। আমি ওর কাঁধ চেপে ধরে শার্ট টেনে ধরলাম। আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে, ক্লাসে যে মাস্টারমশাই এসে বসেছেন, সে খেয়ালও ছিল না। একটা কথাই কেবল মাথায় ঘুরছিল—কোনো প্রকারে বিনায়ককে মাটিতে পেড়ে ফেলে তার চুলের মুঠি ধরে আচ্ছা করে নেড়ে দিই। আর, করলামও তাই। সে তার চুল আমার বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল আর চারিদিক থেকে ছেলেদের চীৎকার "বা রে বাঃ, কী মজা! কী তামাশা রে!" এমন সময় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচারের ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ এল—"আরে আরে! একী রে! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!" অ্যাসিস্-ট্যাণ্ট টিচার ওখানে এসে গেছেন, আর আমরা দু-জনে দু-জনের চুল ধরে টানাটানি করছি ছাড়ানোর জন্য। আমি তো ওর বুকের ওপর চড়ে বসে ওর মাথাটা ধরে মাটিতে ঠুকব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ সব চুপ। আমার কেবল একই চিন্তা, হট্টগোল-গোলমাল কেন বন্ধ হয়ে গেল, মাথায় এলো না। কি করে বিনায়ককে ধরে আচ্ছা করে পেটানো যায়। বিনায়ক চট করে আমার চুল ছেড়ে দিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল—"এই এই! স্যার!" কিন্তু আমার খুন চড়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, "ভীতু কোথাকার! স্যরকে আবার ডাকছিস্ কেন?" এই বলে তাকে দিলাম এক রদ্দা। কে যেন আমার ওপর এক চাপড় লাগিয়ে দিল। ভাবলাম বিনায়কের দলের কেউ হবে— বললাম, "এই শালা, পিছন থেকে মারছিস্ কেন?

সামনে আয়" এই বলে ঘুরে পিছনে দেখতে গিয়ে দেখি 'স্যর' স্বয়ং দাঁড়িয়ে। "আচ্ছা আমি সামনে আসছি" বলে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে 'স্যর' আমাকে টেনে বেঞ্চের ওপর নিয়ে গেলেন। এখন পর্যন্ত যত শাস্তি আমি পেয়েছি সব আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার এইবারের অপরাধ পরিমাণে এত বেশি আর এত ভয়ংকর যে, সমস্ত শাস্তির সমাহার মনের মধ্যে রেখে বলা যায়, আজকের একমাত্র সাজা—মৃত্যুদণ্ড। যে-সব সাজা আমি পেয়েছি তার মধ্যে একটা ছিল, বিছেকে দিয়ে কামড়ানো এবং তার জন্য হাত আর কোমর বেঁধে রাখা। কিন্তু আজকের শাস্তিতে, বলা যায় না, বিছে, সাপ, নাগ-নাগিনী ইত্যাদি পৃথিবীতে যত সব বিষধর প্রাণী আছে, সব এসে আমাকে দংশন করবে। আমি স্যরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, যেন এক খুনীর আসামী ফাঁসির তক্তার ওপর দাঁড়িয়েছে। বিনায়ক তো পালিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছিল। 'স্যর' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে সমস্ত ক্লাসকে চুপ করালেন। তারপর অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারকে ডাকতেই, তিনি অবিলম্বে তাঁর সামনে আসার বদলে, নিজের হাতের শ্লেট দেখতেই লাগলেন। 'স্যর' রেগে আগুন হয়ে গিয়ে বললেন—"আমি আপনাকে তিনবার জোরে জোরে ডেকেছি।" অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিজের ক্ষীণ কণ্ঠে "আজ্ঞা হ্যাঁ" বলায় প্রধান শিক্ষক আরও রেগে গেলেন। বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে—প্রথমে একবার এদিকে আসুন।" তাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার বললেন, "আমি এই ছেলেটিকে পাহারা দিচ্ছি, একটু বাদে আসব।" হেড-স্যর গর্জে উঠে বললেন, "না, এখনই আসতে হবে আপনাকে। অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারের তাতে ওখান থেকে নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। স্যর আবার গর্জন করে বললেন, "এখানে এসো।" অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পাহারা-টাহারা দিয়ে আরাম করে ধীরে ধীরে হেড-স্যরের কাছে এলেন। ওর এইরকম আচরণ সত্যই খুব আশ্চর্যজনক। কাছে আসতেই 'স্যর' হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আপনাকে কখন থেকে ডাকছি, আর প্রথমে এখানেই আসতে বলেছি, আপনি এলেন

না কেন ? জবাব দিন।" অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট টিচার ধীরে ধীরে বললেন "বাচ্চাদের নিরর্থক সময় নষ্ট হয়, এটা আমার ঠিক মনে হয় নি।" এই উত্তর শুনে হেডস্যর্ হতভম্ব হয়ে গেলেন। এতক্ষণ ধরে তিনি ক্রোধ চেপে রেখেছিলেন, এইবার রাগে ফেটে পড়লেন। দাঁত কিড়্ মিড়্ করে বললেন "বাস্! বাস্! চুপ্ করুন। এদিকে তো এক কানাকড়িরও আক্কেল নেই, উনি চললেন বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। কিন্তু আসলে আপনি একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন বেআক্কেলে লোক, আর এরকম কর্মবিমুখ ফাঁকি-বাজও দুনিয়াতে নেই। আপনি ছেলেদের মোটেই ঠিক ঢঙে পড়ান না। আমি কতবার বলেছি আপনাকে। কিন্তু আপনার মতো এমন মূর্খ লোক ভূমণ্ডলে দেখি নি। এরকম বেআক্কেলে লোকের প্রয়োজন নেই আমার। আপনার সামনে ছেলেরা ক্লাসে গণ্ডগোল করে, কুস্তি লড়ে, একজন আর-এক জনের চুল ধরে টানাটানি করে, বুকের উপর চড়ে বসে। আপনি এদের সামলাতে পারেন না। একদিন যদি ছেলেরা আপনারই ওপর এই-সব অত্যাচার করে বসে, তখন কি হবে ? বলুন, কী হবে ?" অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট টিচার শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে এই-সব দেখছিলাম। ভুলেই গেছি যে আমি অপরাধী হয়ে এখানে এসেছিলাম। ক্লাসে সকলের দৃষ্টি ঐ দু-জনের ওপর নিবদ্ধ ছিল। এরকম অবস্থা তো আগেও কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতি একটু আলাদা ধরনের। হেডমাস্টার মশায় ফের গর্জন করে উঠলেন— "বলুন, আপনার কী বলবার আছে!"

ওদিকে অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট স্যরেরও মেজাজ চড়ে গিয়েছিল। তিনি ঠোঁট দাবিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে হেডমাস্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। শান্ত স্বরে বললেন, "যে কথা বলে কোনও লাভ হবে না, তা আমি বলতে চাই না", বলে আবার ঠোঁট চাপলেন।

এই কথা শুনে হেডমাস্টারমশায়ের যা অবস্থা হল, তা সত্যই দেখবার মতো।

ঐ উত্তর শুনে হেডমাস্টার মশায় ফের গর্জে উঠলেন—"এই জবাবের কি পরিণাম জানেন ?" অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যর তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বললেন—"আমি যা-কিছু বলেছি, তা বুঝে-শুনেই বলেছি।" এই বলে আবার ঠোঁট দুটো চেপে হেডমাস্টার মশায়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যরের জবাবের স্বর খুব শান্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ ও অর্থপূর্ণ। যতই উনি শান্ত থাকেন, হেড্স্যর-এর তাপমান যন্ত্রের পারা ততই ঊর্ধ্বগামী হয়। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। চক্ষু রক্তবর্ণ করে তখন হেডমাষ্টার মশায় বলতে থাকেন—"গোপিয়া! গোপিয়া!"—এই নাম উচ্চারিত হতেই, আমরা সব ছেলেরা, ক্লাসের যাদের নাম গোপীনাথ বা গোপাল ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, আর ঐ ছেলে দুটির মুখ থেকে গরম শ্বাস বেরোতে থাকে। বেচারারা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল। হেডমাস্টার মশায়ের গর্জন চলতে থাকে—"গোপিয়া, হারামজাদা, তোর তো দোরে দোরে ভিক্ষা করবার মতো অবস্থা হয়েছিল। ওর থেকে বাঁচানোর জন্য আমি চাকরি করিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে তুমি একটা আস্ত উজবুক্—, বেআক্কেলে লোক, তবু তোমাকেই রেখেছিলাম······" এই-সব কথা শুনে তখন ছেলেদের খেয়াল হল, "গোপিয়া," মানে আমাদের ক্লাসের কোনও ছেলেদের নাম নয়, এ নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যর-এর। আমাদের সামনে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারকে এর আগে কখনও এই নাম ধরে হেডমাস্টার ডাকেন নি।

হেডমাস্টার মশায়ের মুখের লাগাম একেবারে ছুটে গিয়েছিল। তিনি আরও জিভ চালিয়ে বলে যেতে লাগলেন, "আরে নেমকহারাম! আমি তোর এত উপকার করলাম, আর তুই কিনা উল্টে আমাকে এই-সব বলছিস্! শালা, নিমকহারাম কোথাকার, নির্লজ্জ বেহায়া!"

ওদিকে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যরও রেগে আগুন। উনিও হুঙ্কার ছাড়লেন—"বাস্! বাস্, ফের যদি গালিগালাজ করেন তা হলে

দেখে নেব। হারাম-খোর কে? নিমকহারাম কাকে বলছেন? নিমকহারাম আমি,—না আপনি?...হাঁ, আমি ভিক্ষা করতাম, ঠিক কথা। কিন্তু আমার এই দুরবস্থা কার জন্যে হল, বলুন? বলুন কার জন্যে? আপনি ভেবেছেন, আমি কিছু জানি না? বলে না—'চুরির বেলায় তাল-তাল, আর দানের বেলায় সূচের মুখ—" মশায় আপনি যেমন কালো দেখতে, তেমনি কালো আপনার কীর্তি-কলাপ—এ আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। আমার এত বড় সম্পত্তি, কী করে সব শেষ হয়ে গেল? কোথায় গেল? এর জন্য দায়ী কে? কী—আমি কি এ-সব জানি না ভেবেছেন? বাস্তবিক পক্ষে দেখতে গেলে, আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ আপনি। আজ আমার অবস্থা রাজার মতোই হতে পারত। কিন্তু হয়ে গেছি ভিখারী। আপনি কি ভেবেছেন আপনার এই-সব কীর্তি-কাহিনী আমার জানা নেই? এ আপনার ভুল ধারণা। আপনার সব মূর্তিই আমি জেনে ফেলেছি। —এতদিন আমি চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এখন আর চুপ থাকবার কোনো কারণ দেখি না। আমি কী বলছি, আর এর পরিণামে আমার কী হবে, সব আমি ভালো ভাবেই জানি, বুঝলেন? আজ পর্যন্ত আমি আপনাকে..."

মনে হচ্ছিল হেডমাস্টার মশায় এ-সব কথায় কান দিচ্ছেন না। অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট টিচার যখন বললেন "—আপনার সব রহস্য, সব কারচুপি আমি জানি..." তখন এই কথা শুনে হেডমাস্টার মশায়ের ঘাড় নিচে ঝুঁকে গেল। তবু ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "তোমাব এই বক্‌-বকানি থামাও। চলে যাও এখান থেকে—কৃতঘ্ন। নীচ কোথাকার।"

"কি বললেন? কৃতঘ্ন? আমাকে বলছেন কৃতঘ্ন! যার ঘরের অন্ন আপনি খেয়েছেন, যে আপনার অন্নদাতা, তারই আপনি সর্বস্ব লুটে নিয়েছেন, তার স্ত্রীকে ঠকিয়েছেন। আর তার অসহায় পুত্রের, পেটের আগুন নিভানোর জন্য চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। আর আপনি আমায় বলছেন কৃতঘ্ন? এই ক্লাসের ছেলেদের সামনে সব কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু এটা মনে রাখবেন, ফের যদি আপনি এইরকম অপমানজনক কথা আমাকে

শোনান তা হলে আপনার কাছে আর থাকব না এবং আমার মনে যা আসে তাই করব।"

এই কথায় হেডমাস্টার মশায়ের সমস্ত বীরশ্রী একেবারে নিভে গেল। তিনি মুখ নিচু করে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি আমার চোখের সামনে থেকে এখন চলে যাও।" মনে হচ্ছিল তিনি যেন খুব কষ্ট করে এই কথাগুলি বললেন। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার স্কুলের বাইরে চলে গেলেন। ঘর দু-তিন মিনিট পর্যন্ত খুব নিস্তব্ধতায় ছেয়ে রইল। এমন সময় হেডস্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন "হ্যাঁ, এখন এসো আমার সামনে—, কে ভীরু এখন বলো"—এই বলে আমার হাত ধরে দু-তিন বার ঝাঁকানি দিলেন। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "না না স্যার, আমি আপনাকে কিচ্ছু বলিনি…।" "স্যার! স্যার, কী করছ— কাকে পট্‌কে ফেলে তার বুকের ওপর চড়ে বসে চুল ধরে টানছিলে? বলো—, আজ স্কুলে প্রথম আসতেই মারামারি শুরু করে দিয়েছ?" হেডমাস্টার আমাকে এই বলতে বলতে দু-চারটা চড়ও মারলেন গালে।

হেডমাস্টার মশায় বিনায়ককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁ রে— কি হয়েছিল বল্ তো?" ও সুযোগ বুঝে মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে সব বলে দিল।

আমার মুখে কেবল এসেছিল, বলি—না স্যার, ও মিথ্যা কথা বলছে,—কিন্তু বলবার সাহস ছিল না। স্থির বিশ্বাস হল যে আজ আমি আর জ্যান্ত থাকব না। স্যার বললেন, "শালা, একে তো তুই বেঁটে পুঁচ্‌কে, তার ওপর সকলের সঙ্গে মারামারি করিস— অলপ্পেয়ে কোথাকার। আবার বাপ তুলে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে? শয়তান, তোর বাপ তো ভিক্ষা করে ফেরে, তুইও তার মতন ভিক্ষা করে খাবি। সকলকে তুই গালাগালি দিয়ে বেড়াস—কাউকে বলিস ভীরু, কারোর বুকের ওপর চড়ে বসিস—দাঁড়া, স্কুল থেকে তোর নাম কাটিয়ে দেব, আর এমন করব যে তোকে যেন অন্য কোনও স্কুলে না নেয়—" হেডমাস্টার আমাকে আরও দু-চারটা

চাপড় কষিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করছিলাম, বিনায়ক আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে রয়েছে। আমার মনের সন্তাপ এত বেড়ে বেড়ে গেল যে কী বলব। আমি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলাম—"স্যার, ও মিথ্যা কথা বলছে। আমি কাউকে গালি দিই নি বা বাপ তুলে কথা বলি নি। আমি শপথ করে বলছি স্যার, সত্যি বলছি স্যার— আমাকে মারবেন না,— আমায় মার খাওয়ানোর জন্য বিনায়ক মিথ্যা কথা বলেছে। আপনি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।" আমি অনেক প্রকার কাকুতি-মিনতি করতে লাগলাম আর এত কান্না কাঁদলাম যে চোখের জলে মুখ ধুয়ে ফেলা যায় কিন্তু "হারামজাদা! আবার মিথ্যা কথা বলছিস—" এই বলে তিনি আরও দু-চার ঘা লাগিয়ে দিলেন, লাঠি দিয়েও পিটলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "বিনায়কের সামনে নাক-খৎ দিয়ে ক্ষমা চা, তা হলে তোকে ক্ষমা করতে পারি। নইলে আজ তোর রক্ষে নেই।" আমি এত মার খেয়েছিলাম যে কাঁদবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু যখন বিনায়কের কাছে ক্ষমা চাইবার ও নাকে খৎ দেবার কথা উঠল, তখন আমার এমন অবস্থা হল যে বলবার নয়। ক্ষমা চাওয়া আমার ধাতে নেই। প্রাণ হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি হেললাম না, দুললামও না দেখে হেডমাস্টার মশায় বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ চলো, তাড়াতাড়ি করে ওর পা ছোঁও।" স্যর, এরকম দু-চার বার বললেন বটে, কিন্তু আমি আগের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে কোনও উপায় না দেখে আমি মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম— "আপনি যদি আমাকে মেরেও ফেলেন, আমি কিছুতেই ওর পা ছোঁব না, ক্ষমাও চাইব না।"

আড়ির থেকে অন্তরঙ্গতা

ঐ সময় দ্রুত তাঁর জায়গা থেকে উঠে এসে, স্যর আমাকে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে গেলেন, আর সব ছেলেদের ডেকে বললেন— "দেখ, গুরুবাক্যের অমান্য করলে কি পরিণাম হয়।" উনি বার বার

বিনায়কের কাছে ক্ষমা চাইবার কথা বলতে লাগলেন এবং আমিও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকলাম, "আমি মরে যাব তবু ওর কাছে ক্ষমা চাইব না।" আমি কেঁদেই চলেছিলাম আর মারও চলছিল সমানে। বেদম মারের পর উনি আমাকে ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। যখন বিনায়কের দিকে দৃষ্টি গেল দেখলাম সে উপহাস করে হাসছে। এই দেখে আমার সব ব্যাকুলতা উবে গেল। আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল।

পরের দিন ফের নির্লজ্জের মতো স্কুলে গিয়ে হাজির। যখন স্কুলে পৌঁছলাম তখন দু-জন মাত্র ছাত্র এসেছিল। পিছন দিয়ে বিনায়কও এসে পড়ল। ওকে দেখে আমার গতকালের কথা মনে পড়ল। আমার শয়তান মন ভাবতে লাগল— কিছু সুযোগ পেলে হয়, তখন আবার একবার বিনায়কের খবর নেওয়া যাবে। কিন্তু অন্য আর-এক মন আধ্যাত্মিক কথা শোনাতে লাগল। আমি লক্ষ্য করলাম বিনায়কের চেহারা খুব উদাস দেখাচ্ছে। সে যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু ভয়ের চোটে বলতে পারছে না। বার বার ওর ঠোঁট কিছু বলবার জন্য ফিস্‌ ফিস্‌ করে উঠছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে আমাকে দেখে পিছনে হটে যাচ্ছে। ক্লাস শুরু হল। আমাদের অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট স্যর না আসায় মুখ্য অধ্যাপক বই খুলে কিছু লিখতে দিলেন। কাউকে অঙ্ক কষ্‌তে দিলেন, কাউকে বা অন্য কিছু লিখতে দিলেন। হঠাৎ এক কাগজের ডেলা আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি স্যর্-কে দেখানোর ইচ্ছা হয়েছিল; কিন্তু মনে হল বোধহয় বিনায়কই এ চিঠি লিখে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ঐ কাগজের ঢেলা 'স্যর'-এর কাছে না দিয়ে নিজের কাছেই রাখলাম। ততক্ষণে আমি খুব অধীর হয়ে উঠে-ছিলাম। শেষে চিঠিটা খুলেই দেখলাম। ওতে লেখা ছিল— "আমার তোমাকে কিছু বলবার আছে। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে?" এটা পড়ে খুব আশ্চর্য হলাম। চট্‌ করে একটা কাগজ নিয়ে লিখলাম—"মিথ্যা কথা বলে তুমি আমাকে খামোখা পিটুনি খাইয়েছ। তুমি যতক্ষণ আমার কাছে ক্ষমা না চাইছ ততক্ষণ

তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ।" এই রকম আরও তিন-চারবার কাগজের ঢেলা ছুড়ে একে অন্যকে তার মনের কথা লিখে জানাল। শেষে মধ্যাহ্নের ছুটিতে আমার বন্ধুদের এক বৈঠক হয়ে গেল। আমার বন্ধু অমৃত বলল "যদি সে এত নম্র হয়ে কথা বলতে চায়, তা হলে দেখো কী বলে।" অপর বন্ধু শ্রীধর চলতে লাগল—"ও একটা লোচ্চা, ওর কথার মধ্যে না আসাই ভালো।" আমার প্রতি আমার দুই বন্ধুর এই নির্দেশ ছিল, বিনায়ক নিজের থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইছে, এ ক্ষেত্রে ওকে ক্ষমা করাই উচিত হবে। আমি কেবল একটি শর্ত রেখেছিলাম যে, প্রথমে ও বড় অক্ষরে লিখে পাঠাক যে "আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।" কিন্তু এটার জন্য ও প্রস্তুত ছিল না! শেষে এই ঠিক হল যে সে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে বলে "আমার অন্যায় হয়ে গেছে।" বিনায়ক হঠাৎ আমার প্রতি সদয় হল কেন তার কারণ শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। ও বললে, যে স্বপ্নের মধ্যে কেউ যেন ওকে বলল যে আমার মৃত্যু হয়েছে। তখন থেকে ওর আমার সঙ্গে স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপন করবার ইচ্ছা হয়েছে।

হঠাৎ দেখা

আমার বাবা বেশ ভাল চাকরি করতেন। কিন্তু আমার জন্মের পর হঠাৎ তাঁর মানসিক অবস্থা বদলে গেল। তিনি উদাসী হয়ে গেলেন এবং চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর মতো থাকতে লাগলেন। এই জন্যে সংসারের তরফ থেকে আমার বোন "তাই"-এর বিবাহের দায়িত্ব আমার মামার ওপরই এসে পড়ে।

আমাদের পৈতৃক বাড়ী বেশ বড়ো ছিল। এইজন্যে স্রেফ্ প্রয়োজনীয় ঘরগুলো রেখে বাকী সব ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। একদিন এক ভদ্রলোক খালি ঘর দেখবার জন্য আসলেন। ওঁর এ-জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল কারণ এটা শহরের কেন্দ্রস্থলে আর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উনি বললেন যে তাঁর এক বন্ধু আসবেন।

তাঁর এ জায়গা সম্ভবত পছন্দ হবে এবং যাই ভাড়া হোক, তিনি দিতে প্রস্তুত। নতুন ভাড়াটে আসবার আগে আমাদের বাড়ীতে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল।

রাওজীর চিঠি এসে পৌঁছল যে তাঁর ওপর বৃহস্পতির কুদৃষ্টি ছিল। এখন সে দৃষ্টি-কাল শেষ হতে আর এক-দেড় মাস বাকি আছে। এরপর তাঁর দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। তিনি একমাস পনেরো দিন বাদে পুনায় এসে পৌঁছচ্ছেন। ততক্ষণে একটা ভালো বাড়ী ঠিক করে রাখতে লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে এক জমিদার পরিবার আসছেন। তাঁরা অভিজাত বংশের প্রাচীন বংশপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। ওঁদের সঙ্গে তাঁদের এক পুত্রও আসছে। যার সঙ্গে মেয়ের বিবাহের কথাও পাকা হতে চলেছে।

এই বিবাহে দু-হাজার পর্যন্ত খরচ করার কথা লিখেছেন।

এই পত্র পড়ে আমার মা রেগে আগুন হয়ে গেলেন। দিদিমাও কোনও সমাধান খুঁজে পেলেন না। উল্‌টে তিনি উদাস হয়ে গেলেন। আমার বড় বোন গংগু-তাই-এরও দুঃখ হল এই ব্যাপার দেখে। মা ঝঙ্কার দিয়ে বলতে লাগলেন—"আমার কপালই এই রকম! সেইজন্যে আমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আজ ধুলায় লুটাচ্ছে। ওঁর মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। এই-সব চিঠি লিখে কী লাভ? আমি আমার দুই সন্তানকে নিয়ে এখানে এসেছি, এও তিনি সহ্য করতে পরছেন না। সুখের অন্ন যে এক গ্রাস মুখে দেবো, তা-ও হতে দেবেন না। হায় ভগবান! জন্ম থেকেই আমার ভাগ্য রাহুগ্রস্ত!"

এই রকমভাবে মা আমার উচ্চৈঃস্বরে হা-হুতাশ করে চলেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমি মা আর দিদু যেখানে বসেছিলেন, সেখানে এসে বসে বলতে লাগলাম—"দিদু, আমার বাবার ঐ চিঠিটা কোথায়? আমাকে দিয়ে দাও। এখন আমি চিঠি পড়তে পারি,—দেখবে? আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। হ্যাঁ দিদু, শোনো, আমরা নতুন বাড়ীতে থাকব, তুমিও আসবে তো?" যখন নিজের অজান্তে এই-সব বলে চলেছি তখন মা আমাকে যেন কাটতে ধেয়ে

এলেন। আমাকে সরিয়ে এক থাপ্পড় লাগিয়ে বললেন, "পাজী কোথাকার! আয় একবার এদিকে, দেখাচ্ছি তোর দিত্ব আসবেন কি না। বেটার জন্ম থেকেই গ্রহদশা একেবারে কোমর বেঁধে পিছনে লেগেছে।"

আমি একবার মার খেয়েছি। তাই এক দৌড়ে উপর তলার ঘরে চলে গেলাম। ওখানে তালা লাগানো দেখে পাশের ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। কাঁদতে কাঁদতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় আমার ঘুম এসে গেল। আমি দেখলাম যে বারান্দায় আমি শুয়েছিলাম তার পাশের ঘরে নতুন ভাড়াটেদের হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেছে। আমার কাছে একটি মেয়ে এসে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল "মা, মা, দেখো এখানে কে যেন শুয়ে রয়েছে।" অন্ধকার হয়ে যাবার দরুন ওর চেহারা ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ওর গলার স্বরে আর কথা বলার ঢঙে আমি আন্দাজ করে নিলাম। আশ্চর্য হয়ে বললাম—"কে,? সুন্দরী নাকি? তুমি? তুমি এখানে কি করে?" আমি ওর সঙ্গে ঘরের ভিতর গেলাম। সেও খুশি হয়ে দ্রুত অন্দরের দিকে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বলল—"মা মা, দেখো এখানে কে এসেছে।"

ওর মা-ও আমাকে চিনতে পারলেন। কিছুক্ষণ ধরে আমাকে নানান্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে করতে বল্‌লেন "আরে তোমাকে নিচে সব খুঁজে বেড়াচ্ছে, শিগ্‌গির যাও।" উনি দিদিমাকে ডেকে বললেন যে আমি এখানে আছি। সুন্দরীকে দেখে আমার মনভরা উদাস ভাবটা কেটে গেল। আমি এটা কল্পনাও করতে পারি নি যে, সুন্দরীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। উপরন্তু আজ এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াতে আমার খুব আনন্দ হল।

আমার পরীক্ষা

আমি বিরক্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর আমার আবার উপরের তলায় সুন্দরীর ঘরে যাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু আমার মাতৃদেবীর চোখে ধুলো দিয়ে ওখানে যাওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। একবার নিষ্ফল চেষ্টাও করেছিলাম। পুনরায় যাবার ইচ্ছা হওয়ায়, আমি মায়ের চোখ এড়িয়ে কেবল সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছি, এমন সময় মা হাঁক দিয়ে উঠলেন—"এই শয়তান! নিচে নাম্— রাত্রে কোথায় উপরের ঘরে যাচ্ছিস?" আমার এত রাগ হল যে কি বলব। কিন্তু আমি নিরুপায়। মনের ইচ্ছাকে দমন করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পিছন থেকে মা এসে বললেন—"ওঠ্, খেয়েদেয়েই অম্নি চট্ করে শুয়ে পড়া হচ্ছে। লজ্জা করে না। পড়াশুনা কিছু করতে হবে না—না কি? লাগাবো নাকি কোমরে এক লাথি?" অগত্যা চুপচাপ উঠে আমি বই পড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শেষে নিরুপায় হয়ে কারো পরোয়া না করে শুয়ে পড়তে হল।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়ার পর বই-পত্তর নিয়ে উপরে এসে দরজা বন্ধ দেখলাম। নিরাশ হয়ে নিচে নামতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম সুন্দরী বলছে "মা, দাদা যে বই এনে দিয়েছেন সেটা পড়ব কবে? যত তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করব, তত তাড়াতাড়ি বড় বই এনে দেবেন।" তার মা তাকে বলেছিলেন, তিনি এখন বাসন মাজছেন। বাসন ধোয়া হয়ে গেলে, পুঁছে আলমারিতে তুলে রাখবেন। তারপর শার্ট সেলাই করতে যখন বসবেন তখন যেন বই নিয়ে পড়তে বসে। যেখানে ভুল হবে, সংশোধন করে দেবেন। বললেন—"যে শব্দ বুঝতে পারবে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। তোমার পড়া খুব ভালো হওয়া চাই। রাত্রে যখন তোমাকে পড়তে বলব, তখন যেন কোথাও না থেমে, গড়-গড় করে পড়ে যাওয়া চাই।"

এই কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। স্ত্রীলোকেরাও পড়ে, এ আমার ধারণা ছিল না। আমার বাড়ীতে কারও লেখাপড়া আসে না, আর এখানে এ কী তাজ্জব কথা শুনছি ?

একি গৌড় বঙ্গদেশ ? আমি খুব উৎসুক হয়ে উঠলাম। আমার সুন্দরীকে ডাকবার ইচ্ছা হল। আবার, মনে ভাবলাম, সুন্দরীর মা তো কাজ করছেন এখন। উনি কাজ শেষ করলে পর ভিতরে যাওয়া সমীচীন হবে। সেই ভেবে অন্য আর-এক ঘরে গিয়ে বসলাম। সেই ঘরে আমার এক সিন্দুক ছিল, যার ভিতর আমার সব পছন্দের জিনিসগুলি তুলে রাখা ছিল। আমি আমার নিজের বড়বোন গংগু-তাই-কে ঐ-সব জিনিসে হাত লাগাতে দিই না। কিন্তু সুন্দরীর সম্বন্ধে ভাবছিলাম, এর মধ্যে কোনও জিনিস যদি তার পছন্দ হয় তা হলে আমি ওকে দিয়ে দিতে পারি ! সুন্দরী আমার থেকে কেবল তিন বছরের ছোট ছিল। দেখতে খুব সুন্দর ছিল, স্বভাবও ছিল সুন্দর। ওর সঙ্গে আমার স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। সেইজন্য সুন্দরীর প্রতি আকর্ষণ আমার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। আমি আমার যাদুর প্যাটরাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই, যে কখনও যদি আমি আমার জিনিসগুলি সুন্দরীকে দিয়ে দিই। তা হলে ও খুশি হবে, আমিও খুশি হব। আমি ওর ঘরের দরজার কাছে গেলাম। দরজা বন্ধ ছিল ! বাহির থেকে ওর মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। আমি কান খাড়া করে কথা শুনছিলাম। ও খুবই সুন্দর ঢঙে কাহিনীর বই পড়ছিল। এক-আধটা শব্দের জন্য ওর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছিল। বাকী সমস্ত কাহিনীটাই ও নিজেই পড়ে শেষ করল। এই দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি লজ্জিতও হলাম এই ভেবে, যে আমি ওর মতো অত স্পষ্ট করে পড়তে পারতাম না। কিছুদিন আগে যখন বোম্বাইতে ছিল তখন এই মেয়েটি কত তোত্‌লিয়ে কথা বলত। আর এক বৎসরের মধ্যে ঈশপের কাহিনীগুলি কেমন সহজে অনর্গল পড়ে যাচ্ছে। আমি তো একটি বই ছাড়া, দুটি বই পড়ি নি। আমার তো ক্রমিক পাঠের বই ছাড়া গল্পের বই

একটাও কেনা নেই। আমার বাড়ীতে আমি একলাই পড়ুয়া ছিলাম। আমার জ্ঞান স্রেফ্ ঐ পাহাড় গোণা পর্যন্তই ছিল। সুন্দরীর পড়া শুনে আমি এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে তাকে আমি পড়াব, এ কথা বলবার সাহস আর রইল না। আমি দরজার কড়া নেড়ে সুন্দরী ও সুন্দরীর মাকে ডাকতে লাগলাম। সুন্দরীর মা দরজা খুলে খুব খুশি হয়ে আমাকে ভিতরে আসতে বললেন। ওর মা একটা খুব বড় কামিজ সেলাই করছিলেন। আমি সুন্দরীর পাশে গিয়ে বসলাম। সুন্দরীর মা ওকে বলছিলেন— "চলো, তাড়াতাড়ি পরের গল্পটা পড়ে নাও। রাত্রে তোমার বাবা তোমার পড়া ধরবেন, আর পড়া না পারলে খুব নিন্দা করবেন।" এই শুনে সুন্দরী হাসতে হাসতে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল— "কেন? কেন আমি নিজেকে অপদস্থ করব? আমি তো এই কাহিনী ভালো করে পড়ে পরিষ্কার শুনিয়ে দেব। আর এইরকমে আমার চেয়ে বরঞ্চ দাদারই মুখে চুন-কালি পড়বে—।"

"আরে আরে, ছি ছি! এই রকম করে বড়োদের নামে বলতে নেই।···আচ্ছা বেশ, তা হলে গল্পটা আর একবার পড়ো—"

সুন্দরীর পড়াশুনার প্রগতি দেখে লজ্জা পেলাম। আমি নিজে এত সুন্দর করে পড়তে পারি না। সুন্দরীর মা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এবার তুমি পড়োতো দেখি। কেমন পড়তে পারো। এই মেয়েটিকে আমি কতদিন থেকে পড়াচ্ছি।" আমি জানতাম আমি অত ভালো পড়তে পারি না, তবু সে ভাব গোপন করে মুচ্‌কি হেসে বললাম, "আমি এখন পর্যন্ত এ বইটা মোটেই দেখি নি। তা ছাড়া আমি যে ভালো করে পড়তে পারব সে বিশ্বাস আমার নেই।" এত বলার পরও মহিলাটি ছাড়লেন না, উল্‌টে বললেন, "তবু তোমার পড়াই উচিত।" এই শুনে আমার ধৈর্য-চ্যুতি ঘটল,—অবস্থাও বেশ কাহিল হল। ভাবলাম, এটা তো আমার পরীক্ষারই সামিল হচ্ছে। পড়ব কি পড়ব না, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে। শেষ পর্যন্ত পড়াই শুরু করে দিলাম। কয়েকবার আটকে ঠেকোতে ঠেকোতে গল্পটা পড়া শেষ করলাম।

তা সত্ত্বেও সুন্দরীর মা বললেন—"বাঃ সাবাস। বেশ পড়েছ।" আমি জানতাম, কত খারাপ পড়েছি। কিন্তু তবু উনি আমার প্রশংসাই করলেন। এরই মধ্যে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা, মা, আপনি এত বড় কামিজ কী জন্য সেলাই করছেন?" এই প্রশ্ন শুনে সুন্দরীর মা মুচ্‌কি হেসে বললেন, "কার এটা, আমি কি করে বলবো?" এই পাল্‌টা প্রশ্ন শুনে আমি ধোঁকায় পড়ে গেলাম— এই এত বড় কামিজ সুন্দরীর পুতুলের তো হতেই পারে না। এরই মধ্যে সুন্দরী উত্তর দিল—"এই বড়ো কামিজটা তো। এটা আমার দাদাজীর।"

"তোমার দাদার? কে তোমার এই দাদা?"

"তুমি জানো না আমার দাদাকে? ও এখন অফিসে গেছে। এ কামিজটা তারই।"

"আচ্ছা, তাই বলো,—এই দাদাজী মানে, তোমার বাবা?" সুন্দরীর মাকে আমি বললাম—"ওঁর কামিজ আপনি সেলাই করেন কেন? দর্জী করে না?"

উনি জোরে হেসে উঠে বললেন—"ভাই, সেলাই না করে কি করব, বলো?" এরই মধ্যে তিনি সুন্দরীকে বলে উঠলেন—"আচ্ছা, ঐ কাহিনীটা তো পড়েছ। এবার ওর উপদেশটা বলো তো।" আমি উপদেশটা পড়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। উনি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলেন। সুন্দরীও যথাসাধ্য বলতে চেষ্টা করল। পরে সুন্দরীর মা ঐ গল্পের উপদেশ খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তখন সুন্দরী তার মাকে মনে করিয়ে দিলো, যে এখন ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিকভাবে সাজাতে হবে! এই শুনে আমিও খুব খুশি হলাম, কারণ আমি আমার ঘরে ফিরে যেতে চাইছিলাম না। আমি ভাবছিলাম, আমিও এদের ঘর সাজানোর ব্যাপারে হাত লাগাই। যখন নিচের থেকে আওয়াজ এলো—"বদমাস শয়তানটা? কোথায় গিয়ে বসে আছে দেখো!" তখন বুঝলাম আমার স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। আমি দৌড়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ইহলোকের স্বর্গ

সুন্দরীর বাবা যেদিন ভাড়াটে হয়ে আমাদের ঘরে বাস করতে আসলেন, সেদিনটা আমার আত্মকাহিনীর পূর্বার্ধের এক অত্যন্ত অর্থপূর্ণ দিন ছিল। ঐ দিন থেকে ক্রমশঃ আমার মধ্যে পরিবর্তন শুরু হল। এই পরিবার খুব উদার ছিল। ঐ ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর সুন্দরী। এই তিন জন একে অন্যকে মান্য করত। সুন্দরীর পিতা সুন্দরীর মাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসতেন দু-জনে মিলে সুন্দরীকে মানুষ করার মধুর কর্ম-কাণ্ডে ডুবে থাকতেন। ঘরকে সাজানো গোছানো, বিচিত্র কর্মোদ্যোগ-প্রিয়তা, এবং আমার প্রতি প্রীতি ও স্নেহের সম্বন্ধ, এই-সব অসাধারণ গুণ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বহির্মুখী বাউণ্ডুলে স্বভাবটাও শুধ্‌রে গিয়েছিল। সুন্দরীর বাবা রোজ সকাল পাঁচটার থেকে নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত নিজের কাজ নিয়মিতভাবে করে যেতেন। খাওয়াদাওয়ার পর রোজ এক-দেড় ঘণ্টা পড়াশুনা করতেন —ওঁর এই নিয়ম ছিল। ভোর পাঁচটায় উঠে নিয়মিত এক বই লিখতে বসতেন। সকাল ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত আমি দেখেছি, লিখেই চলেছেন। যদি এই কার্যে কোনো বাধা এসে যেত, তা হলে পরের দিন নিদ্রার সময় কম করে ভোরে দু-ঘণ্টা আগে উঠে পড়তেন। আটটার সময় সুন্দরীকে নিজের কাছে বসিয়ে পড়াতেন। কিছুদিন বাদে আমিও ওঁর কাছে গিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। তিনিও আমাকে অত্যন্ত স্নেহে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সস্নেহে শিক্ষাদান করা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। সুন্দরীর মা-ও নিজের সেলাই বা চাল ঝাড়াইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে কাছে এসে বসতেন, কথা শুনতে শুনতে তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করে যেতেন। কখনও কখনও আমিও সুন্দরীর বাবা ও মাকে নানান্ কাজে সাহায্য করতাম। নূতন ভাড়াটে বলে তিনি আমাদের ঘরে আসতেন না। আমার বাড়ীর সকলে যখন থেকে জানতে পারলো, সুন্দরীর মা কাপড় সেলাই করেন, বই পড়েন, তখন থেকে সকলে ভাবল এঁরা বুঝি সব

আধুনিক সমাজ-সংস্কারক এবং তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিল। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে ওঁর অনেক সদ্‌গুণ তারা জানতে পারল— ওঁর সারল্য, জ্ঞান-বিচার পরোপকারিতা ইত্যাদি, তখন সুন্দরীর বাবার সম্বন্ধে ভালো ধারনা হল। প্রথম মা তো আমাকে উপরে যাওয়া মানা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আমার স্বভাবের পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। আমি মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছি, আমার বহির্মুখী ভবঘুরে ভাবটা ক্রমশঃ কমে আসছে। আমার স্বভাব, আচরণ অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। এই-সব দেখে আমার মা আর সুন্দরীদের ওখানে যেতে বারণ করতেন না। প্রত্যেক দিন আমার কাছে সুখের দিন হয়ে উঠল। সুন্দরী ও আমার মধ্যে স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক গভীরতর হল।

স্বপ্ন, না সত্য?

আমার সঙ্গে সুন্দরীর, সুন্দরীর বাপ-মায়ের স্নেহের সম্পর্ক দৃঢ়তর হল। যত ওদের সঙ্গে চলা-ফেরা ওঠা-বসা করতে লাগলাম ততই বাড়ীর আকর্ষণ কমে যেতে লাগল। প্রথম যখন নিজের ঘরেই আবদ্ধ থাকতাম, তখন সর্বক্ষণ কিছু-না-কিছু হাঙ্গামা হুজ্জত বাধিয়ে বসতাম। ফলে সকলে আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট ছিল। পরে যখন সুন্দরীদের পরিবারে যাতায়াত শুরু করলাম, তখন আমার বাড়ীর কেউ একটুও বাধা দিল না। সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও পাঠাভ্যাস চলতে লাগল। ফলে অর্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি তৃতীয় হলাম। আমার দিদিমা এত খুশি হলেন যে সেই উপলক্ষে সকলকে ডেকে মিষ্টি ক্ষীর তৈরি করে খাওয়ালেন। মা কিন্তু অনেক গাল পাড়তে লাগলেন। তাঁর অনুযোগ, আমি কেন তৃতীয় হলাম? প্রথম হতে পারলাম না কেন? উনি কিন্তু মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন, কারণ, একদিন আমি লুকিয়ে শুনলাম

তিনি দাছকে বলছেন—"ছেলে খুব শান্ত হয়ে গেছে। এত শান্ত-শিষ্ট যে হবে আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এর সমস্ত সাধুবাদ শিবরাম পন্থজীরই প্রাপ্য। তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। আর তাঁর মেয়েটি···।" এমন সময় তাঁর আমার দিকে নজর পড়ল। তিনি একটু হেসে সস্নেহে বললেন—"ওরে শয়তান! চুপ করে সব শোনা হচ্ছে, না?"

—"দাঁড়া এখনি তোর ··"

আমি তো কবে নয় আর দুয়ে এগার হয়ে বসে আছি। যখন থেকে শিবরাম পন্থ আমাকে পড়ানো শুরু করেছেন, আমার পাঠ গ্রহণ করার উৎসাহ দেখে শিবরাম-জীরও পড়ানোর উৎসাহ বেড়ে গেল। ওঁর মনে হল এ ছেলেটির আরও উন্নতি করবার সম্ভাবনা আছে। তিনি আরও বেশি সময় দিয়ে আমাকে পড়াতে লাগলেন। আমার দিনচর্যার ক্রম এই রূপই ছিল। ধীরে ধীরে আমার প্রতি সুন্দরীর প্রীতি অধিকতর দৃঢ় হতে লাগল। আমার মনে হল, যে ওর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু ওর মনের ভিতর কি আছে সেটা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। একদিন একটা খুব মজার ঘটনা ঘটে গেল।

আমার দিছর এক বান্ধবীর ওখানে এক বিয়ের ব্যাপার ছিল। যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে, সেই মেয়েটি আর দিছর বান্ধবী মহিলাটি জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য মাঝে মাঝে দিছর কাছে আসত। দিছ সুন্দরীর মার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁরা আমাদের আর সুন্দরীর পরিবারকে ঐ বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ওখানকার বিয়ে দেখে আমার মনেও বিয়ের চিন্তা আসতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম—আমারও বিয়ে সুন্দরীর সঙ্গে হবে, এবং এখানে যেরকম পুরোহিত মশায় নির্দেশ দিচ্ছেন, আমিও ঠিক ঐ রকম সমস্ত বিবাহ-বিধি নির্দেশ অনুযায়ী পালন করব। এই রকম মনে মনে যখন ভাবছি তখন হঠাৎ সুন্দরীর দিকে আমার নজর পড়ল। ছ-জনে দু-জনকে দেখলাম। চারি চক্ষুর মিলন হল।

রাত্রে যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন আমার চিত্ত উধাও, কোন্

নিরুদ্দেশ যাত্রায়। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—আমার বিয়ে এখনও কেন দেওয়া হচ্ছে না। ভাবলাম, দিদিমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। মাকে তো ভয় পাই। মা শুয়ে পড়েছিলেন। আমি আমার বিছানার থেকে গড়াতে গড়াতে দিদিমার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমার বয়সের তখন সেই বিপজ্জনক অবস্থা—মনের ভিতর। যা-ই আসুক, বিনা দ্বিধায় বিনা সংকোচে সব দিদিমাকে বলে ফেললাম। দিদিমা জেগে ছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কানের কাছে গিয়ে বললাম—"দিদু, আমার বিয়ে দিচ্ছ না কেন ?" এই প্রশ্ন শুনে তিনি খুব জোরে হেসে উঠলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা কালই বিয়ের জোগাড় করছি। কালকের থেকে মেয়ে দেখা শুরু করব।" সচকিত আমার প্রশ্ন—"মেয়ে দেখার কী আছে ? আমার জন্য অন্য কোনও মেয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই। আমার পক্ষে সুন্দরীই ভালো। তুমি ওকে ভুলে গেলে ? কি করে একবারও ওর কথা তোমার মনে এলো না ?" দিদু বললেন, "বারে বা, তোর মতো পাগলের সঙ্গে সুন্দরীর মতো মেয়ের কে বিয়ে দেবে ? সুন্দরীর বাপ ওর জন্যে বিদ্বান আর ধনবান পাত্রের সন্ধান করবেন।" দিদিমা আরও অনেক কিছু বললেন, সব বুঝতে পারলাম না। স্রেফ্ এইটুকই বুঝলাম, যে পয়সার দিক থেকে, এবং বিদ্যাবত্তার দিক থেকে আমি সুন্দরীর যোগ্য পাত্র নই। আমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু ওদিকে দিদিমার নাক ডাকা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। দিদুর গা ঝাঁকানি দিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—"বক্‌বকানি থামিয়ে এখন শোওগে যাও।" অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এলো না। কিছুক্ষণ পর স্বপ্ন দেখলাম, আমাদের বাড়ীতে হৈ-হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। যা গতকাল বিয়ে-বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড দেখেছিলাম—সুন্দরীর সঙ্গে আমার বিবাহ উপলক্ষে, সেই সব-কিছু হচ্ছে। আমরা দু-জনে খুব প্রসন্ন মনে একে অন্যকে দেখছিলাম। সব-কিছু আমি খুব মন দিয়ে দেখছিলাম। আন্তর-পাটের ব্যবধান সামনে রাখা হল। মঙ্গলাষ্টকের অনুষ্ঠান শুরু হল।

মঙ্গলাষ্টকের ক্রিয়াকাণ্ড হয়ে যাবার পর আন্তর-পাট সরিয়ে নেওয়া হল। দু-জন দু-জনের গলায় মালা পরিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি দেখছিলাম যে, বরের জায়গায় আমি না হয়ে আমারই কোনও পরিচিত ছেলে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বার বার দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম—বরের চেহারা আমার মতো না হয়ে অস্পষ্ট-ভাবে বদলে যাচ্ছে অন্যের চেহারায়। আর তার বদলে আমার চেহারাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আমার এত রাগ হল, যে, রাগের মাথায় খুব জোরে চীৎকার করে উঠলাম। আর সেই আওয়াজে জেগে উঠলাম। দেখলাম সব জায়গায় অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে। আমি তখনও ঘুমিয়ে আছি না জেগে আছি বুঝতে পারছিলাম না।

আমার প্রথম লেখা

আমি জেগে উঠে চোখ মেললাম। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলাম না। ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমি ঐ দৃশ্যটা বার বার দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম যেখানে বরের জায়গায় আর-কারও অস্পষ্ট চেহারা দেখা গিয়েছিল। এই ভেবে আমার মাথাটা ঘুরে উঠল।

এতদিন পর্যন্ত আমার প্রেম পবিত্র ছিল। আমি কেবল সুন্দরীর সঙ্গী ছিলাম। একসঙ্গে পড়তাম, হাসতাম, খেলতাম। এইজন্যেই আমার মনে বিবাহের অভিলাষ জেগে ওঠে। আমার এই অত্যন্ত শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক প্রেমের অন্তরে এক অশুদ্ধ মলিন বিকারের জন্ম হল। সে বিকার মাৎসর্যপরায়ণতা—দ্বেষ!

আমার বরাসন থেকে যে আমাকে স্থানচ্যুত করল, ঐ অদ্ভুত লোকটা কে? এই আমি ভাবতে লাগলাম। ঐ কাল্পনিক লোকটিকে শত্রু হিসাবে খাড়া করিয়ে তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হতে লাগলাম। ঐ দিন সুন্দরীর দিদিমার এক চিঠি এল, তাতে

লেখা ছিল—সুন্দরীর মা যেন শীঘ্র চলে আসে, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুন্দরীর মা, পার্বতী-বাই সুন্দরীকে একলা এখানে রাখতে চাইছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ-না করতে করতে সুন্দরীকে নিয়েই তার মা তাঁর গ্রামের বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আমি সুন্দরীকে আমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করব ভেবেছিলাম, তাও ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতার মধ্যেও অবশ্য আমি এক ক্ষণস্থায়ী সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি সুন্দরীকে কেবল এইটুকু বলতে পেরেছিলাম—"সুন্দরী, কাল সকাল থেকে তোমাকে একটা কথা বলব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু কারোর সামনে সে কথা বলবার নয়—" বলবার সময় আমি নিষ্প্রভ হয়ে পড়লাম। ও বলল, "ভাই, কী হয়েছে তোমার? এমন কী অদ্ভুত কথা বলবার আছে তোমার? কালকেই কেন বললে না?" আমি বললাম, "কি করব, তোমাকে তো একলা পাই নি।" ও আশ্চর্য হয়ে বলল "আমাকে একলা পেতে চাও?" বললাম—"হ্যাঁ।" ও উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"এমন কী কথা ছিল তোমার?" আমি আমার কালকের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলা শুরু করে দিলাম—"দেখো, পরশু রাত্রি আমি বিয়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে···" এমন সময় সুন্দরীর মা ডাকলেন—"সুন্দরী, শিগ্গির এসো—।" ঐ মাতৃভক্ত মেয়েটি মায়ের ডাক শুনে দৌড়ে চলে গেল। আমি বললাম, "কি, আমার কথা পুরো শুনবে না?" "না, না, এখন না, মা ডাকছেন—" বলে উপরের তলায় চলে গেল।

ওদের রওনা হবার সময় হল। ওদের যেতে দেখে আমি ভীষণ কাঁদতে লাগলাম। আমার ইচ্ছা ছিল ওদের সঙ্গে গিয়ে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিই। আমি খুবই জেদ ধরেছিলাম, কিন্তু মার ইচ্ছা ছিল না যে আমি যাই। শিবরাম পন্তজী সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে গেলেন স্টেশনে। গাড়ী ছাড়বার সময় হলে তিনি ওদের বললেন, "পৌঁছেই চিঠি দিয়ো, কেমন?" শুনে আমার খুব স্ফূর্তি হল; সুন্দরীকে বলে ফেললাম, "তুমিও আমাকে চিঠি দেবে, ঠিক তো? আমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকব।" সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীও

বলল "আমি নিশ্চয় লিখব! আমি মার কাছে পোস্ট-কার্ড চেয়েছি এবং মা দেবেন বলেছেন।" এই সময় আমার সারা মন জুড়ে একটি কথাই গুঞ্জন করে উঠছিল—"চিঠি"। ভেবে রেখেছিলাম আমার স্বপ্নের খবর সুন্দরীকে চিঠিতেই জানিয়ে দেব।

আদি ও অন্ত

রাস্তায়, বাড়ী ফেরবার পথে, ভাবছিলাম—বাড়ী ফিরেই আমি চিঠি লিখতে বসব। এও মনে ভাবছিলাম, আরম্ভটা কিভাবে করা উচিত। আমি বাড়ীর ভিতর পা রেখেছি কি, মার গর্জন শুনতে পেলাম—"বদমাইস্ কোথাকার! স্টেশনে যাবার কি দরকার ছিল? যা এখন এখান থেকে— স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে" বলে আমার স্কুলের বই-পত্তরের ব্যাগটা আমার সামনে ছুঁড়ে মারলেন। চুপ-চাপ আমি ব্যাগটা তুলে নিলাম। স্কুলে যাবার রাস্তায় এই কথা ভাবছিলাম, যে আর বাড়ীতে ফিরে আসব না। পরে ভাবলাম স্কুলে না গিয়ে, কোথাও দূরে এক গাছতলায় বসে আমার স্বপ্নের কাহিনীটা লিখে ফেলি।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আমি এক-আধঘণ্টা পড়াশুনা করতাম। আজ ঠিক করলাম, সে সময়টা চিঠি লিখব। আমার চিঠি লেখার ব্যাপারটা অন্য কেউ দেখে ফেলবে এ ভয় আমার একেবারে ছিল না। কারণ আমাদের বাড়ীতে দিদিমা বা মা, কারও অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত নেই। আমি কী লিখছি, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে লেখাপড়া করছি দেখলে মা খুশিই হবেন। ভাববেন, দেখো আমার ছেলে কেমন রাত জেগে পড়াশুনা করছে।

পত্র লেখার ঔৎসুক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয় মনের মধ্যে উঁকি মারছিল। যদি বেশি দেরি দেখে মা জিজ্ঞাসা করে বসেন—হাঁরে, কী লিখছিস এত রাত জেগে জেগে? তখন কী জবাব দেবো?

তখন কি হবে ? কি করে এড়িয়ে যাব ? ইত্যাদি সব প্রশ্নে মন বিচলিত হয়ে উঠল।

রাত এগারটা সাড়ে-এগারটার সময়, সকলে শুয়ে রয়েছে, আমি একাগ্রতার সঙ্গে চিঠি লিখতে বসলাম। কী লিখছি আমি নিজেই জানি না। লিখছি তো লিখেই চলেছি। নিজের থেকেই ভাষা-জ্ঞান, কাব্য, বর্ণনাশক্তি, বিচার-শক্তি সব এসে গেল। অবশেষে চিঠিটা সমাপ্ত করলাম। এমন সময় দড়াম্ করে কিছু পড়বার আওয়াজ এলো। দিদিমা ও মা দু-জনে জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—"কী হল রে ? কি হল ?" আমি জেগে রয়েছি দেখে দিদু বললেন—"আরে, এখনও তুমি শোও নি ? ব্যস্, বন্ধ করো পড়া।" সংকল্প করেছিলাম ঐ চিঠিটা আর-একবার পড়ে দেখব, কিন্তু দিদুর ভয়ে আমি বইপত্তর সব গুটিয়ে চিঠিটা দু-তিনটে বই-এর মাঝখানে খুব সন্তর্পণে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এমনিতে আমার ঘুম আসার কথা ছিল না। কিন্তু জানি না, হয়তো পত্র লেখার পরিশ্রমে বা বেশিরাত পর্যন্ত জাগার দরুন শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়লাম।—সকালে, অন্য দিনের মতো তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলো না। আমার বোন এসে যখন জাগালো তখন উঠলাম। উঠতেই প্রথমে আমি দেখে নিলাম আমার চিঠিটা আছে কি না। মনে করো জীবনে এই প্রথম বসে বসে একটা লেখা শেষ করলাম। শিবরাম পন্থজীর কাছে শিখেছিলাম কি করে লিখতে হয়। তিনি রোজ দু'ঘণ্টা করে লিখতেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম লেখার মহত্ত্বের কথা। সুন্দরীকে পত্র লেখার ফলে মনের কল্পনা লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। তাতে মন শান্ত হল। তখন থেকেই আমার মনে লেখক হবার বাসনা জেগে ওঠে।

এক জাগরণ !

সেই দিন স্কুলে আমার একেবারেই মন বসছিল না। আমার আচরণ ব্যবহার যান্ত্রিক, অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ আমার মনে এলো, আমার লেখা কাগজগুলো হয়তো হাওয়ায় কোথাও উড়ে গেছে। জানতাম না কি করে উড়ে যাবে, কিন্তু এই চিন্তা মনে আসতেই মন আনচান্ করে উঠল। মধ্যাহ্নের বড় ছুটির সময় আমি দৌড়তে দৌড়তে যেখানে আমার লেখা কাগজগুলো রেখেছিলাম, সেই ঘরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার এমন রাগ হল যে কী বলব ! দেখলাম আমার বোন গংগুতাই আমার লেখা কাগজ সামনে রেখে বানান করে করে আমার লেখা পড়বার চেষ্টা করছে যে কথা আমি মনে একেবারেই ভাবি নি, যার জন্য আমার কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না বা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি, তা-ই ঘটতে দেখে আমার অবস্থা পাগলের মতো হয়ে গেল। আমি এক থাপ্পড় মেরে ওর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম হন্যে কুকুরের মতো। সে বেচারী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও মুখ দিয়ে বের করল না। নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলতে লাগল। আমি ওকে বার বার মুখ দিয়ে ক্রুদ্ধ আওয়াজ বের করে অনেক কটু-বাক্য শোনাতে লাগলাম। পরে সমস্ত কাগজ পকেটের মধ্যে পুরে ওখান থেকে চলে যাবার আগে আবার একটু গালাগালি দিয়ে যাই, এই মনে করে, মুখ ফেরাতেই "তাই" বললো—"ভাই, সুন্দরী সব সময় বলত, তুমি খুবই ভালো। তা, এই কি তোমার ভালো স্বভাবের নিদর্শন ? মাকে যেন বোলো না যে আমি কিছু কিছু পড়তে শিখেছি।" সুন্দরীর নাম নিতেই আমি নরম হয়ে গেলাম, তবু আক্রোশের নেশা একেবারে ছুটে গেল না। আমি তাড়াতাড়ি হন্ত-দন্ত হয়ে স্কুলে পৌঁছে গেলাম।

তখনও স্কুলের ঘণ্টা বাজতে দেরি ছিল। ভাবলাম কোথাও গিয়ে আমার লেখা কাগজটা একবার দেখে নিই। এক পোড়ো বাড়ীর

উঠানের মধ্যে গিয়ে বসলাম। গংগুতাই যে পাতাটা পড়ছিল, সেটা ছিল চতুর্থ পাতা। আমি এই ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না, যে সত্যই কি সে চার পাতা পড়ে ফেলেছে! ওর অক্ষর জ্ঞান কবের থেকে হল!

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরেই আমি আমার বোন 'তাই'-কে আদর করে ডাকলাম। আমি ওকে মেরেছি, গালি-গালাজ করেছি এইজন্য ওর কাছে ক্ষমা চাইলাম। কথা দিলাম ভবিষ্যতে কখনও ওকে মারব না। কথায় কথায় ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবের থেকে এবং কি করে ও লেখাপড়া শুরু করল। 'তাই' কী করে আর কার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, এ বিষয়ে আমি কিছু আন্দাজ করতে পারছিলাম এবং তা সত্য বলেও প্রমাণিত হল। আমার এটা খুবই আশ্চর্য মনে হল যে আমাদের বাড়ীতে এ কথাটা এতদিন ধরে কি করে চাপা ছিল। যাই হোক, ঐ দিন থেকে আমাদের, ভাই-বোনের ভিতর প্রীতি-সম্পর্ক বেড়ে চলল। সুন্দরী চলে যাবার দরুন আমার বড় নিঃসঙ্গ লাগত। কিন্তু ঐ দিন থেকে গংগুতাই-এর প্রতি স্নেহ সুপ্তাবস্থার থেকে জেগে উঠল।

"তাই"

তাই-এর চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বইছিল; ও নিঃশব্দে কাঁদছিল, যেন কেউ শুনতে না পায়। বার বার ও আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিল আর বারবারই চোখে অশ্রুর ধারা নামছিল— অশ্রুজলে যেন ওর মুখটা ধুয়ে গেছে। 'তাই', ফোঁপানো বন্ধ করবার চেষ্টা করছিল। পিছনে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরী। সেও খুব দুঃখিত, এইরকম মনে হচ্ছিল। দুজনকেই দুঃখিত দেখে ইচ্ছা হল, 'তাই'-কে জিজ্ঞাসা করি, কেন সে কাঁদছে। এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমার ঠোঁট প্রায় কেঁপে উঠেছে এমন সময় কাঁপা গলার দু-একটা স্বর্গীয় আওয়াজ শুনতে পেলাম—"সুন্দরী, তুই যাই বলিস, মা আজ যা সব বললেন তা না

করে ছাড়বেন না। সত্যি তুমি আমার চেয়ে কত সুখী! সত্যি; এটাই হবে। মা যা ভেবেছেন তাই করবেন। সুন্দরী, তোমার দাদা তোমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তাই কি করবেন?"

সুন্দরী বলল "সত্যি, গংগুতাই, তুমি যদি আমার বড়ো বোন হতে তা হলে কী খুশিই হতাম! আমরা দু-জনে বেশ এই রকমই থেকে যেতাম!"

তাই উত্তর দেয়—"না তো কি? এরকম অখদ্দে লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে এমনি কুমারী থেকে যাওয়াই ভালো। তোমার বাবা যা বলেন— সত্যি তাঁর বিবেচনা কত উচ্চ মার্গের! কিন্তু দেখো, আমি কত অভাগী! মা যা ঠিক করেছেন তা তিনি করবেনই বলেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন আমি নাবালিকা, কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। সুন্দরী, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোটো তবু তোমাকে ছাড়া এ-সব কথা আর কাউকে বলতে পারি না।" এই বলে 'তাই', বার বার চোখ মুছছিল। সুন্দরীর কাঁধে হাত রেখে ও পিছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেল। হঠাৎ আমি বলে ফেললাম—

" 'তাই', তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দেখে নেব মা কী করতে পারেন।" 'তাই' নীচে বসে পড়ে আস্তে ফিস্ ফিস্ করে বলল—

"ভাই, তুমি কখন এলে?" ওর চোখ আবার জলে ভরে এল। অশ্রুভরা চোখে সে বলল, "ভাই, এই তোমার পা ছুঁলাম, তুমি যেন যা কিছু শুনেছ মাকে গিয়ে বোলো না।" ঐ সময়কার ওর করুণ ভাব ও অশ্রুভরা চোখ আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

আমি মাকে এই-সব কথা বলে দেব এই বিচার ওর মনে এসেছে দেখে মন স্তব্ধ হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মনে আমি বললাম—

"তাই, আমি এই-সব কথা মাকে গিয়ে বলে দেব, এই ভাবনা তোমার মনে এলই বা কী করে? তুমি আমাকে কি ভেবেছ? কি? আমি কি দুষ্ট স্বভাবের? আমি শপথ করে বলছি, আমি মাকে এ কথা কখনোই বলব না।" এই বলতে বলতে আমি সুন্দরীর দিকে তাকালাম। মনে হল যেন, সে-ও

আমাকে অবিশ্বাস করছে। সে একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা শব্দও উচ্চারণ করে নি।

আমার মনে আছে, আমি সে সময় এক পাকুড় গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। পাকুড়ের ফল টুপটাপ করে নীচে ঝরে পড়ছিল। কারও সেদিকে নজর ছিল না। তিন জনেই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম! ধরে নিতে পারো, ভবিষ্যতের সমস্যার বোঝা আমার ঘাড়েই চাপলো এবং সে সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় আমি মগ্ন হলাম।

এমন সময় আমার নাম ধরে কে যেন জোরে জোরে ডাকতে লাগল। সেই আওয়াজ শুনে মনে হল, কেউ যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিরাশার খাদের দিকে ঠেলে দিল। আমি বাড়ী এলাম এবং স্বভাব বশতঃই মা মুখ খুলে বাক্য তাড়না শুরু করে দিলেন। এর প্রধান লক্ষ্যস্থল—গংগুতাই।

মাও বলে চলেন, "যাকে মেয়েকে দেখাই সে-ই নাক সিঁটকে বলে—এঃ, এত বড় ধিঙ্গী মেয়েকে এতদিন ঘরে রেখেছেন কি করে—? ঘরের কাজ তো একটুও করে না। সারাটা দিন কেবল বাইরেই থাকে বা উপরের তলায় গিয়ে "বুক্" পড়ে। দাঁড়াও না মজা দেখাচ্ছি, ফের যদি বাইরে যায় তো দেখে নেব। কী কপাল নিয়েই এসেছিস! বিয়ে তো দোজবরের সঙ্গেই হবে।"

সেইদিন থেকে তাই-এর সমস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক পরিবর্তন এসে গেল। ওর সেই বালিকাসুলভ চপলতা, খেলাধুলা, সব শেষ হয়ে গেল। আমার কলহের ও খেলার নিত্য-সঙ্গিনী, 'তাই', কাল পর্যন্ত বালিকা ছিল, আর আজ সে যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। এখন ওর উপর রাগ কর, গালাগালি দাও, সব সে চুপ করে সহ্য করে— যেন ওর সমস্ত বাল্যকাল শেষ হয়ে গেছে। তার মায়ের কেবল একটা কথা সে মানে নি, সেটা এই, যে কাজকর্ম করার পর যে সময় বাকি থাকে সে সময় সে বই পড়া ছাড়ে নি। সে শিবরাম পন্থ-জীর কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়ত। তাঁর কাছ থেকে খবরের কাগজ নিয়েও পড়ত। মার কাছ থেকে কত গালাগালি

খেত, কিন্তু বই-পড়া সে ছাড়ে নি। তাই-এর মনের জিজ্ঞাসা, রুচি, নিষ্ঠা দেখে সত্যিই খুব অবাক ও অদ্ভুত লাগত। ওর ভেতর যে পরিবর্তন এসেছিল তার প্রভাব আমার আর সুন্দরীর ওপরও পড়েছিল। আমাদের তিন জনকে অকালে সংসারাভিজ্ঞ দেখাত।

দু-তিন মাস বাদে হঠাৎ বাবার এক চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন—বিবাহের সময় কাছে এসে গেছে, এইজন্যে তাড়াহুড়া করে কোনো অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে যেন বিবাহ দিয়ো না। আমি তাই-এর জন্য ভালো ছেলে দেখেছি। আমার কাজ শেষ হলেই অবিলম্বে ওখানে এসে যাব এবং খুব সমারোহের সঙ্গে বিবাহ দেব।—

বাবার এই চিঠি পড়ে মা তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। মা মনে মনে নিশ্চয়ই অন্য কিছু স্থির করে রেখেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যই তাঁর এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পেরেছিল।

মায়ের দৃঢ় সিদ্ধান্ত

বাবার ঐ চিঠি পাবার পর মায়ের সংকল্প দৃঢ়তর হল। তিনি দিদিমাকে বললেন—"মা, তুমি যেন ওঁর কথায় ফেঁসে যেয়ো না। যে লোক কোনো কাজকর্ম করে না, সে কি কখনো নির্ভরযোগ্য সৎলোক হতে পারে ?. তিনি আমাদের কুলের আর নিজের মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছেন। যা হয় হোক, আমি এই অগ্রহায়ণেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি—"

আমরা দরিদ্র, আমাদের উচ্চ শ্রেণীর ভালো পাত্র মিলবে কি করে ? কন্যার জন্য যে-সব পাত্র দেখা হয়েছে তারা সকলেই খুব গরিব। একজন খুব যোগ্য পাত্র পাওয়া গিয়েছিল, খানদানী ঘরের, ধনী বাপের সুযোগ্য পুত্র, কলেজে পড়ে। ওকে তাই-এর পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু পাড়ার প্রতিবেশীরা মার কান ভাঙিয়েছিল এই বলে, যে, পাত্রটি আধুনিকপন্থী সমাজ-সংস্কারক। বিয়ের পর

মেয়েকে ফ্রক্ পরাবে, স্কুলে পাঠাবে, চা-বিস্কুট খাওয়াবে। শিবরাম পন্থ অনেক বুঝিয়ে বললেন, "দেখুন, টাকা আপনাদের দিতে হবে না। আর, স্কুলেই যদি পড়ায়, তা হলে ক্ষতিটা কি? বিবাহের পর মেয়ে অন্যেরই হয়ে যায়। ওদের ইচ্ছামতো ওরা করবেই। আপনি প্রতিবেশীদের কথায় কান দেবেন না। এ-রকম সুপাত্র আপনি হাতছাড়া করবেন না।" সত্যি কথা বলতে গেলে শিবরাম পন্থের এ-সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু 'তাই'-এর ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন। শিবরাম পন্থজী সংস্কার-পন্থী ছিলেন, এইজন্যে আমাদের বাড়ীর লোকেরা শুরু থেকেই ওঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। যে মহিলাটি মায়ের কানে ঐ বিষমন্ত্র ঢেলেছিল সে মাকে মিথ্যা করে বলেছিল যে, ছেলেটির এক ভয়ংকর রোগ আছে। সেজন্য কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। শিবরাম পন্থকে তারা পাঁচশো টাকা উৎকোচ দিয়েছে। এই-সব কথা শুনে মা খুব চটে যান। খুব মুখ খুলে গালিগালাজ করতে থাকেন—"এত ভালো বর! তা' হলে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে না কেন? আমার মেয়েকে পাঁচশো টাকায় বেচে, আমাকে ধোকা দিতে চাচ্ছেন।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় দিদিমা আমাকে ডেকে বললেন, "শিবরাম পন্থকে বোলো, কালই যেন, যে করেই হোক, ঘর খালি করে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়।" এই শুনে আমার মনে খুব আঘাত লাগল। এ খবর এখন আমি কি করে ওদের দেব? আমি খুবই বিপদে পড়লাম। মা ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে উনি সব আন্দাজ করে ফেললেন। আমাকে মারবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, "বদমাইস কোথাকার! জায়গা ছেড়ে নড়বার নাম নেই। তোকেও সমাজ-সংস্কারকে বনতে হবে, তাই না? শিবরামের মেয়ে আমার পুত্রবধূ হবেন—বাবা রে বাবা! নির্লজ্জ কোথাকার। আবার বলছে—ওই মেয়েই আমার স্ত্রী হবে। দাঁড়া তোর স্ত্রী হওয়া দেখিয়ে দিচ্ছি। যা—, চলে যা এখান থেকে···। যাবি, না মারবো কোমরে এক লাথি?" আমি

তো ওখান থেকে পড়ি মরি করে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। ভাবছিলাম, এ খবরটা কি করে দিই, আর না দিলে ঘরে খাওয়া বন্ধ। আজ আমি বুঝলাম, ঘর খালি করাবার মতলবটা কি!

সুন্দরীতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, এই মনে করে ভাবলাম দিতুর কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করে দেখি।

তাঁর কাছে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। মধ্যের অন্ধকার কুঠরিতে দেখলাম, গংগুতাই আর সুন্দরী দুজনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আমার কান্নাও ফুঁপিয়ে উঠল। সুন্দরীর মা, অপমানিত হওয়ায়, বাড়ী ছেড়ে দেওয়া ঠিক করেছেন। এই-সব বৃত্তান্ত সুন্দরী 'তাই'-কে বলছিল। পরে আমরা তিন জনেই কাঁদতে শুরু করে দিলাম। মনে ভয় ছিল, আমার কান্না যেন কেউ না শুনতে পায়। কিন্তু ঠেকাতে পারলাম না নিজেকে। আমি ঐ অবস্থাতেই শিবরাম পন্থজীর কাছে গেলাম। উনি সব কথা আগেই শুনেছেন। আমাকে দেখেই বললেন—"কি? আমাকে বলতে এসেছ তো? আমি সব ব্যাপার জানি। তোমার মাকে বোলো, আর দু-চার দিনের মধ্যে জায়গা খালি হয়ে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত..." আমি আর থাকতে পারলাম না, একেবারে বলেই ফেললাম—"না, না, আপনি এখান থেকে যাবেন না। অন্ততঃ সুন্দরীকে আপনি নিয়ে যাবেন না, ও আমাদের কাছেই থাকুক।" আমি কি বলছিলাম, নিজেই জানি না। সুন্দরী যে কেন আমাদের কাছে থাকতে পারে না, এ-সব ব্যাপার বোঝবার মতো বয়স আমার ছিল না। গংগুতাই আর সুন্দরী, একে অন্যকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে 'তাই' বলছিল—"সুন্দরী, তুমি আমার চেয়ে কত সুখী! তুমি নিজের খুশিমতো বিবাহ করতে পারো। আর আমার অবস্থাটা দেখো!" প্রসঙ্গত বলল, যে তার ঐ বর পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু মা, দুষ্টগ্রহের প্রভাবে তার কত ক্ষতি সাধন করলেন। কিন্তু এখন আর এ বলে কি হবে?

বাপ রে বাপ ! আমি এই ঘরেরই এক নিরীহ জীব !

গংগুতাই-এর সুন্দরীর হৃদয়ে এক বড় আশ্রয় ছিল। সে আশ্রয় চলে গেল। আমার প্রিয় সখী আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল, আর এমন ভাবে গেল যে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শেষ কথাগুলি আমার বারবার মনে আসছে। যাবার সময় সুন্দরী যখন বলল—"আমি চললাম" তখন আমরা তিনজনেই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম। "তাই", ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—"সুন্দরী, আর আমাদের দেখা হবে না, তুমি আমাদের ঘরে আর আসবে না—" এই শুনে আমারও গলা ধরে এলো কান্নায়। আমি বললাম—"তাই এরকম কেন বলছ? ও যদি না আসতে পারে, নিদেন পক্ষে আমরা তো যেতে পারি ওদের কাছে। আমরাই যাব ওদের কাছে।"

আমরা তিনজনেই পরস্পরের দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকলাম। 'তাই' বলল—"আরে বাবা, তোমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি যে-কোনো সময়ে যেতে পারো। কিন্তু আমি তো এই বাড়ীরই এক অসহায় নিরীহ জীব,—কেউ যদি মারে, তো খাও মার, কেউ যদি বলে—যাও, তা হলে যাব, যদি বলে—না যেয়ো না—, তা হলে বসে থাকব—" গংগুতাইএর এই ভাষণের পুরো অর্থ ঐ সময় আমি বুঝে উঠতে পারি নি। আমি ঠিক করলাম, কালই স্কুলের ছুটির পর সন্ধ্যাবেলা সুন্দরীদের নূতন বাসা দেখতে যাব। আমার এই অভি-সন্ধি তাইকে বললাম। 'তাই' বলল "আমি সকালে যা বলেছি, তা সত্যি,—আমি যদি বলি, আমিও যাবো, তা হলে সাহস আছে আমার যাবার? এইজন্যই তো বলেছি, আমি এ বাড়ীর এক অসহায় নিরীহ জীব।"

সুন্দরীর ওখানে যাব বলে ঐ দিন আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। 'তাই' আমাকে বলল—"দেখ ভাই, সুন্দরীকে বলো আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যে করেই হোক, কোনো উপায়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসব। আর, তা যদি না পারি, তা হলে বোলো, কোনো দিন

যেন বাড়ীর কাছের রাস মন্দিরে এসে দেখা করে। আমাকে তুমি···" কথা আর এগুতে পারল না, পিছন থেকে এসে পড়ল মায়ের এক থাপ্পড়। থাপ্পড় লাগাতে লাগাতে মা বলতে লাগলেন—"বাদড়া মেয়েটা! মার কাছে থাকতে তোর খুব কষ্ট হয়, না?" আমি তো তখন ওখান থেকে দে চম্পট।

বিকালে স্কুলের ছুটির পর আমি সুন্দরীর বাড়ী যাবার রাস্তা ধরলাম। সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হল। তার মার সঙ্গেও দেখা হল—বললাম—"স্কুলের ছুটির পর আমি রোজ আপনার কাছে আসব।" উনি আমাকে উপদেশ দিলেন যে, মা যদি আপত্তি করেন তা হলে জোর করে এখানে আসবার দরকার নেই। কালকের কথা তাঁকে কিছু বললাম না। কেবল সুন্দরীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে এলাম। সুন্দরী বললে—"তা হলে তো গংগুতাইকে তার মা খুব মেরেছেন! ওকে বোলো আমি নিশ্চয়ই কোনো দিন দেখা করে আসব।" আমি যখন ঘরে ফিরলাম, তখন দেখলাম সব চুপচাপ। মা আর 'তাই', দুজনেই বাড়ী নেই। তখন এই ভেবে খুশি হলাম, যে আমার দেরি করে ফেরা মার নজরে পড়বে না। মা আর 'তাই', অনেক দেরি করে বাড়ী ফিরল। 'তাই' আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানালো, যে তাকে দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল মা পাত্রপক্ষের কাছে। তাই-এর মেজাজ চড়ে গিয়েছিল, তবু সে ধীরে ধীরে বললে, "আমি সুন্দরীর বাবাকে চিঠি লিখেছি, সেটা তাঁকে দিয়ে দেবে। তুমি যদি চিঠিটা না পড়ো— তা হলেই তোমাকে দিতে পারি—খেয়াল থাকে যেন। না হলে······" আর কিছু বলল না সে।

শেষ সিদ্ধান্ত

পরের দিন খেয়ে দেয়ে স্কুলে যাচ্ছি এমন সময়, 'তাই', ইশারা করে ডেকে চুপি চুপি বলল, "উপরের অন্ধকার কুঠুরির ট্রাঙ্কের নীচে চিঠিটা রাখা আছে, ওটা নিয়ে যেয়ো। কিন্তু মনে থাকে যেন, তুমি কথা দিয়েছ, চিঠিটা পড়বে না।" এই বলে সে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেল। আমি চট্ করে উপরের তলায় গিয়ে লুকিয়ে রাখা চিঠিটা নিয়ে এলাম। খামের উপরে শিবরাম পন্থ-জীর নাম লেখা আছে। নামটা ঠিক শুদ্ধভাবে লেখা হয় নি, কিন্তু হাতের লেখা খুব সুন্দর। এই দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বার বার আমার মন বলছিল, যে চিঠিটা খুলে পড়ে দেখি। স্কুল ছুটি হবার পর সোজা সুন্দরীব ঘরে পৌঁছে গেলাম। ভিতরে ঢুকবার আগে আমার চিঠিটা পড়বার ইচ্ছা হল। আমি পকেট থেকে বের করে উলটে পাল্টে দেখে, চিঠিটা খুললাম। এমন সময় মনে হল কে যেন খুব মধুর স্বরে বলছে—, এমন পাপ কার্য কখনোই করা উচিত নয়। সাম্‌নে দেখি, সত্যি সত্যিই সুন্দরী দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ডাকছে। ঘাবড়ে গিয়ে আমার হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। নিজের এই অপ্রস্তুত ভাব লুকোবার জন্য চিঠি উঠাবার ছলে নীচে ঝুঁকলাম। সুন্দরী আমাকে খুব আদর করে ডাকল, কিন্তু ওকে জবাব দেবার ধৈর্য আমার ছিল না। আমার আচরণে ওর মনে সন্দেহ হল, জিজ্ঞাসা করল "কি, হল কি? কথা বলছ না কেন?" বললাম, "কিছু না, "তাই" তোমার বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছে" বলে, তার হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিলাম। সুন্দরী জানতে চাইল, কি লেখা আছে চিঠিতে। আমি আবার ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। ও কি সত্যি সত্যি আমার মনের কথা জানতে পেরেছে! আমি বললাম "আমি পড়ে দেখি নি।" বলে, ওর সঙ্গে ভিতরে গেলাম। সুন্দরী অনেক কথা বলল। মন ঠিক সুস্থ না থাকায় ও-সব কথা শুনে আমার আনন্দ হল না। আমি তার ওখান থেকে চলে এলাম। বাড়ী ফিরবার

পর দেখলাম, এক মোটর কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার থেকে কিছু লোক নামছে। আমার বয়সের একটা ছেলেও ছিল তাদের সঙ্গে। ঐ ছেলেটির চেহারা যেন চেনা-চেনা মনে হল।

ভিতরে গিয়ে তাই-কে কোথাও দেখতে পেলাম না, সমস্ত ঘর খুঁজে দেখলাম। বাড়ীর উঠানে গেলাম, সুন্দরীর যাবার দিন এইখানেই দুজনের দেখা হয়েছিল। আজ দেখি সেই পাকুড় গাছের নীচে শিব-মন্দিরের পাশে বসে, 'তাই' চোখের জলে মুখ ভাসাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে মুখ দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ করে বলছিল—"হে ভগবান। হে শঙ্কর! কি এমন পাপ করেছিলাম যে আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছ?" পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ওর শোকোচ্ছ্বাস দেখছিলাম। সে দৃশ্য বেশিক্ষণ ধরে দেখতে পারলাম না! আমি ধীরে ওর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললাম—"তাই! আমি তোমার চিঠি না পড়ে সুন্দরীর হাতে দিয়ে দিয়েছি। তার বাবা বাড়ী ফিরলেই সে তাঁর হাতে দিয়ে দেবে।" আমি ভাবলাম এ শুনে হয়তো ওর শোকোচ্ছ্বাস কিছু কমবে। 'তাই' বললে—"আর তার কি প্রয়োজন? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আজ সেই ব্যাপারের, শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" পরে কিছু ভেবে সে আমাকে বললে—"সুন্দরীও কি আমার চিঠি পড়েছে?" বললাম—"চিঠিতে যে ওর নাম ছিল না, ও পড়বে কি করে?" তাই, নিরাশ হয়ে উত্তর দিল—"সেও যদি পড়ত তা হলে ক্ষতি ছিল না।" স্নিগ্ধ স্বরে বললাম, "আমিও যদি পড়ে নিতাম তাহলে কি ক্ষতি হত?" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—"আমি তোমাকে পড়তে মানা করেছিলাম এইজন্য যে তোমার মুখে হয়তো কথা চাপা থাকত না। থাক গে, এখন ও-সব কথার প্রয়োজন চুকে-বুকে গেছে। যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে।" হঠাৎ চোখ মুছে সে এক দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। সেই রাত্রেই জানতে পারলাম তাই-এর দুঃখের কারণ। তাই-এর বিয়ের কথা সব পাকা হয়ে গেছে। ঠিক আট দিনের দিন প্রথম লগ্নেই বিবাহ দেওয়া হবে। মামাকেও পত্র লেখা হয়েছে। তাই-এর জন্য যে বর দেখা হয়েছে— তার নিজের কথা অনুযায়ী তার

বয়স হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর। তার প্রথম দুই স্ত্রী মারা গেছে। এখন এ তৃতীয় বধূ। সত্যি কথা বলতে গেলে বরকে দেখতে প্রায় ষাট বছরের মতো মনে হচ্ছিল। প্রথমা পত্নীর পুত্র এখন বেশ বড়ো। দ্বিতীয়া পত্নীর কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে। ওর ছেলে ওকে এ বিয়ে করতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, তার পিতা এই বিয়ের জন্য অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছেলের উপদেশ মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। গংগুতাইকে দেখার পর বার বার তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব এ বিয়ে নিষ্পন্ন হয়ে যাক। কী কী গহনাপত্র দেওয়া হবে তার এক ফর্দও উনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। আশেপাশের পড়শী প্রতিবেশীরা মাকে বলল—"বর আপনি খুব ভালো পেয়েছেন। খুব বড়লোক। আপনার মেয়েও তো বেশ বড় হয়ে গেছে। দোজবর হোক বা যাই হোক, এখানে এ-সব বিচার একেবারেই করবেন না। চোখ-কান বুঁজে এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন।" এই-সব উপদেশ বাক্যে উৎসাহিত হয়ে মা বিবাহের জোগাড়ে লেগে গেলেন।

ভোরবেলায়, কাউকে কিছু না বলে আমি শিবরাম পন্থজীর কাছে গেলাম! শিবরাম পন্থকে সমস্ত ব্যাপার জানালাম। বললাম—"এই নরকের থেকে গংগুতাইকে উদ্ধার করুন।" শুনে সুন্দরীর চোখ জল ভরে এসেছিল। শিবরাম পন্থও নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন শুনে। তারপর ধীরে ধীরে আমার পিঠে চাপড় দিতে দিতে বলতে লাগলেন—"ভাই, তুমি এখব খুব ছোটো, তা না হলে তোমার কাছ থেকেই আমি উপায় জেনে নিতাম। কিন্তু এখন এ আমার সাধ্য নয়। তোমার বোনের চিঠি আমার চিঠির সঙ্গে তোমার মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এর সমাধান যদি হয় তো ওঁর হাত দিয়েই হওয়া সম্ভব। না হলে নয়।" সমাধানের শেষ উপায় স্বরূপ পন্থ-জী মামাকে যথাশীঘ্র এখানে আসতে টেলিগ্রাম করে দিলেন। নিজের সমস্ত অপমান ভুলে, কেবল এক শেষ প্রয়াস করবার উদ্দেশ্যে পন্থজী মা ও দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি এ বিবাহের অনিষ্টকর বিষময় পরিণামের কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু

কোনো ফল হল না। প্রচুর গালাগালি খেয়ে ফিরে এলেন।

মামার তরফ থেকে কোনো চিঠি এলো না। শেষ আশাও ব্যর্থ হয়ে গেল। বরপক্ষের ঘোড়া বারান্দার সামনে এসে খাড়া হল। পুরোহিত ম'শায় তাড়াতাড়ি গলা ফাটিয়ে কিছু মন্ত্র পাঠ করলেন। ব্যাণ্ড বাজল। আর সে-ও এত জোরে জোরে যে শ্রোতাদের কানের পর্দা কেন যে ফাটে নি, সে-ও এক আশ্চর্যের বিষয়। যজ্ঞে বলিদানের জন্য পশুকে নিয়ে আসে। এই করুণ পরিস্থিতিতে ঐ বলিদত্ত পশুর আর্তনাদ যাতে শোনা না যায় সে জন্য পুরোহিত প্রচণ্ড স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আমার এ রকম মনে হল, গংগুতাইএর ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ যাতে না শোনা যায় সেই জন্যে পুরোহিত-প্রবর ঘোর গর্জ্জন করে "শুভ মঙ্গল-সাবধান"—বাক্য উচ্চারণ করছিলেন। এই যজ্ঞে আজ গংগুতাই-এর বলিদান হয়ে গেল।

শৈশবের সখাকে পেলাম

তাই-এর বিবাহের পর সুন্দরীর কাছে যাবার সময় পাই নি। একদিন সময় করে গেলাম সুন্দরীর কাছে। আমাদের দু-জনেরই ঔৎসুক্য ছিল পরস্পরের খবর বিনিময় করবার। কিন্তু দু-জনেই আজ বাকাহীন। সুন্দরীর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল। গদ-গদ কণ্ঠে সে আমাকে বলল—"ভাই, শেষ পর্যন্ত এই-সব কিছুই হয়ে গেল।" সেদিন শিবরাম পন্থও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরেছিলেন, বিয়ের বৃত্তান্ত তাঁকেও সব বললাম। মায়ের একগুঁয়েমী আর জিদের সকলেই খুব নিন্দা করলেন। বিবাহে মামা কেন এলেন না, এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। সব কথা হয়ে যাবার পর আমি উঠতে গেলাম, তখন শিবরাম পন্থজী বললেন "আমি ওর ছেলেকে পাঠাতাম তোমাকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্য। ছেলেটি বললে তোমরা দু-জনে নাকি খুব পরিচিত, একই ক্লাসে পড়তে ?" আমি

খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কে ? ছেলেটি কে ?"

"বিনায়ক।"

"বিনায়ক ?"

এমন সময় "হাঁ, হাঁ, বিনায়ক—আরে বাঃ রে বা ! ভাউরাও এত শীঘ্র আমায় ভুলে গেলে ?"—পিছনে ফিরে দেখি যে, আমার শৈশবের সঙ্গী, যার সঙ্গে মারামারি করেছি, ঝগড়া করেছি। দেখলাম, বিনাযক এখন বেশ বড় হয়ে গেছে, চেহারাও অনেক বদ্‌লে গেছে। আমাদেরই স্কুলে পড়তে আসছে শুনে খুব খুশি হলাম।

চতুর্থ দিন স্কুলে গেলাম। সেদিন বিনায়কও ছিল আমার সঙ্গে। নিয়ম মাফিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পর আমার ক্লাসেই সে স্থান পেল। ছেলেবেলাকার মনান্তর, বিদ্বেষ সব চুকে গেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় আমি সুন্দরীর কাছে যাই, বিনায়কও আমার সঙ্গে থাকে— ওর বাড়ী ঐ দিকেই কোথাও হবে।

একদিন স্কুলে যাবার আগে ওর কাছে গেলাম। ওর ঘরে ঢোকবার সময় কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"বাঃ কেমন সুন্দর মেয়েটি ! বিনায়কের জন্য যদি পাওয়া যায়, তা হলে তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দিই। ও যে বিয়ে দেবে এ বিষয়ে একটুও..." ঐটুকু শুনেই যেন বজ্রাঘাত হল আমার ওপর ! আমি ভিতরে না ঢুকে, ঐখান থেকেই সোজা দ্রুতপায়ে বাইরে চলে গেলাম। ঐ কথাগুলি বার বার আমাকে পীড়া দিচ্ছিল।

যে মুহূর্তে ঐ কথাগুলি শুনলাম সেই থেকেই আমার শৈশবের সমাপ্তি ঘটল। এক বিচিত্র ভাবে আমি স্বাধীন হয়ে গেলাম। বিনায়কের প্রতি এক তীব্র অনুযোগের ভাব এল। চিন্তাক্লিষ্ট ও ক্ষুণ্ণ মনে আমি স্কুলে গিয়ে পৌঁছলাম।

'তাই', বিবাহ কি হয়ে গেল ?

প্রতিদিনের মতো, দিন আসে দিন যায়। স্কুলের ছুটির সময়েও বিনায়কের সঙ্গে কোনো কথা বলি নি। সন্ধ্যাবেলাতেও আমি বিনায়ককে এড়িয়ে গেলাম এবং সুন্দরীর কাছে না গিয়ে সোজা বাড়ী ফেরবার মতলব করলাম। শেষ পর্যন্ত বিনায়ক জোর করে আমার সঙ্গেই ভিড়ে গেল। দু-তিন বার রাস্তায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"আজ সকাল থেকেই তুমি এ রকম ব্যবহার করছ কেন আমার সঙ্গে ?" আমার বাড়ীর রাস্তার মোড় আসতেই আমি ঘুরে বাড়ীর রাস্তা ধরলাম। এতে বিনায়ক আশ্চর্য হয়ে বলল —"এ কি ! আজ সকালেও আমার ঘরে আসো নি, আর এখনো আসবার মতলব দেখছি না, ব্যাপার কি ? আজ তো আমার তোমাকে এক সুখবর শোনাবার ছিল।" এই বলে সে তার নিজের কাছে টেনে নিল আমাকে। ভালো খবর শোনাবো, এই কথা শুনেই আমার মন এত ক্ষুব্ধ হয়ে গেল কেন ? বোধহয় তার সম্বন্ধে যে-সব কথা স্বকর্ণে শুনেছি, সেই-সব কথাই হবে। সেটা তার পক্ষে অবশ্য ভালো খবরই। কিছুক্ষণের জন্য আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। পরে একটু কৌতূহলও হল, ভাবলাম, সেই ভালো খবরটা শুনেই অবিলম্বে চলে যাব। ওর ঘরের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। এই দেখে বিনায়ক হাসতে হাসতে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করবে না তো ?" আমি একটু রেগে উঠে বললাম—"তোমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে যাব কেন ?" সে হাসতে হাসতে বলল—"বাড়ীতে আমার বিবাহের কথাবার্তা চলছে।" গম্ভীর ভাবে হাঁ, বলতে গিয়ে চট করে জিজ্ঞাসা করলাম—

"মেয়েটি কে ?"

সে বললে "তুমিই আন্দাজ করো। তুমি তাকে জানো।" আমি ক্রোধে, ক্ষোভে তিরস্কারপূর্ণ ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম—"কে ? সুন্দরী তো ?"

"হাঁ, ঠিক চিনেছ।"

"সুন্দরী !!"—ফের অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সখেদে জিজ্ঞাসা করলাম, এবং তার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ওখান থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। রাস্তায় ঐ এক চিন্তা। ঘরেও ঐ একই চিন্তা। মনের ভিতর কোলাহল শুরু হয়ে গেল। রাত্রে ঘুম হল না। অনেক রাত হল, তবু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও রাত্রি নিদ্রাহীন কেটে গেল। সকালে মাথা আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সারা শরীর দিয়ে গরম ভাপ্ বেরোচ্ছিল। ওঠবার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু উঠতে পারছিলাম না— মাথা ভয়ানক ঘুরছিল। এমনিতে আমি খুব সকাল সকাল উঠি। আজ এত দেরি হয়ে গেল তবু এখনো পর্যন্ত ওঠা হল না। এই দেখে বাড়ীর লোকেরা আমাকে জাগাতে এসে দেখল, খুব জ্বর এসে গেছে।

সকলে খুব ঘাবড়ে গেল। হঠাৎ জ্বর আসার কারণ কেউ ধরতে পারল না। একদিন গেল, দুদিন, তিনদিন, চারদিনও চলে গেল। জ্বর বাড়তে লাগল। জ্বরের ঘোরে আমি কী বক্-বক্ করেছিলাম জানি না। দিনে দিনে জ্বর বেড়েই চলল। সতেরো বা আঠারো দিনের পর মধ্যরাত্রে আমি জেগে উঠলাম। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম, বাড়ীর সব লোক হাত জোড় করে বসে রয়েছে। আর কে কে ছিলেন, ঠিক চিনতে পারলাম না! কিন্তু আমার বোন, গংগুতাই, বিছানার ওপর আমার কাছে বসে ছিল, এটুকু বুঝতে পেরে খুশি হলাম।

আমি আবার ঘরের সবাইকে দেখে নিলাম। আমার অত্যন্ত দুর্বল হাত তাই-এর কোলে রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম—" 'তাই', তোমার বিয়ে হয়ে গেছে না কি?" এ প্রশ্ন শুনে 'তাই', আমার কাছে এসে আমাকে বলতে লাগল, "তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে তো? তুমি আমাকে এ কী প্রশ্ন করলে?" ওর উষ্ণ অশ্রু-কণার একফোঁটা আমার গালের ওপর এসে পড়ল। ও হঠাৎ কাঁদছে কেন? ছত্রিশ ঘণ্টা পর্যন্ত আবার আমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। আমি টের পাই নি। কিন্তু এর মধ্যে আমার বাড়ীর লোকেরা আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছিল। যখন আমার জ্ঞান

হল তখন সকাল এগারোটা বেজে গেছে। আমার মাথার কাছে একজন বসে ছিল। চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। তখন খুব করুণ স্বরে 'তাই' বলতে লাগল, "ভাই! ভাই! তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে?···ভাই, কবে তোমার জ্ঞান ফিরবে?—তোমার মনে কী আছে— বলো— কার বিবাহের কথা বলছ? আমার?—তুমি তো জানো, আমার বিবাহ হয়ে গেছে—" আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো—"না, না, তোমার বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম না।"

"তা হলে, আর কার বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছ? জ্বরের ঘোরে তুমি স্বপ্নে আর-কারও বিয়ে দেখেছ?"

"না, আমি বিয়ের স্বপ্ন দেখি নি। আমি তোমাকে সজ্ঞানেই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"তা হলে, কার বিয়ে? আমার, না তো কার? আমাদের ঘরে অবিবাহিত কে আর আছে বার বার কার বিয়ের সম্বন্ধে তুমি উল্লেখ করছ?"

আমার মুখের ডগায় কম করেও পঞ্চাশ বার ঐ তিন অক্ষরের নামটা এসে যাচ্ছিল। আমি নিঃশব্দে চোখ বুজলাম। খুব ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট বোধ করছিলাম। গংগু-তাই, নিম্নস্বরে তাড়াতাড়ি বলল—"ভাই, যা বলবার শীঘ্র বলে ফেল—, ঘরের লোকজন সব ভিতরে চলে গেছে খাবার খেতে--এই সুযোগে সব বলো, না হলে ওরা এসে যাবে।" "তাই" মনে আন্দাজ করে নিয়েছিল, যে আমার মনে কোনো গোপন কথা লুকিয়ে আছে। আমি আল্‌তো ভাবে তাই-এর কানে ঐ তিন অক্ষরের নামটা বলে দিলাম। ও আশ্চর্য হয়ে বলল—"কি বললে? সুন্দরীর বিয়ে?"

"হাঁ।"

"তোমাকে কে বললে যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে?"

"আমি জানতাম।"

"কি করে জানলে তুমি?"

"এই, এমনিই আমি জানতে পেরেছিলাম। স্রেফ্ এইটুকু বলে

দাও যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে কিনা।"

"পাগলের মতো কথা বোলো না।"

"তুমি বলেছিলে না, আমাকে সব বলবে? এখন তাড়াতাড়ি বলে দাও।"

"আরে, এ কী জিজ্ঞাসা করছ? তোমার কানে একটা ভালো খবর দিচ্ছি।"

আমি ঔৎসুক্য সহকারে কান আগে বাড়িয়ে দিলাম।

"দেখো···ঐ ওর বিয়ে না অ্যাঁ···" আরও কিছু পরিষ্কার করে বলবার আগেই—"আরে বাঃ, এই তো এর জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখছি!" এই ধরনের একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এলো। আর আমার ঐ ভালো খবরটা অর্ধ-পথেই থেমে রইল। আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম।

ইনি কে এবং কী?

"ভাউ, ও ভাউ, দেখো আমি এসে গেছি। তুমি এবার ঠিক হয়ে যাবে। আমার হাতের গুণই এইরকম।"

"আরে, আরে তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? বিয়ে হয়ে গেছে বলে লজ্জা পাচ্ছো? এসো, এসো, আমার কাছে বসো" এই বলে লম্বা এক ঢেকুর তুললেন, আর পানের বটুয়া নিয়ে সুপারী কাটতে লাগলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, এত ঘনিষ্ঠ আপনার লোকের মতো কথাবার্তা বলছেন—ইনি কে?

উনি ফের বললেন, "ওহে ছোকরা, শোনো, চটপট সেরে ওঠো। আবার নতুন বাড়ী ভাড়া করব। তুমি যতদিন না সেরে উঠছ, ততদিন এখান থেকে যেতে পারব না। নতুন বাড়ীতে যাবার পর, আমি আমার নিজের কাজ করতে চলে যাব, বুঝলে? আমি হাজার বার চিঠি লিখেছি যে এত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ো না, আমি

ওখানে যাচ্ছি, কিন্তু কেউ সে কথা শুনল না। আমি এ-ও লিখে-ছিলাম, যে এখানে এক ভালো পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। যাক্‌গে, গতস্য শোচনা নাস্তি— এখন আর বলে কি লাভ আছে! আমার গ্রহদশা খুব খারাপ ছিল—যা ভাগ্যে লেখা আছে তা হবেই। যাক্ বিয়ে হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমি এটা জানি, আমার কাজ কখনও খারাপ হবে না, কারণ আমার জন্মলগ্নে গ্রহদৃষ্টি শুভ ছিল। কেবল একটি গ্রহই খারাপ ছিল— যদি চন্দ্র কুণ্ডলীর ঠিক শুভস্থানে এসে যেত তা হলে এত দিনে কোনো প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তাও হয়ে যেতে পারতাম"— দিদিমার দিকে তাকিয়ে এই-সমস্ত ভাষণ চলছিল। দিদু বেচারী চুপচাপ বসে শুনছিল। এমন সময় মা জোরে হাঁক দিলেন—"ভাউএর খাবার তৈরি হয়ে গেছে—।" ঐ অপরিচিত ব্যক্তিটি বলতে লাগলেন—"আনো, আনো, আমি তো এখানেই বসে আছি, আমিই ওকে খাইয়ে দেব।"

তখন মা দিদিমাকে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "না, না, আর কেউ যেন ওকে না খাওয়ায়। তুমি নিজে খাওয়াও, নয়তো আমি এসে খাইয়ে দিচ্ছি।" এই শুনেই ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলেন—"দেখুন! শুরু থেকেই ওর স্বভাব এই রকমই। ব্যস্, নিজের মনে মনে যা ঠিক করেছে, তা-ই করে ছাড়বে। আমার জন্ম-পত্রিকায় এই রকমই লিখেছে, ওর এক অক্ষরও এ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। হাতে পয়সা টিকবে না, আঙুলের রেখাচক্রে নয়টি শঙ্খ-রেখা। যদি এর জায়গায় দশটি হত, তা হলে সব নষ্ট হয়ে যেত। এমনি আমার কিছু গ্রহ খুব শক্তিশালী আছে। এক-আধটা গ্রহ ঠিক জায়গাতে নেই। না হলে আমি প্রচুর ভূসম্পত্তি-শালী হতাম।

রাওজীর এখানে আসার দরুনই হোক, বা আমার ভোগকাল শেষ হয়ে যাবার দরুনই হোক, আমি ঐ দিন থেকে সুস্থ হয়ে উঠলাম। দু-চার দিন বাদে, আমি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিলাম; শিবরাম পন্থ-জীও দু-একবার দেখতে এসেছিলেন। গংগু-ভাই, আমাকে যে ভালো খবর শোনাবে বলেছিল, তা শুনিয়ে দিয়ে গেছে।

রাওজী নতুন বাসা ভাড়া নিয়েছেন। আমরা বেশ আরামেই থাকতে লাগলাম। রাও-জী আমাকে খুবই আদরযত্ন করতে লাগলেন। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে স্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করলাম। আবার সুন্দরীর ওখানেও যাতায়াত শুরু করে দিলাম। এই করে চার মাস চলে গেল। রাও-জীর উদারতা ও দাক্ষিণ্য আগের মতো আর রইল না। আমি যে-সব জিনিস আনবার জন্য বলে দিতাম, সে-সব জিনিস আনতেন না। কখনো কখনো আশ্বাস দিতেন। একদিন উনি, সিমলায় আর কলকাতায় যে কাজ নিয়েছেন, সেটা নিষ্পন্ন হলে কত টাকা পাবেন, তার একটা হিসাব দিলেন। এমন একটা আভাস পেলাম তাঁর কথায়, যে গাড়ী-ঘোড়া চাকর-বাকর ইত্যাদি সব সময় আমার হুকুমের অপেক্ষায়, সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে দেখি যে রাওজী আর মা'র সঙ্গে তুমুল ঝগড়া চলছে। আমি এসে রাওজীর বাইরের ঘরে বসলাম। কিছু কথাবার্তা কানে আসছিল ঃ

"আমি প্রথম থেকেই সমস্ত লক্ষণ জানতাম, যে এ অবস্থা বেশি দিন পর্যন্ত থাকবে না।"

"ঐ সোনার কণ্ঠিটা দিয়ে দাও। আমার "পাঁচশো টাকা" ফাজল্-পুরের নবাবের কাছ থেকে আসছে। আজ সকালেই আমি তার করে দিয়েছি। বোধহয় কাল অথবা পরশু তার মারফৎই টাকাটা এসে যাবে। আমি ঐ কণ্ঠিটা চাইছি, কাল শিমলায় বড়লাট সাহেবের জন্য ভেট নিয়ে যাব। তবেই তো আমার কপাল মজবুত হয়ে উঠবে। টেলিগ্রাম আসলেই আমি চলে যাব। যদি আমার উপর তোমার বিশ্বাস না থাকে, তা হলে ঠিক আছে, আমি এমনই চলে যাব— আমার এত পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ বা একশো করে টাকা পাঠিয়ে দেব। তোমার যা করবার আছে তা করে নিয়ো। কিন্তু আমার যখন টাকার দরকার হল— আমি টাকা চাইছি, তখন তুমি তা দিচ্ছ না। এবার তোমার কণ্ঠিটা নিয়ে এসো।"

"চারদিন আগে আমার বালা জোড়া গেছে, আজ আমার কণ্ঠিটা

চাইছেন। কিন্তু প্রাণ গেলেও আপনি ওটা পাবেন না।…"

"—এটা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, খুব বেশি হলেও, চারশো টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এবং সেটা সব উড়িয়ে দেবার পর আমার গহনা-গাটির ওপর টান পড়েছে। মিথ্যা কথা বলে আপনি আমার বালা জোড়া নিয়েছেন। ভালোই হয়েছে, আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। না হলে তার টাকাটাও উড়িয়ে দিতেন। আমি বেশ জানি আমার আর আমার ছেলের ভাগ্যে কী লেখা আছে। ঐ হতভাগা ছেলেটার কাছ থেকে আমি কী সুখ পাব, তা-ও জানি।"

"ছি! ছি! ছি! এ সমস্ত ভুল! আমার ছেলে খুবই ভাগ্যবান। আমি পরশুদিনই ওর জন্ম-কুণ্ডলী তৈরি করেছি। ওর গ্রহ-লগ্ন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এই দেখে যোশীও দাঁত দিয়ে আঙুল চেপে ধরেছিল অবাক হয়ে। ব্যস্, ওই এক-আধটা গ্রহের একটু নিম্নস্থান আছে বটে। যদি ওটা ঠিক হত তা হলে ও রাজ-চক্রবর্তী হতে পারত। তা ছাড়া ওর জন্ম-পত্রিকা বলছে, ও পিতৃধনে ধনী হবে।…আচ্ছা— তা হলে ঐ কণ্ঠিটা দিচ্ছ তো… না কি?"

"আপনি বার বার ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি আপনাকে কম করেও পঞ্চাশ বার বলেছি, এবং আবার বলছি, কান লাগিয়ে শুনুন, আমি আপনাকে কিছুই দেবো না। পরশু-দিন আমার বালা-গাছা নিয়ে গেছেন, আগে সেটা ফেরত নিয়ে আসুন।"

"হ্যাঁ, তোমার বালা আমি চলে যাবার পর অবশ্যই আসবে, আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমার গ্রহদশা তেরো দিনের দিন শেষ হয়ে যাবে। এইজন্যে আর দু-চার দিন যা একটু কষ্ট ঐ গ্রহের কারণেই হবে। আমি পরশু গ্রহ-শান্তি করবো…"

এমন সময় হঠাৎ আমার হাত থেকে একটা বই নীচে পড়ে গেল! তার আওয়াজ শুনে রাও-জী বলে উঠলেন, "কে? ওখানে কে?" মা বললেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন এ-সব

প্রসঙ্গ থামান, ছেলে বাড়ী এসে গেছে বোধ হয়। তার সামনে আমাকে আর অপমান করবেন না।"…"তুমি সব সময় আমাকে অনাদর কর, এ আমি জানি।" এই বলে তিনি বাইরে এসে আমাকে বললেন, "কি রে, কখন এলি ?" আমি বিপদে পড়লাম, ভাবছিলাম যদি তিনি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করেন তা হলে কী উত্তর দেব ? আমি ওঁর কথা এড়াবার জন্য নীচে পড়ে যাওয়া বইগুলি ওঠাতে লাগলাম।

যে-সব কথোপকথন শুনেছিলাম মনে মনে সে সব উলটে পালটে বিচার করে দেখছিলাম। পরের দিন সাড়ে চারশো টাকার মনি-অর্ডার আসবার কথা ছিল। তা না আসায় রাওজী খুব গালিগালাজ করছিলেন। বলছিলেন গ্রহদশা শেষ হয়ে আসবার সময় এই রকম দুর্ভোগ হয়। সেইজন্য যতক্ষণ গ্রহদশা থাকবে ততক্ষণ ভুগতেই হবে। মনি-অর্ডারের পিয়ন প্রতিবেশীদের বাড়ীতে মনি-অর্ডার বিতরণ করেছে, কিন্তু রাওজীর নামে কোনো মনি-অর্ডার আসে নি। রাও-জীর গ্রহদশা খতম হয়েছে, তবু তাঁর দুর্ভোগ শেষ না হওয়ায় গ্রহকেই শাপান্ত করতে লাগলেন।

অল্পবিস্তর দোষ আমার উপরও এসে পড়ল। এতদিন আমি তাঁর নয়নের মণি ছিলাম। এখন সেই পিতৃস্নেহের চিহ্ন কমে যাচ্ছে দেখা গেল। পূর্বে মা'র সঙ্গে তাঁর ব্যবহার খুব শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন তারও পরিবর্তন হতে লাগল। আজ পর্যন্ত তাঁকে আমার সামনে কখনো কথা-কাটাকাটি করতে দেখি নি। কিন্তু এখন সে-সব আমার সামনেই হতে লাগল। আমার মা-টিও কম যান না। এই জন্য গর্জন-বর্ষণ সহ তুফান শুরু হয়ে যেত। এই রকম ঝড়-তুফানের জন্য আমার বাল্যকাল বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রাওজী মাকে চড়চড়া কথা বলতেন বটে, তবে কখনো মা'র গায়ে হাত ওঠান নি। আর মা যখন তার প্রত্যুত্তর দিত তখন তার কর্কশ রূঢ় আওয়াজের সামনে রাওজী নিরুত্তর হয়ে যেতেন।

রাওজীর সমস্ত নজর দু-একটি বস্তুর ওপর ছিল। একদিন উনি বললেন, "আজ আমার যে করেই হোক যেতেই হবে। গাড়ী

ভাড়ার পয়সা নেই। তাই তোমার সোনার কণ্ঠিটা দিয়ে দাও। একদিন আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাব। আমার সমস্ত-কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদের আর দেখা দিতে আসব না।" শুরুতে উনি বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলছিলেন, তারপর ক্রমে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন।

রাওজী চলে গেলেন

সেদিন রাওজী মার ওপর হাত ওঠাতে গিয়েছিলেন। মা তীব্র স্বরে বললেন—"খবরদার! আমার গায়ে হাত তুলো না! আমার ছেলের সামনে যদি আমাকে মারো, আমি সেই মুহূর্তে আত্মহত্যা করব।" মা রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন। মা'র ক্রোধের মূর্তি অনেকবার দেখেছি, কিন্তু আজকের ক্রোধের চেহারা কিছু অন্য-রূপই ছিল। রাওজীও ঐ দেখে থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে মায়ের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। আজ পর্যন্ত কখনো মাকে চোখের জল ফেলতে দেখি নি। সেদিন তাঁর কান্নার রূপও অন্য রকম ছিল। কোমরের ওপর হাত রেখে তিনি বলতে লাগলেন, "ব্যস্, আর নয়—এ পর্যন্ত আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আজ থেকে আমি লেশমাত্র সহ্য করব না। আপনার যেখানে খুশি যান, যা ইচ্ছা হয় প্রাণভরে করুন। এই আপনাকে বলছি, আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকব না। আমাকে সামান্য স্ত্রীলোক ভাববেন না। আমি আমার কর্তব্যে দৃঢ়। যা আমার মনে আসবে, তা-ই আমি করব। আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাব। ভিক্ষা করবার অবস্থা যদি এসে যায়, তবে তাই করব…।

…"কিন্তু এখানে থেকে আপনার সঙ্গে বাস করা আর চলবে না। এখন পর্যন্ত যা-কিছু হয়েছে, তা যথেষ্ট হয়েছে।" মা বলতে বলতে কিছুক্ষণ থেমে গেলেন। তাঁর গলা ভার হয়ে আসছিল, ধৈর্যও কমে এসেছিল। সামান্য ক্ষণের জন্য থেমে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে

শুরু করলেন, "যেতে চান, বেশ যান। আপনাকে আবার সন্ন্যাসী হতে হবে তো। আপনার স্ত্রী, এইজন্য আপনি ভাববেন না যে আমি ভয় পেয়ে যাব—।" মা'র গলা ধরে এল, চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। যতই জল ঝরতে লাগল ততই তাঁর সন্তাপও শান্ত হতে লাগল। মনে কর যেন অন্তরের লেলিহান কোপাগ্নি-শিখাকে অশ্রুধারা শান্ত করে দিল। মায়ের ওই সন্তপ্ত রূপ, দৃঢ়তা-পূর্ণ বাগ্‌বিস্তার এবং ওই সময় তাঁর ভয়ংকরী মূর্তি ইত্যাদি দেখে রাওজী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, একেবারে স্তব্ধ হয়ে। কিছুক্ষণ পরে কুর্তা আর পাগড়ী পরে বাইরে বেরোলেন। মা এক কোণে বসে খুব কাঁদতে লাগলেন। আজ পর্যন্ত তাঁকে এত কাঁদতে দেখি নি। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। তখন আমি ছোট ছিলাম না, অনেক কিছুই বোঝাবার ক্ষমতা হয়েছিল। আমি ভাবলাম মা'র কাছে গিয়ে এক-আধটা সান্ত্বনা বাক্য আদর করে বলি। ভয়ে ভয়ে একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর লক্ষ্য আমার দিকে ছিল না। আমি সাহস করে আরো একটু এগিয়ে তাঁর কাঁধের ওপর হাত রাখলাম। উনি মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন—"নির্লজ্জ কোথাকার! যা, যা এখান থেকে, আমার কাছে আসিস না। তুইও ঐরকম। তোদের জন্ম অন্যের সুখের জন্য নয়। বড় হলে তুইও তোর স্ত্রীর ওপর ঐরকম অত্যাচার করবি— তাকেও সারা জন্ম কাঁদাবি। যা এখান থেকে! এখন থেকে আমার চোখের সামনে আর আসিস না। উনি তো চলে গেলেন, তুইও যা, আমি নিজেরটা দেখে নিতে পারব।"

এই-সব কটুবাক্য শুনে আমার হৃদয় হতাশা আর দুঃখে ভরে গেল। মার কাছে গিয়ে খুব আদর করে কথা বলে বোঝালে উনি সান্ত্বনা পাবেন, এই ভেবেই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার এই-সব বুদ্ধিবিচারের ওপর অনেক ঠাণ্ডা জল পড়ে গেল। আমি এখন পুরোপুরি ভাবে জেনে গেলাম, যে আমাকে মা'র একটুও ভালো লাগে না। তিনি আমাকে এখন প্রাণভরে ঘৃণা করতে আরম্ভ

করেছেন। এই-সব ভেবে আমিও মা'র কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকি। আমার সন্দেহ ছিল যে বোধহয় রাওজী আর আসবেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই রাও-জী এসে হাজির।

দু-তিন দিন খুব চুপচাপ কেটে গেল। তাঁর মায়ের কাছে যাবার কথা ছিল, মা গেলেন না। রাওজীরও যেন কোথায় যাবার কথা ছিল, গেলেন না।

তাই-ও এই চারদিনের মধ্যে এখানে আসে নি। আমি তাকে এ-সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করার জন্য অধীর হয়েছিলাম।

ফের একদিন রাত্রে সব ওলট পালট হয়ে গেল। রাওজী বললেন, তিনি চলে যাবেন। কিন্তু এরকম তো বহুবার বলেছেন, আমরা ওঁর কথা কেউ কানে তুলি নি। আজ তাঁকে বিশেষ সন্তপ্ত দেখলাম, মুখে বক্‌বকানিও চলছিল—"আমি জানি তুমি কার জোরে এত দেমাক দেখাচ্ছ। জানি, তুমি তোমার ভাইয়ের অনুগত। আর সেইজন্য এত আত্মম্ভরী বড়াই কর। দোজবরে তো জামাই করেছ এবং সেও খুব বড়লোক। আর তোমার স্বামী ভিখারী। এখন তোমার তারই জন্য যত চিন্তা?" এতক্ষণ পর্যন্ত মা চুপ করে ছিলেন, কিন্তু যখন জামাইয়ের কথা উঠল তখন তিনি মৌনের খোলস ছেড়ে বের হয়ে এলেন এবং সন্তপ্ত হয়ে বললেন—"বাস্, আর একটা কথাও আপনার শুনতে চাই না। এই আমার কণ্ঠি নিন্, আর যা-কিছু বাকি রয়ে গেছে তাও নিয়ে যান, আমি চললাম। আপনি বলছিলেন না, কোনো খুঁটির জোরে এত রোয়াব দেখাই? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি" বলে সোজা ঘর থেকে বাইরে চলে গেলেন।

আমি ভাবি, কারো জীবনে আমার মতো এত পরিবর্তন আসে নি। শৈশব থেকেই আমার পরিবেশ, আমার বড় হয়ে ওঠা, আমার অভিজ্ঞতা, কার্যকলাপ, চিন্তাপ্রণালী ইত্যাদি অন্য সব লোকেদের চেয়ে কিছু ভিন্ন প্রকারের ছিল। কয়েকবার প্রমাণ পেয়েছি, আমার চিন্তাপদ্ধতি বয়স অনুপাতে বেশ পরিপক্ক ছিল। আমার স্মৃতিশক্তিও বেশ প্রবল ছিল।

বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবার পর, মা চলে গেলেন—বাড়ী

ছেড়ে। কিছুক্ষণের জন্য রাওজীর কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। তারপর পনেরো মিনিট বাদে উনি আমাকে ডেকে বললেন – "ভাউ. ভাউ, একটু তাড়াতাড়ি যাও তো, দেখো তো কোথায় গেল ও? তোমার দিদিমার কাছে গিয়ে থাকবে হয়তো। দেখো তো, কোথাও গিয়ে আবার আত্মহত্যা করল না তো?" এই কথা শুনেই আমি দৌড়তে দৌড়তে দিছুর কাছে পৌঁছলাম। রাস্তায় ভাবছিলাম, প্রথমে দিছুর ওখানে যাব, না, প্রথমে দু-চারটে কুঁয়ো-টুঁয়োয় উঁকি মেরে দেখব। শেষ পর্যন্ত দিদিমার কাছেই গেলাম। দেখি মা ওখানে বসে কাঁদছেন। সন্ধ্যাবেলায় আমাকে বাড়ীতে পাঠাবার সময় দিছু বললেন—"গিয়ে দেখো, রাওজী আবার কি করছে।" আমি বাড়ী পৌঁছে দেখি, দরজায় তালা লাগানো। আমার বোম্বাইএর কথা মনে হল। ছেলেবেলায় আমি দরজায় এই রকম তালা লাগানো দেখেছিলাম। দিছুর কাছে গিয়ে বললাম যে দরজায় তালা লাগানো আছে। মা প্রথম থেকেই এই রকমই কিছু কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমার কৌতূহল হয়েছিল বলে সকালে উঠেই আবার দরজাটা দেখে এলাম। দেখলাম ঐ একই ভাবে তালা লাগানো। আমার সমস্ত বই ঐ ঘরের ভিতর ছিল। এই-জন্যে স্কুলে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতে হত। আর ঘরেও তো কোনো সুখ নেই। সেজন্যে কাউকে না জানিয়ে সুন্দরীর ওখানে গেলাম।

ঐ দিন শিবরাম পন্থজীর শরীর ভালো ছিল না বলে তিনি কাছারী যান নি। এমন অসময়ে ওখানে আসতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কি তুমি স্কুলে যাও নি?" ব্যস্, ঐ প্রশ্ন শুনেই আমার মুখ দিয়ে ঘরের সব বৃত্তান্ত বেরিয়ে এল। তিনি সমস্ত বিষয় শুনে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে, আমাকে গভীর স্নেহে আদর করতে করতে বলতে লাগলেন—"ভাউ, অনেক দিন থেকে আমি তোমাকে কিছু বলব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু এখনও ছোট আছ, সেইজন্য যা কিছু তোমাকে বলব, তার গুরুত্ব হয়তো বুঝতে পারবে না, এই ভেবে তোমাকে কিছু বলি নি। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুনে আমার মনে হচ্ছে যে তুমি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-

সম্পন্ন। তুমি তোমার ভবিষ্যৎকে সহজে বুঝতে পারবে! আমি তোমাকে যা-কিছু বলব তা তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আমার এ ধারণা ঠিক কি না ?"

শিবরাম পন্থ কী বললেন

আমি "হাঁ" বলতেই, শিবরাম পন্থ-জী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বলতে লাগলেন—

"ভাউ; তুমি নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু চিন্তা করো নি, এইরকম মনে হচ্ছে—

"—এখন তুমি একটু ভেবে দেখো. তোমার পড়াশুনা যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবে তত তুমি তোমার পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে। তোমার বাবার অবস্থা কী রকম, তোমার মায়ের স্বভাব কি রকম, এ যদি তুমি না বোঝার চেষ্টা কর তা হলে তুমি কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। নিজের পরিশ্রমের ওপর আস্থা রেখে, নিজের শক্তিতেই তোমাকে উপরে উঠতে হবে! যতদূর সম্ভব তুমি নিজের পরিশ্রমে তোমার পড়াশুনা শেষ করো। সঙ্গে সঙ্গে যতগুলি স্কলারশিপ্ আছে, সে-সব নিজের চেষ্টায় পাবার চেষ্টা করা উচিত। এতে করে তোমার খাওয়া-পরার বোঝা আর কারো ঘাড়ে পড়বে না। এই-সব বিবেচনা করে তোমাকে খাটতে হবে এবং পড়াশুনায় আরো অনেক উন্নতি করতে হবে। অবশ্য এটা বলছি না যে তোমার পড়াশুনা ভালো হচ্ছে না। কিন্তু তোমাকে যখন নিজের জীবনকে নতুন ঢঙে তৈরি করতে হবে তখন তোমার সব সময় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এতেই তোমার মঙ্গল। আমি এইজন্য তোমাকে বলছি যে তোমার বুদ্ধি খুব প্রখর। কিন্তু যদি তুমি অহংকারে মত্ত হয়ে থাকো, তা হলে তোমার দুর্দশা হতে দেরি লাগবে না। যদি তোমার বুদ্ধিকে কাজে না লাগাও, তা হলে তোমার বুদ্ধি থাকলেও না থাকারই সামিল হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—"আমি যে তোমাকে এত আন্তরিকতার সঙ্গে এ-সব বলছি, তার কারণ তোমাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। তোমার প্রতিভা আছে। তোমার এই করুণ পরিস্থিতি এবং তোমার প্রতি তোমার মায়ের ব্যবহার দেখে বিশেষ দুঃখ হয়। তোমার মা'র মধ্যে এক মহৎ গুণ আছে। লোকে তার সম্বন্ধে যা-ই বলুক, আমি তার কোনো দোষ দেখি না। আমি তাকে স্নেহ করি, কারণ ও খুবই দৃঢ়চেতা ও তেজস্বিনী। ওর গুণাবলী তোমার উন্নতির পক্ষে খুব উপযোগী হতে পারে। তবে একটা ভয়ের কথা এই যে, যেখানে উপযোগী হওয়া দরকার সেখানে যদি তিনি প্রত্যক্ষ বাধাস্বরূপ হয়ে যান, তা হলে এই-সব গুণ তোমার কোনো কাজে আসবে না। তোমার মায়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আত্মাভিমানী স্বভাবের গুণ তুমি গ্রহণ করবে, তা হলে কোনোদিন-না কোনো দিন তুমি নিজের নাম উজ্জ্বল করে তুলতে পারবে।

"আর-একটা কথা তোমাকে বলতে চাই—তোমার মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বভাবের। যদি তাঁর মনে আসে যে তোমার বিয়ে দেওয়া দরকার তা হলে সেটা সম্পন্ন করতে তিনি মোটেই দেরি করবেন না। তোমাকে বলছি, তুমি অন্যভাবে অন্য বিষয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন কোরো। তবে, আঠারো বৎসর শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং তারপরে আরো চার বৎসর চাকুরি ও ধনসঞ্চয়ের সময় তোমার মনে কিঞ্চিন্মাত্র বিয়ের চিন্তা আসা উচিত নয়। আজকের পরিস্থিতি দেখে এই কথাই মনে রাখা উচিত, যে তোমার পক্ষে বিয়ের কল্পনা কতখানি মারাত্মক হতে পারে। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, তুমি আজ-কাল মামার অন্নে পুষ্ট হচ্ছ। ওর মধ্যে যেন আর-এক ব্যক্তিকে পালন করার বোঝা না চাপে। আর-একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, যে আমি…"

শিবরাম পন্থ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল কারণ এই সময় তাঁর সঙ্গে কয়েকজন লোক দেখা করতে এলেন, এইজন্য তাঁকে চুপ করতে হল। আমাকেও ওখান থেকে চলে যেতে হল।

পুরো চার বছর কেটে গেল। আমি এখন যুবক। বাল্যকালে আমি একটু রোগা ছিলাম, কিন্তু এখন বেশ লম্বা চওড়া শরীর হয়েছে আমার। অনেকের কাছেই, চেহারায় আমি সুদর্শন বলে গণ্য হতাম। কিন্তু আমার আর্থিক পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। আমার দাদাম'শায় স্বর্গত হয়েছেন। এইজন্য দিদিমা আমার মামার কাছে থাকতে গেছেন। মামা মা'কেও তাঁর ওখানে নিয়ে আসবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু মা, আমার লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে ভেবে মামার ওখানে গেলেন না। ক্লাসে আমি প্রায়ই, প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতাম। এইজন্য স্কলারশিপ ও অন্যান্য পুরস্কারাদি প্রায়ই অর্জন করতাম। আমার অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফল দেখে আমার মামাকে কখনো আপসোস করতে হয় নি।

স্কুলের মধ্যে আমাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছাত্র বলে গণ্য করা হত, এইজন্য পাত্রী-পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসা শুরু হল। কেউ মা'র সঙ্গে এ প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে আসত, কেউ বা মামাকে চিঠি লিখত। এই রকম হতে হতে একদিন মামার কাছে তাঁর এক বন্ধু-কন্যার প্রস্তাব এল। দিদিমারও এ প্রস্তাবে খুব আগ্রহ ছিল। মামা, খুব আগ্রহ প্রকাশ করে মা'কে খুব লম্বা চওড়া এক চিঠি লিখলেন, কিন্তু মা তার কোনো জবাব দিলেন না। আরো দু-একটা চিঠিপত্র এল। মা আমাকে দিয়ে উত্তর লেখালেন, যে গরমের ছুটির সময় যখন ওখানে যাবেন তখন সাক্ষাতে সব কথাবার্তা হবে। ক্রমে ছুটির দিন এসে গেল। আমরাও মামার বাড়ী পৌঁছে গেলাম। আমি তো সেই কথার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম এবং সুযোগ পেলেই আমার চরম সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করব। মা-ও ভেবেছিলেন যে মামা যখন প্রস্তাব করবেন তখন তাঁর নিজের বক্তব্য নিবেদন করবেন। ওদিকে মামা আর দিদিমা ভাবছিলেন যে মা কিছু বললে পর, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেটা জানাবেন। পরে একদিন দিদিমা প্রস্তাবটা করেই

বসলেন। আমি সেখানেই বসে ছিলাম। মা কেবল আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দিহু আবার সেই প্রস্তাবটা করলেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য! মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"যতদিন পর্যন্ত ভাউ অর্থোপার্জন না করছে ততদিন ওর বিয়ে সম্বন্ধে কেউ যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে না আসে।" তারপর আমার দিকে কটাক্ষ করে— "জানি না এই 'রায়-সাহেব' ভবিষ্যতে কী নমুনা দেখাবেন! আমার মতো অবস্থা যেন আমার বৌ-মার না হয়।"

মা'র মুখে এই উত্তর শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। চার বছর আগে শিবরাম পন্থ আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, যে, আমার মা'র এই দৃঢ়-চিত্ততা কখনো কখনো আমাকে খুব সাহায্য করবে—আজ আমার সেই উপদেশ মনে পড়ে গেল। মা'র এই দৃঢ়তার সামনে কারো কিছু বলবার সাহস রইল না। বিবাহের কথাবার্তা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। তবু, দিদিমা আর থাকতে পারলেন না, তিনি ধীরে ধীরে আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও বললাম, যে, মা ঠিকই বলেছেন, তাঁর ইচ্ছার বিপরীত আমি কিছু করতে পারি না।

'তাই'-এর বৃত্তান্ত

'তাই'-এর বিবাহ হয়ে গেলে, কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বামীর সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হল। এক বছর পর্যন্ত সে অনেক সহ্য করল। কিন্তু দু-আড়াই বৎসর পর তাই-এর স্বভাব একেবারে বদলে গেল। এই দুই-আড়াই বৎসর তার স্বামী খুব অত্যাচার করে তার উপর। কিন্তু পরে তাই-এর মধ্যে একটা বেপরোয়া, নির্ভীক ভাব এসে গেল। তার স্বামী তাকে মার-পিট করত। সে তাইকে কখনো সুখ বা আনন্দ দেয় নি। কখনো কখনো তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় তার গহনা-গাঁটি সব খুলে রেখে দিত। অথবা যদি 'তাই' গহনা-পত্র ওর মা'র কাছে রেখে আসত, তা হলে পরের দিন

সকালেই কোনো লোক পাঠিয়ে সেগুলি নিয়ে আসাত। এখন তো ওর মায়ের কাছে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল! কয়েক মাস বাদে একদিন ও বাড়ীতে এসেছিল। কিন্তু রাত দশটা নাগাদ এক চাকরকে দিয়ে তার স্বামী ডেকে পাঠাল। চাকরের কাছে খবর শুনে তাই-এর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চাকরকে বললো—"বলে দিয়ো এত রাত্রে আমি যাব না। সকালে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি নিজেই যাব।" দ্বিতীয়বার তার স্বামী খবর পাঠাল—যদি এখনি না চলে আস তা হলে আমি দ্বিতীয় বার বিবাহ করব।—আসলে এটা আমার মায়ের ধৈর্যের একটা পরীক্ষা ছিল। ভবিষ্যতে এর কী পরিণাম হতে পারে, এ-সব বিচার না করেই মা বললেন—"যা হবার তা হতে দাও, আমি কোনোক্রমেই তাই-কে তার স্বামীর কাছে পাঠাব না।" তাই-এর এ কথাটা ভালো লাগল না। তার মাকে নানা প্রকারে বুঝিয়ে 'তাই' সেই রাত্রেই স্বামীর কাছে চলে গেল।

কিছুদিন পরে আর-একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। খুব জরুরি কাজে মা আমাকে সকাল ছটা সাড়ে-ছটা নাগাদ তাই-এর ঘরে পাঠালেন। আমি কেবল দরজার কাছে পৌচেছি, দেখলাম এক স্ত্রীলোক ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। স্ত্রীলোকটিকে দেখে খুব ভদ্রবংশোদ্ভবা ব'লে মনে হল না। সে আমাকে খুব ঘুরেফিরে দেখতে লাগল। ঐ সময় ঠিক আন্দাজ করতে পারলাম না, স্ত্রীলোকটি কে হতে পারে। এই ভাবতে ভাবতে ভিতরে 'তাই'-এর কাছে চলে গেলাম। তাই-কে মায়ের নিমন্ত্রণের কথা জানালাম এবং তার স্বামীকে সে কথা বলবার জন্য তার ঘরের দিকে যেতে নিলাম, সে বললে— "থামো, এ সময় ভেতরে যেয়ো না" —আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মুখে কথাটা বেরিয়ে এলো — আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা তাই, এখনি যে স্ত্রীলোকটি সেজেগুজে বাইরে বেরিয়ে গেল—, ও কে?" এই কথা শুনেই, তাই-এর মাথা ঘুরে গেল এবং হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করল। বুঝতে পারলাম না, ও কেন কাঁদছে। পরে শান্ত হয়ে, চোখ মুছে 'তাই'

আমাকে বলল—"ভাউ, তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও, আমি আজ যেতে পারব না। আর ওকেও ডেকো না। আর···শোনো" বলে গলা খাটো করে বলল—"দিব্যি করো, এ কাকে দেখলে, কী দেখলে, এ একেবারে কাউকে কিছু বলবে না—আমার মাথার দিব্যি রইল।" আমার বোন তাই-কে আগে কখনো এরকম ছোটখাটো কথায় দিব্যি গাল্‌তে দেখি নি। আজ তা করতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসাও করলাম, যে এ-সব কী ব্যাপার? কিন্তু 'তাই' আমাকে একটুও বুঝতে দিল না যে কী হয়েছে। আমি চুপচাপ ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঐ স্ত্রীলোকটির বিষয় চিন্তা করছিলাম—কে ও? এমন সময় রাস্তায় যেতে যেতে উপরের তলার ঘর থেকে, সেই স্ত্রীলোকটিকে ইশারা করতে দেখলাম। ভয়ে, ঘৃণায় আমার শরীর কাঁপতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমার ভগ্নীপতি কিসের জালে ফেঁসে গেছে।

সেদিন রবিবার। মা কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। আমি একলা, ঘরে ছিলাম। তখন বিকাল পাঁচটা বাজে। বর্ষাকাল। চারিদিক মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। আমি জানালার পাশে বসে একটা বই পড়ছিলাম। বইয়ের ভিতর একেবারে ডুবে-গিয়েছিলাম। মনে আছে ঐ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা খুবই বিপদে পড়েছিল, এবং সেই প্রসঙ্গ পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এমন সময় এক অত্যন্ত কোমল আর ঠাণ্ডা হাত আমার কাঁধের ওপর কে যেন রাখল। আমি চমকে উঠে দেখলাম এক বর্ষা-স্নাত করুণ বিষাদ-পূর্ণ মূর্তি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে সে বলল—"আমি আমার জীবন থেকে উৎখাত হয়ে গেছি। কোনো দিন যদি আমার চরম কিছু ঘটে যায়, তুমি কেঁদো না। তোমার আদরের বোন জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, এই মনে করে তুমি মিষ্টান্ন বিতরণ কোরো।" ওর কথা শুনে আমার বুকের ওপর যেন সাপ কিলবিলিয়ে উঠল। ওকে কেবল সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম "'তাই', তোমার কী হয়েছে? সব খুলে বলো।" কিন্তু ও খুব কাঁদতে শুরু করল; তারপর হঠাৎ কান্না থামিয়ে বলে উঠল—

"ভাউ, যে কথাটা তোমাকে এখন বললাম সেটা মনে রেখো। আমি চললাম। মা এখন ঘরে নেই, এ একপক্ষে ভালোই হয়েছে।" এই বলে ও চলে গেল। আমি কত অনুনয়-বিনয় করলাম, কত করে বোঝালাম, সব ব্যর্থ হল। 'তাই' আমার কথা একটুও শুনল না।

এখন তো 'তাই' খুব নির্ভীক ভাবে আচরণ করে, চলাফেরা করে। এটা সে কিসের জোরে করতে আরম্ভ করল, জানি না। এখন ও খুব স্বচ্ছন্দে বাড়ীর বাইরে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। কখনও নিজের পরম প্রিয় বান্ধবীর কাছে যায়, আবার কখনও আমার ঘরে এসে হাজির হয়।

কেউ যদি ওকে জিজ্ঞাসা করে, এই সময় কি করে এলে ? ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জবাব দেয়, "আমার যা ইচ্ছা তাই করব, যখন খুশি আমি আসব যাব। এখন আমি কারও চাকর হয়ে থাকবার লোক নই। এতদিন যে সহ্য করেছি, তা আমার ভুলই হয়েছে।" কেউ বলত, এরকম ব্যবহার করলে স্বামীর সঙ্গে মনান্তর ঘটে যাবে। ও চট করে উত্তর দিত,—'মনান্তর তো প্রথম থেকেই ছিল।' কেউ বলেছিল, 'তুমি যদি স্বামীকে না মানো, তা হলে তিনি তোমাকে ধরে মারপিট করবেন।' সে ক্রোধান্বিত হয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে উত্তর দেয়, "আমি তারই অপেক্ষায় আছি।" ওর এই জবাবের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আবার ওকে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে স্পষ্টতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল, "সময় হলে সব-কিছু বুঝতে পারবে।"

একটি বিশেষ দিনের বৃত্তান্ত

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবরাম পন্থ আমাকে তাঁর ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন তাঁর ওখানে তাঁর এক পুরোনো বন্ধুরও খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। স্কুলের ছুটির পর আমি গিয়ে হাজির হলাম। শিবরাম পন্থ ও তাঁর বন্ধুটি কথাবার্তায় মগ্ন ছিলেন। ওঁদের কথাবার্তা শোনার কোনও আগ্রহ না থাকায় ওখানে পড়ে থাকা একটা বই উঠিয়ে পড়তে লাগলাম। বইটার নাম—'লুথারের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত'। এই বইটার কথাই পন্থ-জী আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি বইটার প্রতি ততটা মনোযোগ দিই নি। ভেবেছিলাম হয়তো ওর ভাষা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হবে। আমি বইটা উঠিয়ে জানালার ধারে বসে পড়া শুরু করলাম। সেদিনের কথা আমি ভুলব না কখনও। বস্তুত ঐ সময় বসে থাকবার ইচ্ছা আমার ছিল না। সুন্দরীও সে সময় তার মাকে সাহায্য করবার জন্য রান্নাঘরে গিয়েছিল। এখন ও অনেক বড় হয়ে গেছে। আজকাল আমরা, সম্ভাষণ, প্রথম প্রথম যেমন করতাম সেরকম করি না।

আমি ঐ বইয়ের ভেতর ডুবে গিয়েছিলাম। লুথারের বন্ধুর পোপের কাছে যাবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ও নিজের মত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে খুব দৃঢ় ছিল। এই রকম উৎকণ্ঠার উদ্রেককারী প্রসঙ্গে আমি এসে পড়েছিলাম। এমন সময় শিবরাম পন্থের বন্ধুটি জোরে জোরে কিছু বলছিলেন, তার অস্পষ্ট আওয়াজ আমার কানে এলো—

"এখন, তুমি নিজের মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছ কবে ?"

"আরে, এত তাড়া কিসের ?"

শিবরাম পন্থের বন্ধুটি বললেন, "দেখো, ওরকম উড়ো উড়ো কথা বোলো না। সত্যি সত্যিই তোমার মেয়ে বেশ বড় হয়ে উঠেছে।" "আমার খেয়ালে মেয়ের বয়স অন্ততঃ চোদ্দ বৎসর হবে, তবু তুমি বলছ—এত তাড়া কিসের !"

শিবরাম পন্থ মুচ্‌কে হাসলেন। সেই ভদ্রলোক খুব অধীর হয়ে

বললেন, "হাসছ যে বড়? স্পষ্ট করে বলো। কাল আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে তোমার মেয়ের কথা উঠতেই তারা নাক সিঁটকালো আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল।" শুনে খুব গম্ভীর ভাবে শিবরাম পন্থ বললেন, "দেখো বাপু, আমি তোমার প্রায় তিরিশ বছরের বন্ধু, তোমার কাছে কোনো কথা লুকোই নি। আমি ঠিক করেছি যে অন্ততঃ আরও পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেব না।" শিবরাম পন্থজীর এই কথা শুনে ঐ ভদ্রলোক অবাক হয়ে দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়ে ধরলেন। তিনি এতই হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন যে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তিনি শুধু চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকলেন। শিবরাম পন্থের কাছে এই উত্তর বোধহয় কল্পনাও করেন নি। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর হুঁশ ফিরে এল। তিনি বললেন, "শিবরাম পন্থ, তোমার মাথায় এ কী পাগলামি চেপে বসেছে? এই ধরনের কথা বলার তোমার না আছে যোগ্যতা, না আছে আর্থিক বল। এত বড় মেয়েকে ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে না। তারাই ঘরে রাখতে পারে যাদের হাতে প্রচুর টাকা আছে, কিংবা সমাজে মান্যগণ্য। তোমার, এ দুটোর কোনোটাই নেই। ধর, যদি হঠাৎ কোনো সমূহ বিপদের মধ্যে পড়ো তখন তোমার কী অবস্থা হবে?"

শিবরাম পন্থ পুনরায় দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে বললেন, "দেখো বাপু, আমি যা-কিছু ঠিক করেছি তা ভেবেচিন্তেই ঠিক করেছি। আমার এই সিদ্ধান্তে সামাজিক ও আর্থিক সাহায্যের কোনও প্রয়োজন হবে না। আমি, আমার মেয়ের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ভাগ্যগুণে আমার মেয়েটি খুবই সমঝদার, বুদ্ধিমতী। ওর আরও পড়াশুনা করবার ইচ্ছা আছে। আমি তাকে বুঝিয়েছি. যে, সাংসারিক দৃষ্টিতে তার বিয়ের বয়স হয়েছে। তারপর তাকে যা-কিছু জিজ্ঞাসা করেছি সে তার জবাব তার মায়ের কাছে দিয়েছে। সেই-জন্যই বলছিলাম, আমি তার পূর্ণ সম্মতি নিয়েই এই সিদ্ধান্ত করেছি।" শিবরামের বন্ধু, বাপু, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, "এ-সব কথা ঠিক আছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্কা হয়ে যাবার পর অজ্ঞতাবশত যদি তার

পদস্খলন ঘটে তখন তার জন্য দায়ী হবে কে ?"

বাপুর কথা শুনে শিবরাম পন্থের হাসি পেল। তিনি বললেন, "ধরো, ওর বিয়ে দিয়ে দিলাম। তার পরের দিনই যদি ও বিধবা হয়ে যায় তা হলে ওর ভবিষ্যতের সব নক্‌শা— নষ্ট হয়ে যাবে। তখন এর জন্য দায়ী কে হবে ? তুমি একেবারে পাগলের মতো এ-সব প্রশ্ন করছ। আমি আমার মেয়েকে সৎপথে যাবার শিক্ষাই দিয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার কাছে থাকবে ততক্ষণ তার মনের উপর ভালো সংস্কারের প্রভাব থেকেই যাবে। আমার বিশ্বাস আছে, তার এই ভালো সংস্কারের পরিবর্তন কোনও অস্বাভাবিক পথে চালিত হবে না। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, সে আমার মুখ উজ্জ্বল করবে, নিজের নাম ও পারিবারিক ঐতিহ্যকে কখনও মলিন মাটিতে মিশিয়ে দেবে না। যে মেয়ে বাল-বৈধব্যে নিজের সদ্‌গুণ রক্ষা করতে পারবে, সে কুমারী থাকলেও তা করতে সক্ষম।"

শিবরাম পন্থ চুপ করে গেলেন। বন্ধুও বাক্যহীন হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণের জন্য কেউ কারোর সঙ্গে কথা বললেন না। এমন সময় অন্দর মহল থেকে আওয়াজ এল "খাবার দেওয়া হয়েছে।" এই শুনে আমরা সকলেই ভিতরে চলে গেলাম। খাওয়াদাওয়া শেষ করতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম। কিন্তু ঐ দিন আমি যা কিছু শুনলাম তাতে আমার মন উৎসাহ ও আনন্দে ভরে গেল। ঐ দিন থেকে আমার মনে এক নূতন আশা পল্লবিত হয়ে উঠল।

সুন্দরীর জীবনে এক নূতন পরিবর্তন

শিবরাম পন্থ-জীর ঐ অসাধারণ কথা শুনে এবং ওঁর উদারতার এক তেজস্বী রূপ দেখার পর থেকে আমার মন খুব প্রসন্নতায় ভরে থাকত। সুন্দরীকে কেবল অনেক বছর পর্যন্ত কুমারী রাখাই নয়, ওর জন্য কিছু নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার প্রস্তাবও হয়েছিল। এই

জন্য তিনি নিজের ঘরেই ঐ শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন। এর পর তিনি সুন্দরীকে উচ্চ শিক্ষা দেবার জন্য কোনও ভালো স্কুলে পাঠানো মনস্থ করছিলেন। হঠাৎ যোগাযোগ বশত ঐ দিন আমি তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। শিবরাম পন্থ সুন্দরীকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন সে সময়। সেজন্য আমি সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলাম, শিবরাম পন্থজী আমাকে ডেকে বললেন, "ভাউ, আমি ওকে যে-সব কথা বলতে যাচ্ছি, সেগুলো তুমিও শুনতে পারো। আমার এতে কোনও আপত্তি নেই।" সুন্দরী শিবরাম পন্থজীর কাছে নিজের মঙ্গলের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। আমিও একাগ্রচিত্তে শুনছিলাম।

কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, "সুন্দরী, আর-একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। দেখো, যে স্কুলে তোমাকে পাঠাচ্ছি সেটা বিধর্মীদের স্কুল। ঐ স্কুলে আমার পাঠানোর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অন্য কোনও ভালো স্কুল না থাকায়, এই স্কুলে পাঠিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উচ্চ শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐ স্কুলের যা-কিছু ভালো গুণ আছে, সৎ শিক্ষা আছে সব শিখতে হবে। ওরা হিন্দুধর্মের যতই নিন্দা করুক-না কেন, বা খৃস্টধর্মের যতই স্তুতিগান করুক-না কেন, তুমি এতে দুঃখিত হোয়ো না। আমাদের হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মের মতো নয়, নিজেদের জাতি অন্য কোনও জাতির মতোও নয়, এটা সর্বদা মনে রাখবে। কেউ নিজের ধর্মের যতই স্তুতিগান করুক-না কেন, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না। তোমার যা-কিছু করবার নিজের জাতি ও ধর্মের আদর্শ মনের সামনে রেখে করবে। বিদ্যা ও ধর্মের সঙ্গে অর্থের কোনও সম্বন্ধ নেই, জানি না, এই কথাটা কি করে তোমাকে বোঝাব। ওরা শিক্ষা দেবার সময় মাঝে মাঝে বাইবেলের কথা শোনায় এবং খৃস্টধর্মের গুণগান করে। এই-সব জেনে-শুনেও তোমাকে তাদের স্কুলে পাঠানো স্থির করেছি এইজন্য যে, তোমার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। এ-ও জানি, তুমি ওদের মিষ্টি কথায় ভুলবে না।"

ওদের প্রতিবেশী হবার দরুন, বিনায়ক সুন্দরীর স্কুলের বিষয়ে সব কথা জানতে পেরেছিল। বিনায়ক ও তার অপদার্থ এক বন্ধু

দরজার দুই দিকে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে হাসতে দেখছিল কী করে সুন্দরী ওদের মাঝখান দিয়ে স্কুলে যায়। ওদের কান বাজে কথা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। স্কুলে যাবার সময় হলে পর, সুন্দরীর সঙ্গে একজন চাকর তার বই-পত্তর নিয়ে এল। কিন্তু ঐ দুই মূর্তিমান দরজার দুই পাশে এমনিই দাঁড়িয়েছিল। চাকরটি তাদের রাস্তা ছেড়ে সবে দাঁড়াতে বললে, জবাব দিল—"আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, তো কি হয়েছে? মাঝখান দিয়ে যেতে পার না?" বিনায়কের বন্ধুটি বললে, "আমাদের মতো বই নিয়েই যদি স্কুলে যেতে হয় তা হলে লজ্জা কিসের?" বেচারী সুন্দরী, সসংকোচে, কিছু না বলে বাইরে এসে গেল।

শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হয়ে গেল

স্কুল থেকে বাড়ীতে পৌঁছে দেখি দু-জনে কাঁদছে। গংগুতাই কখন এল, কী ব্যাপার হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তার সমস্ত চুল এলোমেলো, অত্যন্ত সন্তপ্ত দেখাচ্ছিল তাকে। মাকে কখনও কাঁদতে দেখি নি— সেই মায়ের চোখ দিয়েও জল ঝরছে। তাঁর এখন বয়স হয়েছে, তাই বোধ হয় হৃদয়ও কোমল হয়ে পড়েছে। আমি দু-জনের কাছে এলাম, কিন্তু কেউ-ই আমাকে লক্ষ্য করল না। শেষ পর্যন্ত আমি কিছু বলব বলে ভেবেছিলাম, এমন সময় 'তাই', মাকে বলতে লাগল, "মা, তুমি যদি আমাকে জুতা পেটাও করো তবু আমি এখান থেকে নড়ব না। যদি জোর করে টেনে হিঁচড়ে আমাকে বার করে দাও তা হলে আমি এ প্রাণের মায়া আর রাখব না, একটা কিছু করেই বসব।" ওর এই কথায় ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণ বাদে দু-জনেই শান্ত হয়ে গেল। মা 'তাই'-কে আর কিছু বললেন না। রাত দশটা বাজে। আমি অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম। মনও খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। এমন সময় কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাকল, শুনতে পেলাম। আমি

ভয় পেয়ে গেলাম— এত রাত্রে আমাকে কে আবার ডাকে ? চতুর্দিক নিস্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার চৌকাঠের কাছে দেখতে পেলাম, আমার বৃদ্ধ ভগ্নীপতিকে, তার সঙ্গে আর এক কে বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। দু-চার জন চাকরকেও সঙ্গে করে এনেছেন দেখলাম। ওদের আসার কারণ আমি জেনে নিলাম। দরজা খুলে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় সঙ্গের বৃদ্ধ লোকটি বললে, "বৌদিকে নিয়ে যাবার জন্য দাদা-সাহেব এসেছেন। আর কাউকে পাঠালে হয়তো তিনি আসতেন না, সেইজন্য তিনি স্বয়ং নিতে এসেছেন। কোথায় উনি ?" ঐ বুড়োটার কথা শুনে আমার এত রাগ হল যে আমি দু-কথা শুনিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, এমন সময় আমার ভগ্নীপতি বললেন—"আমাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখবার দরকার নেই— ও কোথায় আছে বলে দাও! ও কার অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছে ? বুড়োমানুষদের দুটো তিনটে করে বিয়ে হয়েই থাকে। ও কি ভেবেছে, যেমন ভাবে ও নাচাবে, তেমনি আমি নাচব ? আমি সেরকম নাচিয়ে নই। এটা আমি ওকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব বলে এসেছি। বলো ও কোথায় আছে। এখনি যদি না যায় আমার সঙ্গে, তো দেখিয়ে দেব ওকে .." এই রকম বলতে বলতে বৃদ্ধের রাগ এত চড়ে গেল যে শেষের কথাগুলি মুখেই রয়ে গেল। আমি খুব শান্তভাবে বললাম, "ভিতরে সব শুয়ে পড়েছে —আমি তাকে সকাল হলে জানিয়ে দেব, আপনি এসেছিলেন। এখন ওর খুব মাথা ধরেছে। তবে যদি···"

'যদি টদি কিছু না", দাদাসাহেব ফের ক্রোধাবেশে বললেন— "আমি ওর সঙ্গে এখনই দেখা করতে চাই। আমি এটাও দেখব যে, কত গহনাপত্র ও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।" রাত তখন দশটা কি এগারোটা বেজে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, এ সময় ঝগড়া করাটা ঠিক হবে না। এই ভেবে 'তাই' আর মাকে ডেকে জানালাম, যে দাদাসাহেব এসেছেন। দুপুরে মানসিক কষ্টের জন্য ও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। আমার ডাক শুনে দুজনেই হড়বড় করে উঠে পড়ল।

আমার মনে হল দাদাসাহেব এবার মুখ খুলবেন—। কিন্তু ওঁর

কিছু বলবার আগেই তাঁর সঙ্গী বৃদ্ধ বন্ধুটি বলে উঠলেন—"আপনি কাকে বলে এখানে এসেছেন? দাদাসাহেব আটটা-নটা নাগাদ বাড়ী ফিরে এসে বুঝতে পারলেন, আপনি বাড়ীর থেকে কোথাও চলে গেছেন। আগেও একবার এইরকম আপনাকে রাত্রে ডেকে পাঠাতে হয়েছিল। ফের কাউকে জিজ্ঞাসা না করে আজকেও এখানে এসে পড়েছেন। এটা আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনি আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ ঘরে ফিরে চলুন। দুনিয়াকে আর আমাদের তামাশা দেখিয়ে কাজ নেই।"

ওই বাক্যবাগীশ বৃদ্ধের তাই-এর বাড়ীতে খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ভয় পাচ্ছিলাম যে তাই এবার কি জবাব দেবে। তাই-এর চেহারা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। যখন আমার মা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেদোক্তি করতেন তখন তাঁর চেহারাও এইরকম উদাস দেখাত। আজ তাইএর চেহারার মধ্যে তার মায়ের ভাব প্রকাশ পেল। আমি চুপ করে ছিলাম। বৃদ্ধটি বক্ বক্ করেই চলেছিল। মা হাত দুটো পিছনে করে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনও জবাব দিচ্ছে না কেউ। এই দেখে দাদাসাহেব বেশ দেমাকের সঙ্গে বলতে লাগলেন, "কী, কিচ্ছু শুনতে পাও নি নাকি? আবার যদি অনুমতি না নিয়ে এখানে আসো তা হলে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কাকে জিজ্ঞাসা করে এখানে এসেছ? আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? আমার এই বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? বা বাড়ীর আর-কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তোমার এই আচরণ কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এখন বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে চলো—যা গয়না-গাটি নিয়ে এসেছ, সব ঠিক আছে কি না, দেখো। ও-সব নিয়ে আমার সঙ্গে চলো।" তাই, নড়লও না, চড়লও না। লণ্ঠনের আলোয় তার ঝরে পড়া চোখের জল ঝক্‌মকিয়ে উঠল। সেই বৃদ্ধ লোকটি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করল, "চলো, তাড়াতাড়ি চলো। উনি এখনও খাবার পর্যন্ত খান নি। তুমি যদি তাঁর রাগ চড়িয়ে দাও তা হলে তাঁর পিত্তও চড়ে যাবে। যাই ঘটুক-না কেন, তার আর আলোচনা করতে চাই না।" তবু আমাদের দিক থেকে

কেউ নড়ল না। শেষে আমার ভগ্নীপতি বললেন, "এ-সব হচ্ছে কি! আমি কার সঙ্গে কথা বলছি? আমি কি মানুষ না জানোয়ার? তুমি ফিরে যাবে কি না বলো? না হলে এখনি হাত ধরে টেনে নিয়ে যাব। বিয়ে করবার আগে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমরা এই মতলবেই বিয়ে দিচ্ছ যে, বিয়ে হয়ে যাবার পর মেয়ে মনের মতন আদর যত্ন পাবে, টাকাকড়ি গহনাপত্রগুলোও হাত করার সুযোগ মিলবে। কিন্তু মনে রেখো, আমি সে ধরনের লোক নই। এক কানা-কড়িও আমি কাউকে দেব না। সব গহনা-পত্র আমাকে ফেরত দাও। আসতে হয় এসো, তা না হলে···।"

"না, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।" তাই এই রকম কয়েকবার বলে কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। নিজের স্ত্রীর ভিতর এতটা সাহস দেখে সে হক্‌চকিয়ে গিয়ে চার-পা পেছিয়ে এল। 'তাই'-এর মুখ এবার খুলে গিয়েছিল, সে আর চুপ করে থাকে নি! অবিলম্বে 'তাই' বলা শুরু করল—"আপনি কিরূপ ব্যবহার করেন, আমার সঙ্গে কতখানি ছল চাতুরী করেন, এ-সব কথা আমি মাকে বলি নি, বলবার ইচ্ছাও ছিল না। মনে করেছিলাম আমার কাহিনী শুনলে আমার মা'র মনে খুব আঘাত লাগবে কিন্তু এখন আমি বেপরোয়া— যা হবার তাই হোক। যান, আপনার যা করবার করুন গে যান। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বদমাইস লোকটা আর ঐ নির্লজ্জা স্ত্রীলোকটি আপনার ঘরে থাকবে ততক্ষণ আমি আপনাদের ঘরে যাব না। দেখে নেব, আমায় কে কী করে। ঐ দুজন আমাকে তাদের পদসেবা করতে বলে। আমি তাই করতে যাচ্ছি আর কি? আমি কি তাদের জুতার সামিল?"

এই সাংঘাতিক কথাগুলো বলতে বলতে 'তাই-এর ক্রোধ চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল—চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। মা, যিনি কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে কম যান না, তিনিও এ সময় কি করে এত চুপ করে বসেছিলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। বোধহয় তিনি এই ভেবে থাকবেন যে এ সবই তাঁর নিজের জেদেরই পরিণাম। এখন বলে কিছু লাভ নেই। তাঁর মেয়ে তাঁর চেয়েও অনেক রাগী আর

জেদী, এই ভেবে বোধহয় চুপ করে বসেছিলেন। সেই বুড়োটা দাদা-সাহেবকে বলতে লাগল, "এ রকম যে হবে তা আমি প্রথম থেকেই জানতাম। আপনাকে আমি তখনই বলেছিলাম যে ভালো বংশ দেখে মেয়ে নেবেন, কিন্তু…" এই কথা শুনে আমি রাগে তিড়্‌বিড়িয়ে উঠলাম— কিছু বলতেও যাচ্ছিলাম কিন্তু, যেমন আগুনে তেল পড়লে আগুন আরও জ্বলে ওঠে, তেমনিই হল। দাদাসাহেবের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—"আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন—স্বামীকে ছেড়ে থাকার অভ্যাস মায়ের থেকেই চলে আসছে। এখন, এই মেয়েও যে ঐরকম স্বভাবের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

আমার ঘরে, আমার সামনে আমার বাপ-মায়ের সম্বন্ধে এইরকম অপমানজনক কথাবার্তা এই-সব নীচ ছোটলোকেরা বলতে থাকবে আর আমি শুনে যাব, এ বেশিক্ষণ সহ্য করা গেল না। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, "চুপ করুন! আপনার মতো স্বামী যখন জুটেছে তখন তাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আমার বোন, 'তাই' অত্যন্ত সুশীলা সেজন্য এতদিন চুপ করে ছিল। ঘরে বাজারের বেশ্যার আমদানি হয়, আর সে তাই-কে বলে কিনা পা টিপে দিতে? আমি গর্বিত যে, এই-সব সহ্য না করে সে এখানে চলে এসেছে। চলে যান আপনি এখান থেকে— ও যাবে না— দেখি আপনারা কি করতে পারেন!" এই বলে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে দুইজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই সময় আমার এত তেজ, এত সাহস কোথা থেকে এল বলতে পারি না। মা-ও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ আজ পর্যন্ত তিনি আমার মধ্যে এই সকল গুণের বিকাশ দেখেন নি। আমার এই উগ্র রূপ দেখে দাদাজী আর তার বৃদ্ধ বন্ধুটি ভয় পেয়ে গেলেন। তবু নির্লজ্জের মতো দাদাজী আর-একবার জিজ্ঞাসা করলেন —"কী? তাহলে ও আসবে না, না কি?"

"না, আসবে না।" খুব রোয়াব্‌ দেখিয়ে বলি। এই কড়া জবাবে খুব ফল ফলল। তবু, যেতে যেতে তিনি শোনালেন—"তোমাদের বংশই খারাপ। তোমার মা খারাপ। ও লেখাপড়া শিখেছে এইজন্য স্বামী থাকতে স্বামীর ঘর ছেড়ে দিল। থাকো তবে, বিধবার মতো!"

সকলে চলে গেলে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দরজার বাহিরে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় কে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?" দেখলাম যে আমাকে এই প্রশ্ন করল, সে আমাদেরই পাশের এক প্রতিবেশী। আমার মনে হল, আমাদের ঘরে যে-সব কথা হয়েছে সে-সব আর গুপ্ত না থেকে আশেপাশের সকলেই জেনে ফেলেছে। এতে আমি একটু দুঃখ পেলাম। প্রশ্নকারীকে বললাম, "না, কিছু হয় নি।" সেই লোকটি তখন দাঁত বের করে বলতে লাগল, "সারা গ্রাম সব কথা জেনে ফেলেছে, তবু আমার সঙ্গে এ রকম লুকোচুরি করাব কি দরকার?" এই রকম ভর্ৎসনাপূর্ণ বাক্য আমার কানে পৌঁছে দিয়েই সেই লোকটি এক ঝট্‌কায় নিজের দরজা বন্ধ করে দিল। তার পাশের বাড়ীর লোকটিও হাসতে হাসতে নিজের দরজা বন্ধ করে দিল।

'তাই' আর মায়ের মনে কী ধরনের চিন্তা চলছিল, বলা মুশকিল। 'তাই' কাঁদছিল, আর যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোলো না। আমি দু-জনের মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছিলাম। মা চোখ নিচু করে ছিলেন। স্তিমিত প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্বলে আলো দেখানোর চেষ্টা করছিল। প্রদীপের তেল কখন ফুরিয়ে গেছে, সে দিকে কারও খেয়াল নেই। তেল ফুরিয়ে প্রদীপ নিভে যাচ্ছিল। আমার লক্ষ্য ওদিকে যাওয়াতে, জিজ্ঞাসা করলাম "মা, তেল কোথায় রেখেছ?" বলতে বলতে আমি সল্‌তেটা বাড়িয়ে দেবার জন্য এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ওদিকে তখন প্রদীপ নিভে গিয়ে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারিদিক। মাকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, যে দেশলাই কোথায় রেখেছে। এমন সময় দড়াম্ করে কোনো ভারী জিনিস পড়বার আওয়াজ হল। 'তাই' একদম ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ভাউ, ভাউ! দেখো তো. মা তো পড়ে গেলেন না কোথাও?" আমারও ঐ রকমই সন্দেহ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ

এদিক-ওদিক দেশলাই খুঁজলাম, পেলাম না। খুঁজতে খুঁজতে একটা ঠাণ্ডা কিছু আমার হাতে ঠেকল—দেখি যে ওটা মায়ের পা। মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি এল এবং আমার বুক কাঁপতে লাগল। আমি এটাও ভুলে গেলাম যে আমি কী খুঁজছি এবং কোথায় খুঁজছি। আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হতাশ হয়ে আমি সব জায়গাতেই খুঁজতে লাগলাম। অনেকক্ষণ বাদে তা পাওয়া গেল। বুক ধড়ফড় করছিল বলে দেশলাই জ্বালাতে দেরি হল। দিয়াশলাই জ্বালানোর পর দেখলাম, মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, শরীর মৃতবৎ। অন্ধকারে তাইকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই-সব ভাবতে ভাবতে জ্বলন্ত কাঠিটা কখন নিভে গেল, টের পেলাম না, আমার তো একদম কান্না পেয়ে গেল। আমি আবার দেশলাই জ্বালালাম। ক্রমে আমার একটু ধৈর্য ফিরে এল। আমি প্রদীপে তেল ঢেলে জ্বালিয়ে নিয়ে 'তাই'-এর খোঁজ করতে লাগলাম। এমন সময়, 'তাই' প্রতিবেশিনী দু'জন স্ত্রী-লোককে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। আমি তৎক্ষণাৎ মার কাছে গেলাম এবং মার শরীর ছুঁয়ে দেখলাম তিনি একদম অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা পাথর হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য মনে হল, মা কি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন? 'তাই' এর ধৈর্য একেবারেই চলে গিয়েছিল। আমিও খুব জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম। প্রতি-বেশিনী স্ত্রীলোক দু জন আমাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। আমি বার বার সাড়া পাওয়ার জন্য মাকে ডাকছিলাম আর তাঁর নাকের ডগায় হাত রেখে দেখতে লাগলাম যে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কি না। মা'র যে হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি কিছু হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। এমন সময় মনে হল, মা যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

মনে হল তিনি হাত-পা নড়াবার চেষ্টা করছেন। 'তাই' আর ওই দুজন স্ত্রীলোক মাকে শুশ্রূষা না করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আমার হঠাৎ কোনও ডাক্তারকে ডেকে আনার কথা মনে হল, আর অমনি দৌড়তে দৌড়তে শিবরাম পন্থের কাছে গিয়ে তাঁর এক চেনা-শোনা ডাক্তারকে নিয়ে সোজা বাড়ীতে পৌঁছলাম। এর

মধ্যেই, মা'র কি হয়েছে; এই চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছিল। অন্দরে গিয়ে দেখি মার একটু একটু জ্ঞান ফিরেছে এবং চেষ্টা চলছে পুরো-পুরি জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার। 'তাই' মা'র মাথার কাছে বসে মাকে জিজ্ঞাসা করছে, "মা! ও মা! তোমার এখন কিরকম মনে হচ্ছে? তুমি এত ছট্‌ফট্‌ করছ কেন?" এই-সব দেখে আমার মনে আনন্দ হল, যে মার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আবার অন্য দিক দিক দিয়ে দুঃখও পেলাম। ডাক্তার মাকে দেখলেন এবং প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করে সমস্ত বিষয় জেনে নিলেন। কিন্তু, কি করে জ্ঞান ফিরে এল, এটা জিজ্ঞাসা করার পর একজন বললেন—চোখে অঞ্জন দেবার ফলে কিছুটা জ্ঞান হল, তখন ওঁর মুখে আদার রস ঢালা হয়েছিল। কিন্তু জ্বর ভীষণ বাড়তে লাগল. তখন আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন। ডাকলে কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার হুঁ, হাঁ, করে সব শুনে নিলেন। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর, কারও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপচাপ কাগজ বের করে প্রয়োগ-পত্র লিখতে লাগলেন। আমিও তাঁকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলাম। প্রয়োগপত্র লিখিয়ে আমি আর শিবরাম পন্থজী ডাক্তার-বাবুর গাড়ীতেই বসে রওনা হলাম। আমি শিবরাম পন্থজীকে দিয়ে মার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। ডাক্তারবাবু বললেন—"অত্যন্ত সন্তাপ ও মনোকষ্টের পরিণামে তোমার মা'র এই অবস্থা হয়েছে। অঞ্জন দেওয়া হয়েছিল বলে একটু জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এখনও কোনো ভরসা নেই। ভিতর থেকে ওঁর সারা শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আর, এখন যে জ্বর উঠেছে তার লক্ষণও সুবিধার নয়। এখন আমি যে ওষুধ দিচ্ছি সেটা প্রয়োগ করে দেখা যাক্ কোনো পরিবর্তন হয় কিনা। ওঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা সম্ভব নয়। কেবল একটা কথা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ জানবেন, ওঁর শুশ্রূষা খুব সাবধানে, খুব যত্নের সঙ্গে হওয়া দরকার।" ডাক্তারবাবু যে-সব নির্দেশ দিলেন সে-সব মনে রেখে ঘরে ফিরে এলাম। দেখলাম মা'র জ্বর বেড়েই চলেছে। যে দু-চার জন স্ত্রীলোক খবর নিতে এসেছিলেন তাঁরা চলে

গেছেন। যিনি চোখে অঞ্জন দিয়েছিলেন আর আদার রস খাইয়েছিলেন তিনি মা'র কাছে বসে ছিলেন। আমি আসতে তিনিও চলে গেলেন। আমরা দু-জনে সারারাত মা'র মাথার কাছে বসে থাকলাম। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী আধঘণ্টা অন্তর ওষুধ দিতে থাকলাম। মধ্যে মধ্যে মাকে ডেকে সাড়া পাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তখন পর্যন্তও জ্ঞান হবার কোনো চিহ্ন দেখলাম না।

এই দেখে মন আমার আরও দমে গেল। পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ জ্বর ছেড়ে গেল। তখন একটু আশ্বস্ত হলাম। দু-এক ঘণ্টা বাদে মা চোখ খুললেন; তখন আমি তাঁর কাছে একলাই ছিলাম। 'ভাই' কোনো কাজে ভিতরে গিয়েছিল, তাকে আসবার জন্যে ডাক দিলাম। মা ভাই-এর দিকেও তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। দুপুরে মা ফের বেহুঁশ হয়ে গেলেন। চোখে অঞ্জন ঢেলে আর আদার রস খাইয়ে মার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করা হল। মার জ্বর আবার চড়তে লাগল। আমি মামাকে টেলিগ্রাম করে দিলাম। আমরা দুই ভাই-বোন, অনভিজ্ঞ অপরিণতবয়স্ক বলে মামা আর দিদিমা এখানে আসা পর্যন্ত সুন্দরীর মা আমাদের কাছে থাকবেন, এই ব্যবস্থা হল। সুন্দরীও মাঝে মাঝে খবর নিতে আসত। তিন দিন ধরে মা'র অবস্থা একই রকম ছিল। দিনের মধ্যে দু'বার ফিট হয়ে যেতেন।

এই তিন-চার দিনের মধ্যে আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত বিচিত্র হয়ে উঠল। আমার মায়ের স্বভাব যেমনই হোক-না কেন, আজকাল আমাদের তাঁর ওপর ভক্তি-ভালোবাসার উদ্ভব হয়েছিল। আজ মা যদি চলে যান তা'হলে কি হবে আমাদের! মা হয়ত আমাদের গালি-গালাজ করতেন, নিজের কথার ওপর অনড় জিদ ছিল, একগুয়েমী ছিল—সব কথা ঠিক। তবু যা তিনি করতেন তা আমাদের হিতের জন্যই করতেন, এ আমি জানতাম। এও জানতাম, শৈশবে আমাকে নিয়ে খুবই দুঃখ পেয়েছেন, তবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমি যেমন যেমন বড় হতে লাগলাম তেমনই মায়ের গুণ উপলব্ধি

করতে লাগলাম। সেইজন্য তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। মনে মনে সংকল্পও করতাম, ভবিষ্যতে মাকে সবরকম সুখ দেবার চেষ্টা করব। এই পরিস্থিতিতে মা যদি আমাদের ছেড়ে চলে যান, তা হলে আমাদের কী হবে?—এই চিন্তায় আমার মন কেঁপে উঠল।

তিনদিন পর্যন্ত ডাক্তারের যাতায়াত ঔষধপত্র সব চলছিল। কখনো কখনো ডাক্তার আমাদের ভয় পাইয়ে দিতেন আবার কখনো কখনো আশ্বাসও দিতেন। চতুর্থ দিন সকাল থেকেই মায়ের জ্বরের যে তড়্কা এল তা আর ছাড়ল না। মা'র শরীর একেবারে কাঠির মতো হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের কাছে দু-চার বার দৌড়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে করে তাঁকে নিয়েও এসেছিলাম। ডাক্তার বললেন, যদি ওঁর ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়, সেবা-শুশ্রূষা করা হয়, তা হলে তিনি হয়তো বেঁচে উঠবেন। কিন্তু তখন আশা ভরসা করা বৃথা। সুন্দরী ও সুন্দরীর মা-ও ঘরে ছিল। ওরা খুবই বিষণ্ণ ও উদাস হয়ে গিয়েছিল এবং বার বার চোখের জল ফেলছিল। সুন্দরীর মা আমাকে বললেন—"যতটা সম্ভব, মা'র কাছে গিয়ে বসো।" আমি নিরাশ হয়ে মার মাথার কাছে গিয়ে বসলাম।

ডাক্তার বলেছিলেন যে সন্ধ্যাবেলায় মার জ্ঞান ফিরে আসবে। সেইজন্য অধীরভাবে সন্ধ্যা হবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। মিনিট-সেকেণ্ডগুলি আমার কাছে এক এক যুগ বলে মনে হচ্ছিল। বিকাল পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা ছ'টা, সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। ডাক্তারবাবু মা'র অবস্থার সংকটকালের যে সময় বলে দিয়েছিলেন, সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এইজন্য মনে কিছু আশার সঞ্চার হল। ইতিমধ্যে মার শারীরিক কষ্ট সব যেন চলে গেল। মা, ধড়মড় করে জেগে উঠে পাশ ফিরে শুলেন এবং বেশ বড় বড় চোখ করে আমাদের দেখতে লাগলেন। তাঁর এরকম নিস্তেজ চাহনি আগে আমি কখনও দেখি নি। এর মধ্যে কোথা থেকে উনি শক্তি সঞ্চয় করলেন বলতে পারি না, উনি বেশ স্পষ্ট আওয়াজ করে "ভাউ" বলে ডাকলেন—ডাকতে ডাকতে তিনি ওঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুর্বলতার জন্য

বিছানার ওপর পড়ে গেলেন। আমি চট করে তাঁকে ধরে ফেললাম। ওঁর সমস্ত শক্তি আবার অন্তর্হিত হয়ে গেল। মনে হল যেন কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। এইজন্য আমার কান মা'র মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম—"ভাউ! ভাউ!-- ওকে নিজের কাছে রেখো—ও একেবারে একলা—অকল্যাণ!— যা হয় কিছু কোরো—" এর কয়েক মিনিট বাদে মার প্রাণপ্রদীপ চিরদিনের মতো নিভে গেল।

অতঃপর

অরণ্য-পথে চলবার সময় হঠাৎ ঝড়ের ফুঁয়ে বাতি নিভে গেলে চারিদিক যেমন অন্ধকারে ছেয়ে যায়, আমারও অবস্থা সেই রকম হল। ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবন-পথ কাঁটায় ভরা ছিল, নির্জন অরণ্য-পথের পথিক আমি ছিলাম।' এইরূপ ভয়াবহ অরণ্যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের আলোকে পথ চলার ক্ষমতা আমার মায়ের ছিল। সত্যই তিনি আলোর আধার স্বরূপ, মশালের মতো ছিলেন। কখনও কখনও ঐ আলো দেখে ভয় পেয়ে যেতাম। কিন্তু সন্দেহ নেই, আমি যা কিছু জীবনে সত্য-মূল্য পেয়েছি, তা সবই মায়ের প্রচেষ্টায়। আজ সে মশাল হঠাৎ নিভে গেল এমন এক পরিস্থিতিতে যে তার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়লাম! আমার মনে হত, আমার মা ছিলেন, সেইজন্য আমার সব কিছুই ছিল। মা-ই আমার আধার, আমার অমোঘ আশ্রয় ছিলেন। যেমন আমি বড় হতে লাগলাম আমার মনে এই চিন্তা এল,—

মা যেমন নির্ভীক ছিলেন, কারও পরোয়া করতেন না, সেই রকম কারও পরোয়া না করে 'তাই'-কেও সুখী রাখবার অবশ্য চেষ্টা করতেন। মৃত্যুর সময় অস্পষ্টভাবে যা বলে গিয়েছিলেন তার দ্বারা তখন তাঁর মনে কী ভাবনার উদয় হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমার মনে হয়, মায়ের স্বভাব অত্যধিক জেদী হওয়ায় ।ভা।৮ক

প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁর মনে অনুশোচনা ইত্যাদি এসে থাকবে এবং তার বিষম আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হল। শেষ সময়ে মায়ের মুখ দিয়ে যখন কথার আভাস পেলাম তখম আমি মা'র মাথায় হাত রেখে মনে মনে শপথ করেছিলাম—"মা, আমি 'তাই'-কে কখনও দূরে রাখব না, আমার কাছেই রাখব, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব এবং সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে চলব। এর জন্য মা গো তুমি সাক্ষী রইলে— তোমার নামেই আমি শপথ করছি।"— এই শপথ গ্রহণের সময় মার মৃতদেহ সামনে শায়িত ছিল। এখনও ঐ দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই। জানি না, যখন আমি ঐ শপথ গ্রহণ করি তখন, হতে পারে সেটা আভাস মাত্র— আমার মায়ের আত্মা আমার শপথ শুনতে পেয়েছিলেন হয়তো। কারণ, দেখতে পেলাম, তাঁর চেহারা বদলে গেল, তাঁর মুখে এক প্রশান্তির আভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এরপর হঠাৎ এল একটা পরিবর্তন, তাঁর মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, সে কেবল এক মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু ঐ এক মুহূর্তেই আমার সমস্ত জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত যে-সব মানসিক দুর্বলতা ছিল সব এককালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি দৃঢ়চিত্ত হয়ে উঠলাম। আমার মনের অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে গিয়ে উজ্জ্বল আলোকে সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মনে কর, যেন এতদিন যে দৃঢ়তার স্থির-জ্যোতি মা'র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ছিল তা এখন আমার হৃদয়ে এসে আসন পাতল।

যে-সব কথা হয়ে গিয়েছে, তা আর ফিরে আসবে না— এর বেদনা আমার অল্প বয়সের অভিজ্ঞতার দ্বারাও অনুভব করতে পারছিলাম। নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখের বিষ পান করে রোদনরতা 'তাই'কে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। দর্শকদের কাছে আমার এই কর্তব্য-কঠোর রূপটি খুব আশ্চর্য লেগেছিল। এই ছেলে কি করে পেল এই কঠোরতা? এক স্ত্রীলোক তো বলেই ফেললেন, "এ ছেলেও কেমন অদ্ভুত দেখো? চোখের সামনে মা মরল, না হল কোনো দুঃখ, না বেরোলো এক ফোঁটা চোখের জল!"

মামা এসে গিয়েছিলেন। তিনি 'তাই'কে নির্দেশ দিলেন—

যা হয়ে গেছে সে-সব ভুলে গিয়ে স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। মামার এ নির্দেশ, আমি বা 'তাই', কেউই মানতে পারলাম না। আমি ভাবছিলাম, মা যদি আজ থাকতেন তা হলে এ প্রসঙ্গ উঠতেই পারত না। আমার শপথের কথা স্মরণ হল। ভাবলাম মনোবল দেখানোর এই তো উপযুক্ত সময়! হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কী বললেন? সেই পাপাশয় বৃদ্ধের কাছে 'তাই' ক্ষমা চাইবে? তার গৃহে রক্ষিতা বেশ্যার পদসেবা করবার জন্য ঐ পাজীটার কাছে ফিরে যাবে? যার পরিণামে মা'র দেহান্ত হল! ঐ লোকটি আমাদের বংশগৌরব ও মা'র সতীত্বের ওপর সন্দেহ প্রকাশও করেছিল— এইরকম নির্লজ্জ বেহায়ার কাছে তাইকে কখনোই পাঠাব না।" আগে আমি বিশেষ বলতেটলতে পারতাম না। আমার মধ্যে এত আবেগ, এত তেজ কোথা থেকে এল ভেবে আশ্চর্য হলাম। সে সময় শিবরাম পন্থ-জীও উপস্থিত ছিলেন। আমার মধ্যে এই শক্তির আভাস দেখে মামা ও শিবরাম পন্থ দুজনেই খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। মামা তো আমাকে বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলেন। আমি আবেগের ঝোঁকে ক্রমান্বয়ে বলে যেতে লাগলাম। আর মাঝে মাঝে তাই আর শিবরাম পন্থের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার ভাষণ শুনে তাই মা শান্তি পাচ্ছিল। পন্থ-জীর মুখেও সন্তোষের আভা ফুটে উঠল। আমার এই আচরণ ঐ তিনজনের কাছে হয়তো খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

চিন্তা-বিচার তো অনেক হল

সেই দিন পর্যন্ত আমি আমার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করি নি। কিন্তু মামার ঐ ধরনের সব কথা শুনে, আমার আশ্রয়হীন সম্বলহীন দুর্বল পরিস্থিতির কথা ভেবে, খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। অজস্র কথা মনের ভিতর ভিড় করে আসছিল। নিজের দারিদ্র্য, নিরাশ্রয় অসহায় অবস্থার কথা ভেবে, দুঃখে ও নিরাশায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু এখন দুঃখ করেই বা কি লাভ আছে ?

এই-সব ভাবনা চিন্তা একলাই এক কোণে বসে করছিলাম। এমন সময় আমার নাম ধরে অত্যন্ত কোমল, করুণ স্বরে কে যেন ডেকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখি—'তাই'! ওর ওই দীনদশা দেখে আমার আরও দুঃখ হল। ছেলেবেলায় গংগু-তাই অত্যন্ত সুন্দর দেখতে ছিল কিন্তু এখন দিন দিন তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছিল। ওর এই চেহারা দেখে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। এক মুহূর্তের জন্য একটা অশুভ চিন্তা মনের মধ্যে খেলে গেল। মায়ের মতো, তাই-ও কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ? দিনের পর দিন ধীরে ধীরে এইরকম শুকিয়ে ঝরে পড়ে যাবে তাই ? ···আমার মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য পুনরায় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কল্পনায় মা'র জায়গায় তাই-এর চেহারা দেখতে লাগলাম। মন দুর্বল হয়ে গেল। 'তাই' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণ ধরা গলায় আমাকে ডেকে বলতে লাগল, "ভাউ! ও ভাউ! তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমি তোমার ঘাড়ে চিরদিন বোঝা হয়ে থাকব না। মামা-জী যা বললেন তা-ই আমি করব। পূর্বজন্মের কিছু পাপ হয়তো ছিল। তার ফল ভোগার জন্য আমি আমার স্বামীর কাছে চলে যাব। আমার ভোগকালের তিন-চার মাস বাকি আছে, তা আমি পুরো করে নেব। তুমি আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না।" এই কথা শুনে আমার মন একেবারে ভেঙে পড়ল এবং আমি কাঁদতে কাঁদতে ওকে বললাম—" 'তাই'! এ-সব তুমি কী বলছ ? তুমি আবার সেই···"

নিজের চোখের জল মুছে 'তাই' বলতে লাগল—"ভাউ, মামা যা তোমাকে বলেছেন সে-সব আমি শুনেছি। ঠিকই বলেছেন তিনি। এইরকম পরিস্থিতিতে আমাদের দিন চলবে কি করে? আমরা তো পুরোপুরিভাবে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল। সেইজন্য তিনি যা বলেন তা মেনে নিতেই হবে। ভাউ, এখনও তোমার পড়াশোনা শেষ হয় নি। এখন যদি আমরা মামার সঙ্গে একমত না হই তা হলে তিনি সাহায্য হয়তো বন্ধ করে দেবেন।"

"তা দেবেন তো দিন-না; আজ থেকেই আমার নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হবে— এই তো? সে আমি দেখে নেব, কিন্তু আমার শপথ আমি ভঙ্গ করব না। কেবল তাই নয়, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, এতে যদি সকলে হাসে, বা গালাগালি দেয়— দিক। খুব বেশি হয় তো কি হবে?— আমার বি. এ. এম. এ. পাস করা হবে না এবং শতাবধি টাকা রোজগার করাও হবে না।··· এই তো? তা, আমার যা কিছু পাঁচ-দশ টাকা জুটবে তাইতেই নিজের পেট চালিয়ে নেব। দু-চার মাস চেষ্টা করলে কোথাও-না-কোথাও একটা চাকরি জুটে যাবে। 'তাই', আমি যা শপথ নিয়েছি, তা ভুলে যদি তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই, তা হলে মা'র কাছে—"

বার বার শপথের কথা শুনে 'তাই', আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওর কাছে ঐ শব্দটার অর্থ খুব স্পষ্ট হয় নি! ওর মনে গোল বেধে গেল ঐ শব্দটার দরুন, কারণ, আমার ঐ শপথ নেবার ব্যাপারটা ওর একেবারেই জানা ছিল না।

আমি তাকে বললাম, "দেখো 'তাই', মা যখন ছিলেন তখন মাকে তিনি টাকা পাঠাতেন। সেই রকম যদি এখনও পাঠাতে থাকেন, তা হলে ঠিক আছে। অথবা তোমাকে নিয়ে দু-চার দিন তাঁর নিজের কাছে রাখলেন, তা হলেও ঠিক আছে। কিন্তু মামা যদি তোমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর জন্য জিদ করেন তা হলে আমাকে আমার নিজের রাস্তা দেখতে হবে। এই অবস্থায় তুমি যদি শ্বশুরবাড়ী যাও, তা হলে তোমার পক্ষে খুবই অপমানজনক

হবে। তোমার স্বামীর এইরকম মনে হবে যে আর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। এখন আমি একে যেমন খুশি তেমনি ব্যবহার করতে পারি।— এইজন্য তুমি স্বেচ্ছায় ওর কাছে যেয়ো না। আমাদের বর্তমান অবস্থাতে আমরা ভালো ভাবেই থাকব। তোমার দুশ্চিন্তা কিসের? কিছুদিন হয়তো আমাদের দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে— এই তো? তাতে কি হয়েছে?"

'তাই', চুপ করে এ-সব শুনছিল। পরে বলল, "ভাউ, আমি মনে ভাবছি একটা কথা যে, যদি মামা আমাকে না নিয়ে যান…"

এমন সময় মামা আমাদের ডাকলেন।

'তাই' আর আমার মধ্যে বিচ্ছেদ

আমরা দুজনে মামার কাছে গেলাম। তখন খুব নরম হয়ে মামা বললেন, "ভাউ, তুমি কী ঠিক করলে? দেখো বাপু, স্বামীকে ছেড়ে থাকা ঠিক নয়। থাক গে, যেতে দাও— আজ ও সম্বন্ধে কোনো কিছু বলতে চাই না। কিছুদিনের জন্য তাইকে আমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকো, আমি আমার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাকে সাহায্য করব। তুমি নিজের পড়াশুনা ভালো-ভাবেই করবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার মা, যতই জেদী আর খারাপ মেজাজের হোন না, সে আমার একমাত্র বোন ছিল। তার প্রতি আমার ভক্তি ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। আজ সে নেই কিন্তু তার জায়গায় তোমরা দু-জনে আছ। তোমরা কি ভেবেছিলে, এই অবস্থায় তোমাদের দু-জনকে আমি পরিত্যাগ করব? আমি তাইকে এইজন্য বলছিলাম, কি সে, তার নিজের গৃহে স্বামী-সহবাসে সুখী হোক। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে যদি এইরকম হাল হয় তা হলে তাকে সেখানে পাঠাবার আগ্রহ আমার নেই। আমি তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমার মায়ের মতোই তাকে আদর-যত্ন করে রাখব।

আবেগে মামার গলা ধরে এসেছিল। তাঁর দু-চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আমার মা'কে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে তাঁর অন্তঃকরণ এত কোমল ছিল। আমার মনও এই পরিস্থিতিতে, নরম হয়ে গিয়েছিল। আমি অতি বিনম্র ভাবে মামাকে বললাম—"মামা, আমি যদি আপনার সঙ্গে কোনও রূঢ় আচরণ করে থাকি, তার জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না।" —বলে মাথাটা নিচু করলাম।

মামার এই কথা শুনে 'তাই' তো কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ আমরা তিনজনেই চুপ করে ছিলাম। মামা ধীরে ধীরে বললেন—"ভাউ, তোমার কথায় আমি দুঃখ পাই নি। ভগ্নীর প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখে সন্তুষ্টই হয়েছি। কেমন? একে তা হলে সঙ্গে করে নিয়ে যাই? এখানে শুধু তোমরা দু-জনে থাকলে সামাজিক দৃষ্টিতে খুব ভালো দেখাত না। এ-ও হতে পারত তোমার অনুপস্থিতিতে তাই-এর স্বামী এসে তাকে কষ্ট দিত। তুমি আর তোমার মা যখন ছিলে, তখনকার কথা আলাদা ছিল। কিন্তু এখন সে আশ্রয় তো ভেঙে গেছে। এখন তোমাকে স্বাবলম্বী হয়ে চলতে হবে। আমি তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখতে চাই। তোমাকে যতটা ভালোবাসি আমার নিজের ছেলেকেও ততটা ভালোবাসি না। যতক্ষণ আমার শক্তি আছে ততক্ষণ তুমি একেবারেই পয়সার চিন্তা কোরো না। তোমার পড়াশুনায় যা খরচ হবে সব আমি দেব। তোমার যতদূর পড়বার ইচ্ছা আছে পড়ে যাও। তোমার মায়ের স্বভাব কিছু বিচিত্র ছিল, কিন্তু তার এক মহৎ গুণের জন্য সে আমার প্রিয় ছিল—সে অত্যন্ত সরল ও কপটতাশূন্য ছিল।" মামা আর কিছু বলতে পারলেন না, তাঁর কণ্ঠ আবেগ-রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আমাকে শুধু বললেন—"এখন তুমি যাও, আমি একটু একলা থাকতে চাই।" আমি বাইরে চলে এলাম। মামার এই-সব কথাগুলি খুবই আশ্চর্যজনক! আমার মাকে মামা যে এতটা ভালোবাসতেন, এটা কল্পনাও করি নি! যখন মায়ের কথা মনে হতে লাগল, তখন আমরা দু-জনে পরস্পর দুজনের দিকে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

পরের কিছু ঘটনা

সকাল বেলায় উঠেই কোন্ ভোজনালয়ে খাওয়া উচিত, এই চিন্তায় পড়লাম। আজ পর্যন্ত অনেক দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। এজন্য ভোজনের ব্যবস্থা নিয়ে কোনও কষ্ট পেতে হয় নি। হোটেল সম্বন্ধে অনেক নিন্দাবাদ আমার জানা ছিল। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কল্পনাও করতে পারি নি। এই-সব চিন্তায় মন বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল, এমন সময় আমাকে কে যেন ডাকল। গলার আওয়াজ তো চেনা-চেনাই মনে হল— কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না। আনন্দিত মনে উৎসুক হয়ে দরজা খুললাম, দেখি যে, সুন্দরী দাঁড়িয়ে !

ভাবলাম, এই সময় সুন্দরী কেন এল ? সে হেসে বলল— "ভাউরাও,' কাল বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু রাত নয়টা সাড়ে নয়টা বেজে গেল আপনি এলেন না। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো মামার সঙ্গে আপনি চলে গেছেন। বাবা খুব কাজে ব্যস্ত সেজন্য নিজে আসতে পারলেন না। আপনাকে অবিলম্বে তাঁর কাছে যেতে বলে দিয়েছেন।" এই বলে সুন্দরী অত্যন্ত বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখ দুটো নিচে নামানো ছিল। তার 'আপনি' সম্বোধন শুনে আমি সংকুচিত হয়ে পড়লাম। কিছু-আগে পর্যন্ত সে আমাকে—'তুমি'—বলে সম্বোধন করত। কিন্তু আজ তার মুখে 'আপনি' সম্বোধন শুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। ঐ 'আপনি' সম্বোধনটা আমার কানে কর্কশ ঠেকল। আমি তাকে বললাম— "সুন্দরী, আজ এ কোন্ নতুন ঢঙে কথাবার্তা শুরু করলে ? শৈশবের সম্পর্ক কি একেবারে ছিন্ন করে দিয়েছ ? তোমার 'আপনি', সম্বোধনে আমি খুব আঘাত পেয়েছি। মনে হচ্ছে, আমি একেবারে পর হয়ে গেছি। সুন্দরী, তুমি আর তোমার মা-বাবা ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার আর কে আছে ? যাক···আমি তোমার বাবার কাছেই আজ যাব বলে মনস্থ করেছিলাম। আমাকে আবার, কোনও হোটেলে খাবারের বন্দোবস্ত করার ছিল···" আমার কথা শেষ

হবার আগেই, সুন্দরী বলল—"না, না, না, ও সব হোটেল ফোটেলে যেতে হবে না। বাবা খাওয়ার জন্যই তোমাকে ওখানে ডেকেছেন। সেইজন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি চট্ করে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম "কি, আজ বিশেষ কিছু আছে না কি ?"

সুন্দরী হাসতে হাসতে বলল—"না, বিশেষ আর কি, রোজ যা হয় তা-ই হবে।"

আমি আর অধিক বাক্যব্যয় না করে ওর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। রাস্তায় যেতে যেতে 'তাই'-এর সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কথা-বার্তা বলছিলাম। সুন্দরী জানাল, তাই ওকে সর্বদা চিঠিপত্র লেখে। এইজন্য সে তাইকে অনেক কাগজপত্র খাম ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছি। কিছু অসভ্য লোক আমাদের দুজনকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে আঙুল দেখিয়ে খুব অভদ্রভাবে হাসতে লাগল। সুন্দরীর অবশ্য এ প্রত্যহের অভিজ্ঞতা। ও চোখ নিচু করে নিঃশব্দে পথ চলছিল। লোকেদের এই অশিষ্ট ব্যবহারে সে নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাচ্ছিল। আমার ওপর ওর যথেষ্ট নির্ভরশীলতা ছিল। শিবরাম পন্থ আমার অপেক্ষায় বসে ছিলেন। ওখানে গিয়ে পৌঁছতেই আমাকে বললেন, "ভাউ, তুমি বাইরে হোটেলে যাবে খেতে, এটা আমাদের তিনজনেরই মনঃপূত নয়।

"—তুমি রোজ আমাদের এখানে চলে এসো। কাছেই কোথাও একটা ঘর খুঁজে নাও। তোমার যাতায়াতেও সুবিধা হবে, সময়ও বাঁচবে। তোমার পড়াতেও আমি সাহায্য করব।"

শিবরাম পন্থের এই কথা শুনে আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তিনি বললেন—"তুমি সংকোচ করছ কেন ? তোমার কি মনে হচ্ছে, তুমি আমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে ? এসব চিন্তা মনেও এনো না। আমাদের এখানে কারোই ইচ্ছা নেই যে তুমি কোনো হোটেলে গিয়ে খাও। চলো, চলো, হাত-পা ধুয়ে নিয়ে খেতে বসে যাও।" শিবরাম পন্থ খুবই সহজ সরল ব্যক্তি ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার আগেও

অনেকবার হয়েছে। আজ ওঁর নৈষ্ঠিক চরিত্রের আর-একদিক দেখতে পেলাম। যে পরিবারের প্রতি বরাবরই আকৃষ্ট ছিলাম, সেই পরিবারেরই একজন হয়ে তাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলাম।

তিন মাস বাদে আমার পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল। আমি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে লেগে গেলাম।

চিঠি অদল বদল

ম্যাট্রিক পাস করার পর, অর্থাৎ স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে আমি কলেজে ভর্তি হলাম।

'তাই'-এর চিঠি পাচ্ছিলাম, আমার চিঠিও তার কাছে যাচ্ছিল। কখনও কখনও তাই-র চিঠি পেয়ে মনে হত, ওর বোধহয় কিছু কষ্ট হচ্ছে। সে আমার কাছ থেকে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছে। এরকম আভাস পাওয়া গেল। একদিন আমার কলেজের ঠিকানায় ওর চিঠি পেলাম। চিঠি পড়ে আমি মনে যা ভেবেছিলাম তা আরও স্পষ্ট হল। আমি ওকে তাড়াতাড়ি খোলাখুলি ভাবে লিখে দিলাম, যে তার মনে যদি কোনও কষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে অবিলম্বে যেন সে আমার কাছে চলে আসে। লিখেছিলাম—"তুমি নিজের দুঃখ ঢাকবার চেষ্টা কোরো না। দুঃখের বিষয় সত্যই যদি কিছু ঘটে থাকে তুমি-অবিলম্বে সবিস্তার সব কথা জানিয়ে চিঠি দেবে।" তাই-এর পত্র পড়ে ঐ দিন খুব বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। এমনিতে ওর চিঠিতে উদাস হয়ে যাবার মতো কোনো কথা ছিল না। তবু, যেন মনে হল, 'তাই', চিঠিটা লিখতে লিখতে কাঁদছিল, কারণ পত্রের দু-একটা অক্ষর অশ্রুবিন্দু পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে দেখলাম। আমার চিঠিটা লেখার পর তিনদিন চলে গেল, কোনও উত্তর এল না, না এল কোনো চিঠি সুন্দরীর কাছে। এইজন্য দু-জনেরই মন খুব আনচান করতে লাগল। একদিন সুন্দরীকে আমার চিঠির মর্ম জানিয়ে দিলাম। সে সময় তাকে যেন বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণের জন্য উঁকি-

ঝুঁকি মেরে ওকে দেখতে লাগলাম। আমার দিকে ওর খেয়ালই নেই। এমন সময় সে হঠাৎ একটা গান গুন্‌গুনিয়ে উঠে উপরের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখেই—"আরে! এ কি ভাউ? ভাউরাও—আপনি কখন এলেন?" এই বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। আমি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। এমনিতেই, অন্দরে যাবার আগে সাড়া দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি ও-সব কিছু না করেই অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছিলাম। আমি সুন্দরীকে জানালাম—"তাই ওখানে, মামার কাছে, সুখে আছে কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আপনার কাছে তো ও চিঠি লেখে—তাতে যদি ও তার সব কথা মন খোলসা করে জানিয়ে থাকে তা হলে আপনি ঠিক করে বলুন, তাই কি ওখানে কষ্ট পাচ্ছে?" কখন সখন আমি জেনে বুঝেই সুন্দরীকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করি। সুন্দরী আমার কথা শুনে চুপ করে রইল। পরে অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বলল—"ভাউ-রাও, এর উত্তর আমি পাঁচ দিন বাদে দেব, আজকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না।" সুন্দরীর কথার শেষের দিকটা আমি লক্ষ্য করে শুনি নি, কারণ দরজার চৌকাঠের কাছে কে যেন উঁকি মেরে দেখছিল, সেই দিকেই আমার নজর চলে গিয়েছিল। আমার খুব রাগ হল। আমি দরজা খোলবার জন্য যেই এগুলাম, আর অমনি সেই লোকটি অন্তর্ধান হল। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সুন্দরীর মা সেখানে এসে পড়লেন। আমাকে, আমার নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে এখানে এসে পড়তে দেখে, তিনিও আশ্চর্য হয়ে বললেন—"কি ব্যাপার? এ সময়ে তুমি?" "এই এমনিই!" —বলে আমি কথাটাকে এড়িয়ে গেলাম। কিছু দেরিতে সুন্দরীর বাবাও এসে গেলেন। যদি আরও পনেরো মিনিট সময় হাতে পাওয়া যেত, তা হলে হয়তো 'তাই-এর' সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিতে পারতাম। পরের রবিবার, সুন্দরীর সঙ্গে একলা সাক্ষাৎ করার সুযোগই জুটলো না। এর তিন দিন পরে, আমার নামে তাই-এর চিঠি এল। চিঠি খুলে দেখি, চিঠিটা সুন্দরীকে সম্বোধন করে লেখা। মনে হচ্ছে ঐ একই দিনে, সে আমাকে আর সুন্দরীকে চিঠি লিখেছে, কারণ সুন্দরীকে

লেখা চিঠিটা আমার খামে এসেছে, আর আমার চিঠিটা সুন্দরীর কাছে গিয়ে পৌঁচেছে। খুব লম্বা-চওড়া চিঠি দেখে পড়বার কৌতূহল বেড়ে গেল।

'তাই'-এর চিঠি

চিঠিটা পড়বার জন্য খুব অধীর হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার সততাই আমার বিবেককে উদ্বুদ্ধ করল। মন বলতে লাগল, যে এই চিঠি ভুল করে আমার খামে এসে পড়েছে, না পড়াই উচিত। সেই চিঠিখানা নিয়ে আমি সুন্দরীর কাছে গিয়ে বললাম, "এটা তোমার চিঠি, ভুলবশতঃ আমার খামে এসে গেছে। তোমাকে আমি এক শর্তে এই চিঠি দিতে পারি—এই চিঠিতে যা লেখা আছে তা অক্ষরে অক্ষরে সব পড়ে শুনিয়ে দিতে হবে।" আমার চিঠিটা সুন্দরী আমার হাতে দিয়ে দিল—সে চিঠিতে লেখা ছিল--"তুমি যা ভাবছ. সেরকম কিছু হয় নি আমার। আমি এখানেই বেশ সুখেই আছি। আমার সম্বন্ধে অযথা দুশ্চিন্তা করে কষ্ট পেয়ো না। তুমি নিজের পড়াশুনা একাগ্র মনে করে যাও। যদি একটু আধটু কষ্ট এসেই যায়, তা নিয়ে তোমার এত চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।" —সংক্ষেপে লেখা চিঠিটা—কিন্তু সুন্দরীর চিঠিটা খুব বিস্তারিত ছিল। সে চিঠির কোথাও কোথাও চোখের জল পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে দেখলাম।

সুন্দরী তার চিঠি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল। বার বার লুকিয়ে সুন্দরীর দিকে আড়চোখে দেখা ঠিক নয়—এই কথা মনে হতেই, আমি আমার চিঠি নিজের চোখের সামনে খুলে ধরে, পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার সমস্ত মন তাই-এর লেখা চিঠির কথাগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল আর তার সঙ্গে সুন্দরীর মুখপদ্মের সুষমা মগ্ন হয়ে দেখছিল। সুন্দরীর চোখ বেয়ে জল পড়ছে দেখে আমি আন্দাজ করলাম যে চিঠিতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষ দুঃখপ্রদ ঘটনার উল্লেখ আছে। আমি সুন্দরীকে বললাম, "যদি এই চিঠি

আমাকে পড়তে না দাও তা হলে আমি সোজা মামার কাছে গিয়ে তাই'কে নিয়ে আসব, তারপর যা হবার হয় হোক।" আমার এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনে সুন্দরী আশ্চর্য হল এবং কিছু সমাধানেরও আশ্বাস পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলল, "তাই তার নিজের অবস্থা এবং তার কারণ সম্বন্ধে কোনও কথা লুকোয় নি। সে আমাকে এ-সব কথা জানাতে চায় নি, যাতে মন খারাপ না করি এবং আমার পড়াশুনার কোনও ক্ষতি না হয়। ···নিন এই চিঠি—নিশ্চয়ই পড়ে দেখুন। এই দুরবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করতেই হবে।"

শুরুতে ও সুন্দরীর সম্বন্ধে লিখেছে, আর শেষের দিকে আমার সম্বন্ধে। লিখেছে—"হাঁ নিশ্চয়ই, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুই ভাই-বোন বেঁচে থাকব আমরা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হব, এ কথা ঠিক। তবু ওকে আমার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাই না, কারণ ওর এখন লেখাপড়া করার বয়স। আমার মতো অভাগীর জন্য ওকে চিন্তা করতে দেব না। সমস্ত কথা যদি ওকে খুলে লিখি তাহলে ওর মন অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমি চাইছি যে, ভাউ, খুব বড় হোক, মহান হোক, উচ্চ বেতনের পদপ্রাপ্ত হোক। যদি আমার এই দুরবস্থার কথা তাকে জানাই তা হলে সে নিজের পড়াশুনা ছেড়ে পাঁচ-দশ টাকার চাকরি নিয়ে বসবে। এইভাবে তার ভবিষ্যৎ আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলতে চাই না। আমার জীবনে যে অকল্যাণ এসেছে, যে সর্বনাশ এসেছে, সেটা ওর জীবনেও আসুক, এটা আমি সহ্য করতে পারব না! যদি তোমরা দু'জনে মিলে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির কোনও সমাধান বের করতে পার তা হলে আমি সানন্দে তা মেনে নেব।"

"মামা আমাকে কখনও কিছু বলেন না। কিন্তু মামী আর দিদিমা দুজনে মিলে আমাকে খুব বাক্য-যন্ত্রণা দেন। শ্বশুরালয়ের যম-যন্ত্রণার থেকে কোনো রকমে পরিত্রাণ পেয়ে এসেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এখানেও সেই একই দুর্ভোগ! চাই কি, এতে আমাকে আত্মহত্যা না করতে হয়! বড় মামীমা বলেন—তুমি কলঙ্কিনী।

তোমার মা স্বামী ত্যাগ করেছিল, তুমিও তাই করলে। নিজের ঘরের কাহিনী অন্যকে বলে কি লাভ? এইজন্য তো আমি চুপ করে থাকি। স্বামী, স্ত্রীকে যা বলেন, তা পালন করতে হয়। তার জন্য কেউ নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসে না। এই ধিঙ্গীটা তাই করে, এখানে এসেছে। একেবারে ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে কি না। যদি ওর মা বলত—চলে যা এখান থেকে—তা হলে কখনও শ্বশুরবাড়ী ফিরে যেত না, এটা ওর মা জানত এবং সেজন্য ভয়ও পেয়েছিল। ভয় এই ছিল যে, ও কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা না করে বসে। আত্মহত্যা এতই সোজা কিনা! প্রথম প্রথম এ-সব কথা সহ্য করতে পারি নি, কাঁদতে কাঁদতে ওখান থেকে সরে যেতাম মনে মনে স্থির করেছিলাম, যদি আরও কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়, তা হলে একদিন না একদিন, আত্মঘাতিনী হব।"

বেশিক্ষণ ধরে চিঠির পরের অংশ আর পড়তে পারলাম না। আমার ভয় হতে লাগল, এতক্ষণে তাই কিছু করে বসে নি তো? আমি চিঠির পরের অংশটা পড়তে লাগলাম।—

"নিজের জীবন নিজের হাতে নেওয়া—সত্যই সাহসের দরকার! এবং সে সাহস আমার নেই। আর যদি সে সাহস থাকত, তা হলে আজকে আমার আর দেখা পেতে না। আমার মা যেমন নিজের চারিত্রের ওপর কোনও ব্যাঘাত আসতে দেন নি এবং মিথ্যা লোক-নিন্দার পরোয়া করেন নি, ঠিক আমিও সেই পথেই চলব। আজকাল আমি অনেক কিছু পড়েছি, তাই এত লম্বা-চওড়া চিঠি লেখা আরম্ভ করেছি। আমি নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো আমার বৈবাহিক জীবন নয়। সেইজন্য কিছু ভিন্ন পন্থায় আমার জীবন অতিবাহিত করতে চাই।"

গংগু-তাইএর পত্রের শেষ অংশটুকু পড়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম যে সুন্দরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একেবারে হাত ছুঁড়ে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলাম, "ব্যস্! ঠিক এই রকমই হবে। দুনিয়াকে আমরা দেখিয়ে দেব।" সুন্দরী অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি সংকোচের সঙ্গে বললাম, "এখন আর ভাববার সময় নেই। ওকে এখানেই নিয়ে আসব এবং স্কুলে ভর্তি করে দেব।"

নম্রভাবে সুন্দরী বলল—"আপনি যা বলছেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা নেবার আগে ভেবে দেখা দরকার। যদি 'তাই'-কে আমরা এখানে নিয়ে আসি তা হলে মামাকে কী জবাব দেব ? আজ পর্যন্ত মামা ওকে কখনও কষ্ট দেন নি। এই অবস্থায় যদি ওকে নিয়ে আসি তা হলে মামাকে বোধ হয় অপমান করা হবে। এর ফলে তিনি যদি মাসে মাসে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেন। আজকে আমাদের তাঁর এই সাহায্যের খুব প্রয়োজন আছে।"

আমি তেজের সঙ্গে বললাম, "কাকে সাহায্য ? আমাকে ? হোক-না, তাঁর অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে 'তাই'কে ওখানে কষ্ট পেতে হবে। খুব বেশি হলে কী হবে, মামা টাকা দেওয়া বন্ধ করবেন। করুন, আমার তাতে কোনো আফসোস নেই।"

আমার এই কথার পর সুন্দরী শঙ্কিত হয়ে উঠে বলল, "তাই-এর জন্য আমরা যদি কিছু করে বসি, তাতে তাই কি সুখী হবে ? তাই-এর স্বামী, স্কুলে যাবার সময় তাইকে হেনস্তা করবে না তো ?"

এই আশঙ্কা মনে আসায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে মামার কাছে না গিয়ে অবিলম্বে সুন্দরীর বাবার কাছে গিয়ে তাই-এর সব কথা জানাই। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, সেটাই করব স্থিব কবলাম।

বিদ্রোহের সূত্রপাত

শেষ পর্যন্ত মামার কাছ থেকে গংগু-তাইকে নিয়ে এলাম। নিয়ে আসবার সময় মামা বাড়ী ছিলেন না, তিনি পাশের কোনো গাঁয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর জন্য এক চিঠি লিখে রেখে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেলাম। এবং দিদিমা ও মামীর কথায় কান না দিয়ে, চলে যাবার সময়, তাঁরা দু-কথা শুনিয়ে দিলেন—"যেমন বীজ তার ফলও তেমনি হবে। বাপ্ পেটের ধান্দায় সারা জায়গা ঘুরে মরছে, তুমিও তোমার বাপের মতো ধ্বজা ওড়াবে—"

আমার ইচ্ছা অনুসারে তাইকে আমাদের কাছে নিয়ে এলাম। তার তিন-চার দিন পরে সুন্দরীর সঙ্গে 'তাই' স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করল! সুন্দরীর মুখে তাই-এর করুণ কাহিনী শুনে প্রধান শিক্ষয়িত্রী তার জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। এই প্রকারে প্রারম্ভটা তো খুব ভালোই হল— কোনো সমস্যার উদ্ভব হল না।

হঠাৎ একদিন মামার চিঠি এসে হাজির। আমি সব সময় তাঁকে মাসে একবার করে চিঠি লিখতাম। প্রায় একমাস হল তাইকে এখানে নিয়ে এসেছি। আজ তাঁর পত্র দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে মামা এ রকম পত্র লিখবেন। আমি ঐ চিঠি বার বার পড়লাম। যতই পড়তে লাগলাম ততই মামাব প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হতে লাগল। সব চেয়ে মহানুভবতার কথা এই যে তিনি এই চিঠি, মনে এক প্রশান্তির ভাব নিয়ে লিখেছিলেন। ঐ চিঠি পড়বার সময় মনে হচ্ছিল যেন শিবরাম পন্থজীর চিঠি পড়ছি। ওঁর সম্বন্ধে মনে মনে যা কল্পনা করে নিয়েছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হল। আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম যে, যদি মামার চিঠি আসে, তা হলে তা গালি-গালাজে ভরা থাকবে, নয়তো একেবারে তাঁর চিঠি পাব না। তাঁর পত্র পড়বার পর আমি এই ভেবে নিলাম, যেমন মার প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল, তাই-এর দুরবস্থা দেখে তাঁর মহৎ অন্তঃকরণ ঐ রকমই মমতায় গলে

গিয়েছিল। 'তাই' প্রখর বুদ্ধিমতী ছিল। স্কুলে পড়াশুনা করে, পরে সেটা যদি সে কাজে লাগাতে পারে, তা হলে তাই-এর, ভবিষ্যতে উন্নতির পক্ষে ভালো হয়। তাই-এর স্বামীর তরফ থেকে কোনো-প্রকার অ গ্রহের অভাব দেখে খুবই আশ্চর্য লাগত। আমি ভাবছিলাম যে এই রকম করে তাই-এর শিক্ষা যদি সম্পূর্ণ হয় তা হলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

কিছুদিন বেশ শান্তিতে গেল। কখনও কখনও, এই রকম অনুকূল পরিস্থিতি দেখে বিশ্বাসই হ'ত না। কখনও বা এই চিন্তা করতাম—এই প্রশান্তি কোনো প্রচণ্ড ঝড়ের ভূমিকা তো নয়? শেষ পর্যন্ত সেই রকমই হল।

অবশেষে

সেদিন শনিবার হবার জন্য সুন্দরী ও তাই-এর ছুটি ছিল। শুক্রবার দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি ওদের ঘরে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় এই প্রসঙ্গ উঠল যে, ব্যায়ামের জন্য প্রভাতকালীন তেজস্কর বায়ু সেবন সবচেয়ে ভালো। এতে শরীর দৃঢ় ও ঘাতসহ হয়। মনে ভাবলাম, আমার তো রোজ প্রাতঃকালীন ভ্রমণ করা হয়ে ওঠে না। তবে যেদিন ছুটি থাকে সেইদিন সূর্যোদয়ের আগে বেড়াতে যাওয়া উচিত। শেষে নানা কথাবার্তায় ঠিক হল যে, আমরা সকলে মিলে ভ্রমণে বেরোবো। সেদিন ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠলাম। উষাকাল, সূর্যোদয় হতে দেরি ছিল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। সকলেরই মন খুব প্রফুল্ল। আমরা তিনজন বেশ জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। আর কর্তা গিন্নী দু-জনে পিছনে পড়ে গেলেন।

কাছের এক পাহাড়ের ওপর থেকে প্রথম সূর্যোদয়ের রক্তিমাভ গোলক দেখে তাই-এর খুব আনন্দ হবে, এই মনে করে সেখানে যাওয়া মনস্থ করলাম। এর আগে আমি কয়েকবার সন্ধ্যাবেলায়

ঐ পাহাড়ের ওপর উঠেছি। আমরা তিনজন ঐ পাহাড়ের পাথুরে জমিতে বসে সূর্য ওঠা দেখতে লাগলাম। বিচিত্র রক্তবর্ণের ছটা দেখে মন উল্লসিত হল। মাঝে মাঝে দুই বান্ধবীতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, শুনে আমার খুব মজা লাগছিল। এমন সময় একটা শাদা খরগোশ লাফাতে লাফাতে সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল। সুন্দরী ঐ ধাবমান খরগোশটির গতি-চাঞ্চল্য তন্ময় হয়ে দেখছিল। এমন সময় নীচের থেকে দু-জনে আমাদের তিনজনকে তাড়াতাড়ি নীচে চলে আসতে বললেন। তখন রাস্তায় বেশ লোকজনের চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আমার মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। আমি এমনিতে কয়েকবার এর আগে বেড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতা কিছু নূতন ছিল। মনে মনে যে চিন্তা ও পরিকল্পনার জাল রচনা করেছিলাম তাতেই মগ্ন হয়ে ছিলাম। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে যদি কিছু করতে হয় তা হলে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবং তা হলেই আমার বহু স্বপ্ন সফল হবে— এই আমি ঠিক করলাম। নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় কে যেন আমাকে ডাকল— "কি ভাউরাও। এখন আপনিও এই ঢঙ শুরু করলেন না কি?" বেশ জানাশোনা ভাবে 'ভাউ-রাও' বলে সম্বোধন করে, এ ব্যক্তিটি কে? আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম যে আমার ভগ্নীপতির বাড়ীর সেই নির্লজ্জ বেহায়া বুড়োটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখেই রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সেই লোকটি ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে আমাকে বলল "আপনার হয়তো এই নতুন ঢঙ খুব উপাদেয় মনে হচ্ছে, তবু বলছি এ কাজ আপনার মতো উচ্চ বংশের লোকের পক্ষে শোভা পায় না। আমার কানে সব কথা পৌছে গেছে। ঠিক করেছি যে আর চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকব না। সমস্ত দুনিয়া এই বিষয়ে প্রশ্ন করে— এ সব হচ্ছে কি?" আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে কী করে সেই নির্লজ্জ বেহায়া লোকটার ভাষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম। আরও কিছুক্ষণ ওখানে থাকলে আমার হাত দিয়েই বিচিত্র পদ্ধতিতে এর জবাব দিতাম। আমার হাত লোকটাকে মারবার জন্য নিস্‌পিস্‌

করছিল, তবু ক্রোধকে দমন করে ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু লোকটা যখন ফের বলতে শুরু করল— "আমাদের বাড়ী থেকে ও স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছে, এই-সব আমাদের বলে বেড়াচ্ছে···" শুনে আমার তো তখন ক্রোধের তাপাঙ্ক চূড়ায় পৌঁছে গেছে। আমার হাত অজ্ঞাতসারে আমার জুতার কাছে চলে গেল। জুতা খুলে আমি মারবার উপক্রম করতেই ঐ বদমাইস লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে দু-পা পিছনে হটে গেল। জুতা খোলবার সময় কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মনে হল যে, আমি আমার হাতের অপব্যবহার করতে চলেছি। ঐ লোকটা দু-পা হটে যাওয়াতে রাস্তার মাঝখানে যে তামাশাটা হতে নিয়েছিল, তা আর হতে পারল না। আমি শান্ত হয়ে মুখ বুঁজে চলতে লাগলাম। ঘরে পৌঁছতেই 'তাই' আমাকে জিজ্ঞাসা করলো— "কি? সেই বুড়োটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তো? তা এতক্ষণ পর্যন্ত কী সব কথা হচ্ছিল? তোমার চেহারাও এত ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে কেন?" আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বাবার ঘরে চলে গেলাম এবং নিজের খাতা খুলে কিছু লিখতে বসে গেলাম। বাইরে থেকে 'তাই' আর সুন্দরীর কানাকানির ফিস্‌ফাস্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। এমন সময় 'তাই', সোজা আমার কাছে চলে এসে বলতে লাগল— "ভাউ, ঐ লোকটির সঙ্গে আজ সকালে তোমার দেখা হয়েছিল, সত্যি করে বলো তো, ও তোমাকে কী বলছিল? আমি দূর থেকে সব দেখতে পেয়েছ। তোমাদের বাগ্‌বিতণ্ডার থেকে সব কিছু জানতে পেরেছি। তবু তোমার মুখ থেকেই সব জানতে চাই— কোনো কথা লুকিয়ো না।" তাইএর কথা শুনে আশ্চর্য হলাম; কারণ আমরা দু-জনে যখন কথা বলছিলাম তখন আমরা বেশ দূরে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এত দূর থেকে ও চিনতে পারল কী করে? ভেবে আমার মাথা ঘুরে গেল। 'তাই', ফের আমাকে বলল— "তুমি কোনো কথা লুকিয়ো না। আমার মায়ের আর আমাদের বংশমর্যাদার বিরুদ্ধে অপমানসূচক কথা বলা ছাড়া, সে আর কী বলবার চেষ্টা করছিল? এই-সব ছোটোখাটো কথায় তুমি এত দুঃখ পাও কেন? কেউ যদি

কিছু বলে তা হলে এক কান দিয়ে শুনে আর-এক কান দিয়ে বের করে দিয়ো। আমার আর লোকনিন্দার ভয় নেই। স্কুলে যাবার সময় রোজ আমি লোকেদের মুখে এই-সব কথা শুনি। এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ, এদের জন্যই আমার মন দৃঢ়তর হতে পেরেছে। ওরাই আমার কষ্টিপাথর।" এ-বিষয়ে আমার মনের চিন্তাধারা তুলনা করে, তাইএর এই দৃঢ় মন্তব্য শুনে লজ্জিত হলাম। পুরুষ হয়েও লোকনিন্দার ভয়ে কিছুক্ষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

আর-এক নূতন সমস্যা

ঐ দিনই সকালে আমার নামে এক চিঠি এল। ঐ চিঠি আমার এক বন্ধু নিয়ে এসেছিল। এ চিঠি অপ্রত্যাশিত। এ চিঠি পড়ে আমার মনের অবস্থা অদ্ভুত হয়ে গেল। চিঠিটা লিখেছিলেন আমার বাবা। তিনি লিখেছেন— "আমি কয়েক দিন থেকেই তোমাদের কাছে যাবার কথা ভাবছিলাম। আজকাল আমার সমস্ত গ্রহ প্রসন্ন হয়ে গেছে। শীঘ্রই আমার একটা কাজ সম্পূর্ণ হবে। আর্থিক সমস্যাও মিটে যাবে। আমি তোমাকে আই. সি. এস্.-পরীক্ষা দিতে বসাব, না হলে ব্যারিস্টার হবার জন্য পাঠাব। যদি দুটো পরীক্ষাই তুমি দিতে পার, তা হলে আরও ভাল। এখন আমার পয়সার অভাব নেই। যেদিন আমার কাজ পুরো হয়ে যাবে সেইদিন তোমার নামে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা রেখে দেব— এ বিশ্বাস রেখো। আমার হাতের নয়টা আঙুলে শঙ্খের চিহ্ন আছে সেজন্য পয়সা পেতে এত দেরি হয়ে গেল। কিন্তু একটা আঙুলে চক্র চিহ্ন ছিল বলে পয়সাটা পেয়ে গেলাম। যদি এই চক্র না থাকত তা হলে আমার কী দশা হত কে জানে! কিছুদিন আগে তোমার মামার কাছে পত্র লিখে তোমার খবর করেছিলাম। তাঁর কাছে জানতে পারলাম, তুমি কলেজের একজন বুদ্ধিমান ছাত্র বলে পরিগণিত। এটা জানতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। সেই সময়েই ঠিক করে ফেললাম

তোমাকে বিলাতে পাঠাব, ব্যারিস্টার, অথবা আই. সি. এস্. হবার জন্য।...

আমি ছয়-সাত দিনের মধ্যেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। ঐ সময় হয়তো তুমি কলেজে থাকবে, সেইজন্য আমি জামাইএর ওখানে গিয়ে উঠব। আমাকে দেখে তারও খুব আনন্দ হবে। তুমি 'তাই'কে আমার আসবার কথা কিছু জানিয়ো না..."

এই অদ্ভুত চিঠিটা পড়ে মনে খুব আঘাত পেলাম। মনে ভাবলাম এবার বড়ো কঠিন সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। আমি এই কথা পন্থ-জী আর তাইকে জানালাম। 'তাই' বলল—"এতদিন আমরা অন্যকে দেখে ভয় পেতাম, আর এখন ভয় পেতে পেতে নির্ভয় হয়ে গেছি। এবার অন্যদের ভয় পাবার পালা এসে গেছে। আর সেটাও খুব শীঘ্রই নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। যখন মন একেবারে নির্ভয় হয়ে যায় তখন সমস্ত ব্যাপারই নির্বিঘ্নে হয়ে যায়।"

তাই-এর কথার বিচক্ষণতা ও দৃঢ়-প্রত্যয় আমাকে আশ্চর্য করে দিল। নিজের মনে-মনেই বললাম, 'স্ত্রীলোককে আমরা অবলা বলি, কিন্তু এ একেবারে সত্যি নয়।' তাই-এর প্রতি আমার স্নেহ-ভাবনা গভীরতর হল।

শেষে সে-কথাটাও হয়ে গেল

আমি বাবার পথ চেয়ে বসে রইলাম, কারণ এতক্ষণে আমি মনকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম। কোনো ভয় ছিল না আর। কেবল একটা কথা কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করছিল—বাবা তাই-এর স্বামীর কাছে না গিয়ে যদি সোজা আমাদের কাছে চলে আসতেন তা হলে ভালো হত। কিন্তু বাবা, নিজের জামাইয়ের কাছে বড়োলোকী চাল দেখাবেন, এই মনে করে সোজা তার কাছেই যাবেন, ঠিক করেছিলেন। আমি ঠিক করলাম, যে তারিখে বাবার আসার কথা সেই দিন স্টেশনে তাঁকে নিয়ে আসতে যাব। এই

মনে করে ক্রমান্বয়ে ছয়দিন স্টেশনে গেলাম আর গাড়ীগুলো নজরে রাখলাম, কিন্তু তিনি এসে পৌঁছলেন না। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে স্টেশনে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার! যেদিন স্টেশনে যাওয়া ছেড়ে দিলাম, ঠিক সেই দিনই তিনি জামাইয়ের কাছে এসে পৌঁছলেন। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা'ই হল। সেখানে আমার আর ভাই-এর নামে খুব নিন্দা রটানো হল। পরের দিন তিনি আমাদের কলেজে এলেন। আমার ওপর দোষারোপ করা হল, আমি নাকি সমাজ-সংস্কারবাদী হয়ে গিয়ে নিজের কুল ও বংশমর্যাদার ওপর কলঙ্ক লেপন করেছি। আমি চুপচাপ সব শুনে যেতে লাগলাম। তিনিও বলে যেতে লাগলেন। ওঁর নোংরা কথাবার্তা শুনে আমার মেজাজ চড়ে গেল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলাম—"আপনি এ সব কী বলছেন? ওই ভদ্রলোক আপনার কী ক্ষতি করেছেন জানি না। আমার বোনটি তার স্বামীর ছল চাতুরী অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমাদেব কাছে আসে। আমি নিজেই তাকে তাঁর কাছে রেখে এসেছি। তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, নানা প্রকারে বহু সাহায্য করেছেন। তিনি কী ক্ষতি করেছেন আপনার? আপনি ঐ বদমাইস বুড়ো লোকটার কথা শুনে, বিশ্বাস করে এই-সব কথা বলছেন।"

"কী বললে? ও কী করেছে? কী না করেছে, তাই বলো! যদি সে ও রকম ব্যবহার না করত তা হলে ওর স্বামীর নামে ঐ-সব বদনাম রটত না। তাই-এর জন্যই ওর স্বভাব খারাপ হয়েছে।"

"কী, ওর জন্যই ঐ নরাধম লোকটির স্বভাব খারাপ হয়েছে, এই আপনি বুঝেছেন? ওর ঘরে যে বেশ্যাটা আসত তার পদসেবা করা, তার শাড়ী কাচা, এই-সব কাজ মুখ বুঁজে করত। কখনো বা বিনা কারণে মারও খেতে হত।"

আমি এই-সব কথা এত ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, যে পরে তার সামনে বাবা কিছু বলতে পারলেন না। রাগে আমার ঠোঁট,

সমস্ত শরীর কাঁপছিল। আমি এত নির্লজ্জের মতো অভব্য বাগ-বিস্তার আগে কখনও করি নি, না ভবিষ্যতে কখনও করব। দেখে মনে হচ্ছিল, আমার কথা রাওজীর মনে কিছু হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু সেটা আমার ভুল। রাওজী বললেন—"বা, রে বা! খুব তোতা পাখির মতো বুলি কপ্‌চানো শিখেছ দেখছি। কোন্ পাজী লোকের কাছে এর পাঠ গ্রহণ করেছ? আমি ঠিকই বলছি, মেয়েকে তার স্বামীর ঘরে যেতেই হবে, এর মধ্যে কোনও কথা নেই। যদি এমনিতে সে যেতে রাজী না হয়, তা হলে তাকে জোর করেই পাঠাতে হবে।"

বাবার সঙ্গে আর বেশি কথা বলতে পারলাম না। কেবল এই-টুকুই বললাম—"আমি নিজের মুখে কিছু বলতে চাই না— আপনি তাইকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন ··"

"শালা, কার সঙ্গে মুখে মুখে কথা বলছিস? মাথার ঠিক আছে তো? না মদ খেয়ে এসেছিস? কলেজে গিয়ে এই-সব ঢঙ শিখেছিস। তোর কলেজে যাবার দরকারটা কি? সব নষ্টের গুরু ঐ কলেজ!" শেষ পর্যন্ত তিনি গালিগালাজ শুরু করে দিলেন। তিনি নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, তিনি শিবরাম পন্থের বাড়ীতে গিয়ে তাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে দেখবেন। তাতেও যদি তাই রাজী না হয় তা হলে থাপ্পড় মেরে ওকে ওখান থেকে বের করে দিয়ে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বাবা যে এই ধরনের কথা বলবেন তা আমি প্রথমেই আঁচ করে নিয়েছিলাম। এইজন্য আমি ভাবলাম, তাইকে এই-সব কথা জানিয়ে দিয়ে আগের থেকেই সাবধান করে দিয়ে আসি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাবা ইংরাজী শিক্ষাকে গালি দিলেন এবং শেষে এও বললেন—"আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চুকে গেল। আমি তোমাকে এক কানাকড়িও দেব না।"

আমার অনুমান অনুযায়ী রাওজী তাই-এর কাছে গেলেন। তাই মনে মনে কিছু ঠিক করে রেখেছিল। এইজন্য ও জেনে শুনে স্কুলে না গিয়ে বাড়ীতে বসেছিল। রাওজীর সঙ্গে তার তিন-চার

ঘণ্টা কথাবার্তা হয়েছিল। কী কথা হয়েছিল এটা 'তাই' আমাকে জানায় নি, কিন্তু সে তার কথায় অটল ছিল। এ-সব হওয়া সত্ত্বেও পরের দিন রাওজী ঐ পাজি লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে শিবরাম পন্থকে খুব গালাগালি করলেন। সুন্দরীকেও গালি দিতে ছাড়লেন না। শিবরাম পন্থ সত্যই শান্ত রূপ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষে বিচলিত হলেন। শেষে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন—"আপনি আপনার মেয়েকে নিঃসন্দেহে নিয়ে যান।" এই-সমস্ত কাণ্ড দেখে তাই-এর মনের ক্ষোভ অত্যন্ত বেড়ে উঠল। সে সমস্ত আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে রাওজীকে বলল—"যদি ফের আপনি এঁকে এই ধরনের অপমান করেন, তা হলে মনে থাকে যেন! চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। সকলের সামনে দেউড়ীতে মাথা কুটে মরব। আপনারাও সকলে পরিত্রাণ পাবেন। আপনার নামে যে কলঙ্কের ছায়া পড়েছে সেটাও দূর হয়ে যাবে। সকলে শান্তি পাবে! আমাব মা'র মৃত্যুর কারণ আপনিই, এবার আমার মৃত্যুর কারণও আপনিই হবেন।" তাই-এর এই ভয়ংকর মূর্তি ঐ বদমাইস লোকটার ওপর হয়তো কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, কিন্তু রাওজী খুবই অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি আর-কোনও কথা না বলে চলে গেলেন। 'তাই' মনে মনে ভাবল, এই ধরনের মনস্তাপ শিবরাম পন্থ সর্বদাই পেতে থাকবেন— এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি আমাকে ডাকল। আমি ঘাবড়ে গেলাম— তাই-এর মন কি বদলে গেল? সে কি তার স্বামীর কাছে যাবে বলে ঠিক করল না কি? তখন আমার স্মরণ হল, যে তাই-এর মনের দৃঢ়তা এইভাবে ভেঙে যাবার নয়। আমি তখন তাড়াতাড়ি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে তাই-এর কাছে গেলাম। সুন্দরী স্কুলে গিয়েছিল। তার মাও বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। তাই ঘরে একলা ছিল। ওখানে যেতেই সে গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত বলল। সে বলল— 'ভাউ! আমার সারা জন্ম কি অন্যকে দুঃখ আর যন্ত্রণা দিতেই কেটে যাবে? মা আমার জন্য যন্ত্রণা পেয়ে গেছেন। তারপর মামা, দিদিমা, মাসীমারা সকলেই আমার জন্য কষ্ট পেয়েছেন। সর্বশেষে, যাঁর

সঙ্গে আত্মীয়তা নেই সেই শিবরাম পন্থজীর, সেই মহানুভব সজ্জন ব্যক্তিকেও আমার জন্য দুঃখ, অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে গালিবর্ষণ করে এমন অপমান করে নি বোধ হয়। আমার জন্যই সব সহ্য করেছেন। ভাউ, বাস্তবিকই শিবরাম পন্থজী কত ভালো লোক; কত উপকার করেছেন আমার। আমি সারা জন্ম তাঁর সেবা করলেও এ ঋণ শোধ হবার নয়। আমার জন্যই এত অপমানিত হলেন, এই কথা ভেবে আমি সারা রাত কেঁদেছি। তিনি বলেছিলেন— 'আমার মেয়েও যদি এই দুরবস্থায় পড়ত তা হলে আমিও তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসতাম। তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা গালাগালি দিলে চুপ করে সহ্য করে যেতাম। আমি তোমাকে সুন্দরীর বড়ো ভগ্নীর মতোই দেখি। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা কোরো না।'—কঠিন সমস্যায় এই রকম সমাধান করবার মত কোথায় পাব? আমি আর কতদিন তাঁকে কষ্ট দেব? কখনো কখনো মনে হয়, অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে দিন-মজুরী করে নিজের পেট চালাই। ওঁর জায়গায় যদি অন্য কোনো লোক হতেন, কালকের সমস্ত কাণ্ড দেখে বলতেন— আমি এত গালাগালি শুনতে পারি না— বলে হাত ধরে টেনে ঘরের বার করে দিতেন। কিন্তু উনি সত্যই কত পবিত্র! কত উদার! কত উচ্চ-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন!"

পুণা ত্যাগ করার সংকল্প

ওকে আমি কী জবাব দেব? 'তাই' যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমার মনেও তার কথারই প্রতিধ্বনি— এঁর মতো উদার, সৎ ব্যক্তিকে আর কত কষ্ট দেব?— দু-একজন সমাজ-সংস্কারক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁরা তাইকে বোম্বাইতে পাঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিলেন। সেখানে এমন একজন আছেন যিনি নির্যাতিত নারীদের সাহায্য করেন। কেউ কেউ আবার

পরামর্শ দিল, যে মিশনারীদের বোর্ডিং-এ তাইকে রাখলে তার মনো-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এই-সব কথা শুনে আমার বড়ো রাগ হল। উপদেশদাতারা সব অন্যের নাম বাত্‌লাচ্ছেন, কেউ বলছেন না— "আমি নিজে সাহায্য করব—"। একজন ভদ্রলোক তো শিবরাম পন্থের কাছে এসে মিশনারীদের খুব প্রশংসা করে ওদের কাছেই তাই-কে রেখে দিতে বললেন। আমাদের দুই ভাই বোনের, এই-সব পরামর্শ-দাতাদের কথাবার্তা শুনে খুব রাগ হল।

এবারে, আমাদের কি হাল হবে?— আমরা দু-জনে ভাবতে লাগলাম। রাওজী, তাই-এর স্বামী আর তার ঐ পাজী ব্যবস্থাপক, ভবিষ্যতে কিভাবে আমাদের হেনস্তা করতে পারে— এই চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠল। শিবরাম পন্থও আমাদের জন্য চিন্তিত হলেন। আমি ঠিক করলাম, আমার পড়াশুনা সব ছেড়ে দিয়ে তাই-কে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাই আর সেখানে গিয়ে চাকরি-বাকরি করে দিন গুজরান্ করি। চারিধারে আগুন লেগে গেলে যেমন লোকে চতুর্দিকে পালাতে থাকে, ঠিক সেই রকম আমার মানসিক অবস্থা হয়ে গেল। এর এখন উপায় কি হবে? কোনো দিকে তো কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল একটা উপায় বের করা গেল যে, পুণা ছেড়ে এখন অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।

এরপর রাওজী আর আমাদের কাছে আসেন নি। কিন্তু তাঁর কটূক্তি-সম্বলিত খবরাখবর কেউ-না-কেউ এসে অবশ্যই দিয়ে যেত। আট-দশ দিন এই রকম খবর পেতে থাকলাম, কিন্তু রাওজীর দেখা নেই। আমার আশঙ্কা হল, রাওজী হয়তো পুণাতেই নেই, মাঝখান থেকে এই লোকগুলো এই ধরনের খবর রটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে ভাবলাম, নিজে একবার দেখেই নিই, সত্যি সত্যি রাওজী এখানে আছেন কি না। এমন সময় এক মজার খবর রটে গেল, রাওজী নাকি কাল এখানে এসে জোর করে 'তাই'কে নিয়ে যাবেন। আমি ঘাবড়ে গেলাম। এই-সব একগুঁয়ে লোকেরা যা জেদ ধরে তা করেই বসে, এতে কোনও ভুল নেই। আমি তো হতাশ্বাস হয়ে পড়লাম। তবু, মনে মনে ঠিক করলাম, আজ রাত্রেই তাই-কে

নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই। বলে না ?—'বিছার ঘর পিঠের পর—' সেই অনুসারে দু-চারটে কাপড় আর কিছু পয়সা নিয়ে পুণা ত্যাগ করার ষড়যন্ত্রে রত হলাম। কিছু টাকা শিবরাম পন্থ দিলেন। শিবরাম পন্থজীর সংসার এবার ভেঙে যাবে ভাবতেই, আমাদের দু-জনের খুব দুঃখ হল— চোখ জলে ভরে এল। চুপচাপ্ রাতের বেলায় বোম্বাই যাবার গাড়ীতে চড়ে বসলাম।

গুপ্ত সাহায্য

পরের দিন সকালে আমরা বোম্বাই পৌঁছলাম। শিবরাম পন্থজী তাঁর কোনও এক বন্ধুকে দেবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। আমি দুপুরে ওঁর এক লোককে নিয়ে বাইরে গেলাম। তিনি আমাকে ভুলেশ্বর মাধববাগ ইত্যাদি জায়গা দেখিয়ে বেড়ালেন। এত লোকের ভিড় আমি আগে কখনও দেখি নি। ছেলেবেলায় যা দেখেছিলাম তা মনে নেই। এমন সময় এই ভিড়ে এ কাকে দেখতে পেলাম! —তার খোঁজে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম, কিন্তু সেটা চকিত আভাস মাত্র ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ ভিড়কে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ঘরে ফিরেই আমি 'তাই'-কে বললাম যে, আমি শিবরাম পন্থকে চিঠিতে জানিয়েছি যে, বাবাকে আমি ভুলেশ্বরে মহাত্মা দেবীর মারোয়াড়ী বাজারে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। আমি ভাবতে লাগলাম যে-ব্যক্তিকে আমি পুণায় রেখে এসেছি তিনি এখন বোম্বাইতে! যদি বোম্বাইতে এসেও ঐ একই অবস্থা দাঁড়ায়, তা হলে বোম্বাইও ছেড়ে চলে যেতে হবে। জীবনে কখন কখন এরকম হয় যে, যেখান থেকে বিপদ আসার কোন কল্পনাও করি না, সেখান থেকেই বিপদ এসে যায়। আমাদের অবস্থা এরকম হল যে, না পারি পুণায় ফিরে যেতে, না পারি অন্য কোথাও যেতে। ভাবলাম একবার ভালো করে খুঁজেই দেখি, যদি কোথাও বাবার দেখা পাওয়া যায়। দেখা পেলে তাঁকে আমি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করব, সেইজন্য যে জায়গায়

প্রথম তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম বলে মনে হয়েছে, সেখানে গেলাম। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক খুঁজে দেখতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পেলাম না। শেষে তৃতীয় দিনে পন্থজীর চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, আমার বাবার সঙ্গে তাঁর জামাইয়ের খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। এটা পড়ে আমি খুব খুশি হলাম। তখন আমি ধরে নিলাম, ভবিষ্যতে আর বাবার কাছ থেকে কোনও কষ্ট পাব না। এইজন্য আমরা পুনরায় পুণায় ফিরে এলাম। আমাদের ঐ বদমাইস শত্রু— সেই লোকটা, আমাকে হেনস্তা করবার জন্য দু-একবার এসেছিল, কিন্তু কোনো কথাকেই আমরা আমল দিলাম না। এই রকমে আমাদের বিপদ কিছুটা সামলে নিলাম।

দুমাস কেটে গেল। আমি তখন কলেজে ছিলাম, হঠাৎ পিয়ন এসে আমার হাতে একটা রেজিস্টার্ড খাম দিয়ে গেল। খামটার ওপর অনেক টিকিট লাগানো ছিল। আমি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, হাতের লেখাও চিনতে পারলাম না। দস্তখৎ করে খামটি নিলাম। খুলে দেখি ভিতরে দুটো দশ টাকার নোট, আর একটা পাঁচ টাকার। এবং তার সঙ্গে একটা চিঠি।

ঐ চিঠিতে লেখা ছিল— আপনার মতো বন্ধুর কাছ থেকে যে উপকৃত হয়েছে সেইরূপ কোনো ব্যক্তিই এই টাকা পাঠাচ্ছে। এ টাকা পেয়ে আপনার খুব আশ্চর্য লাগবে। কিন্তু এ টাকাটা আজ অথবা ভবিষ্যতে ঋণ বলেই গ্রহণ করবেন। যখন আপনার অবস্থার উন্নতি হবে তখন আমি আপনার কাছে নিজে গিয়ে টাকাটা ফেরত নেব। আপনার উন্নতির সময় কাছে এসে গেছে। আশা করি, বন্ধুর এ সাহায্য অনাদৃত হবে না।

এ লেখাটা কার জানবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধিতে এর কোনো কিনারা করতে পারলাম না। সমস্ত ঘটনা যেন এক উপন্যাসের মতো মনে হল। আমি দাদার, —অর্থাৎ শিবরাম পন্থজীর কাছে এই-সব কথা শোনালে, তিনিও আমাকে এক অদ্ভুত খবর দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। তিনিও এক বেনামী চিঠি পেয়েছেন। তাতে লেখা ছিল—

"আপনার কাছে যে শ্রেষ্ঠ গুণ আছে, তাকে চিনতে পারার লোক এ সমাজে নেই এটা ভাববেন না। আপনার ঔদার্য্য ও ত্যাগের বিষয় আমি জানি। এই পত্রলেখকের বিনীত অনুরোধ, এই টাকা পাঠানোর জন্য অসন্তুষ্ট হবেন না। ঐ টাকার, আপনি যত উপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারবেন, আমি ততটা পারব না। সেইজন্য টাকাটা আপনার কাছেই পাঠালাম। কে টাকা পাঠাল, জানতে চেষ্টা করবেন না।" আমাকে লেখা চিঠির হস্তলিপি আর দাদা পন্ত-জীকে লেখা চিঠির হস্তলিপি আলাদা বলে মনে হল। গংগু-তাই দুটোকেই দেখে তুলনা করতে লাগল। আশ্চর্যের কথা এই, আমার খাম দেখে 'তাই' বলল যে এ অক্ষর কোনো স্ত্রীলোকেরই হবে। কিসের ভিত্তিতে ও এ-কথা বলল, জানি না। আর দ্বিতীয় কথা, চিঠির শেষে, 'প্রেরক' না লিখে, 'প্রেরিকা' লেখা ছিল। সেটা মুছে ফেলে 'আ'-কার ও হ্রস্ব ই-কারের লোপ-সাধন করে 'প্রেরক' —লেখা হয়েছে। 'তাই', এটা ধরতে পেরেছিল। টাকার প্রেরক স্ত্রী কি পুরুষ এটা জেনেই বা কি লাভ? 'তাই' আর-একটা কথা মোক্ষম বলেছে— টাকা যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হতে পারেন, অথবা ভাই-বোনও হতে পারেন। —তাই-এর এই গবেষণা কোনো উপন্যাসের ঘটনার মতো মনে হচ্ছিল। তাই-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আর তর্ক-বিতর্ক করতে মন চাইল না। শেষে, তর্ক-বিতর্ক রেখে আমি ভাবলাম, দেখাই যাক-না কী হয়! যে তারিখে আমার কাছে পঁচিশ টাকা এসেছিল, পরের মাসে ঠিক সেই তারিখে পঁচিশ টাকা আবার এল। কিন্তু কোনো চিঠি তার সঙ্গে আসে নি। ঐ রকম, দাদা-জীর কাছেও একশো টাকার নোট এল, কিন্তু তার সঙ্গেও চিঠিপত্র কিছু নেই!

শান্তির দিন

এটা মনে করো, যেন গুপ্ত পথে আমাদের সৌভাগ্যেরই সঞ্চার হল, কারণ ঐ দিন থেকে কারো কাছ থেকে কোনো কষ্ট আমাদের পেতে হয় নি। আমি নির্বিঘ্নে কলেজে যেতে লাগলাম। সমস্ত পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে পাস করে যেতে লাগলাম। শেষ পরীক্ষার সময় এসে গেল। ওদিকে গংগু-তাই আর তার বান্ধবীর লেখাপড়াও ভালোভাবেই চলতে লাগল। দাদা-শিবরাম পন্থজীর উদার কল্পনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। আমার কলেজের পড়া প্রায় শেষ হয়ে এল। দাদাজী প্রথমে আমাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলতেন তা ছিল মুখ্যতঃ উপদেশাত্মক। কিন্তু আজকাল তিনি প্রায় সমপর্যায়ের বন্ধুর মতো আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। সেদিন শনিবার ছিল। অফিসের ছুটির পর তিনি সোজা বাড়ীতে না গিয়ে আমার কলেজে এলেন। সেখান থেকে আমরা দুজনে পদব্রজে ভ্রমণে বের হলাম। সন্ধ্যার সময় নদীর ধারের শীতল হাওয়ায় তাঁর মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। আমি, আমার ঘরে একা একা থাকতাম। আজ অনেকদিন পর দাদাজীর সঙ্গে বার্তালাপ করার সুযোগ পেয়ে আমার মনও খুব আনন্দিত। এমন সময় আমার একটা কথা স্মরণে এল। একজন ভদ্রলোক দাদার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য খুব আগ্রহান্বিত। কয়েকদিন আমাকে ধরেছেন পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু আমি ভুলে যাওয়ায়, দাদাকে আর সে কথা বলা হয় নি। দাদাজীকে এখন বললাম সেই ভদ্রলোকের কথা। তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতি আমারই মতন। তাঁর বোন অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাঁকে খুব কষ্ট দেয়, মারধর করে। ওঁর এই দশা শুনে মনে হল, আমার 'তাই' এর চেয়ে অনেক ভালো আছে।

"সংসারে এরকম লোক বহু আছে। তোমার সেই ভদ্রলোকটি কে?"

"তিনি কোলহাপুরের লোক। ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার জন্য

এখানে এসেছেন। একদিন আপনার কাছে নিয়ে আসব ? আপত্তি নেই তো ?"

দাদাজী হেসে বললেন, "আরে, আপত্তির কি আছে ? কিন্তু আমার কাছে এসে সে করবে কি ?"

আমিও হেসে উত্তর দিলাম— "মনে হচ্ছে তিনিও তাঁর বিধবা বোনকে আপনার আশ্রয়ে রেখে দিতে চান।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদাজী গম্ভীর ভাবে বললেন—'ভাউ, এখন তুমি বড়ো হয়ে উঠেছ। এটা কলেজের তোমার শেষ পরীক্ষা। এটা হয়ে গেলে ভবিষ্যতে কী করতে চাও ? কিছু ঠিক করেছ ?" হঠাৎ এ প্রশ্ন করায় আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। অনেকদিন থেকেই আমার মনে একটা সংকল্প ছিল, সেটা আমি দাদাকে ব্যক্ত করলাম। বললাম, "আমার দেশ-সেবা করবার ইচ্ছা আছে এবং আমার নূতন বন্ধুটিরও তাই ইচ্ছা।"

দাদা বললেন, "তোমার এই সংকল্প তো ঠিকই আছে, কিন্তু এর জন্য তুমি কোনো পন্থা কি ঠিক করেছ ? ভাউ, আমাদের দেশ খুব অনুন্নত, এইজন্য এর উন্নতি সাধন করা সব দেশবাসীদেরই কর্তব্য। কিন্তু ঘর বানানোর জন্য যেমন নক্‌শার দরকার হয়, টাকার দরকার হয়, তেমনি দেশের জন্যও সেই রকম ভাবে ভাবতে হবে। দেশ-সেবা, সমাজ-সংস্কার, স্বাধীনতা— এ-সব খুব বড়ো বড়ো মধুর ও গম্ভীর কথা। বলতে খুব সোজা। কিন্তু এর গুরুত্ব সম্বন্ধে কেউ বিশেষ অবহিত বলে মনে হয় না। দেশের হিত কিছু বাজারের জিনিস নয় যে, ঝট্ করে গেলে আর কিনে নিয়ে এলে। বলো··· দেশের হিতসাধন করবে তো বলছিলে, কিন্তু, কি করে করবে ?"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলতে লাগলেন—"ভাউ, তুমি এখনও ছাত্র। দুনিয়ার অনেক কিছুই এখনও জান না। আর, তোমার এখন এমন একটা বয়স যখন মনের মধ্যে অনেক কল্পনা, অনেক সংকল্পের আবির্ভাব হয়ে থাকে। কারও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে ইচ্ছা করে। আবার, কেউ বলে উকিল বা ডাক্তার হব। কিন্তু এ কথা কেউ বলে না, যে, নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেশের

জন্য বা দেশবাসীর জন্য আলাদা ভাবে কিছু কাজ করব। এই ধরনের ভাববার লোক খুব কম আছে।"

দাদার একটা প্রশ্নেরও আমি জবাব দিতে পারলাম না। শেষে দাদা হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, "দেখো, বিনা বিচারে, বিনা চিন্তায় পথ চলা, আর সুচিন্তিত সুনির্দিষ্টভাবে পথ চলা, এ দুটোর মধ্যে অনেক তফাত আছে। এই কারণে জীবনে যা তোমার সাধ্য তার সিদ্ধির জন্য বহু আগে থেকেই সুচিন্তিত পথ বেছে নেওয়া দরকার। অর্জুনের মতো একনিষ্ঠ, ও একলক্ষ্য হওয়ার দরকার।"

বলতে লাগলেন, "আমি আমার মেয়ে সুন্দরীকে অনূঢ়া রেখেছি, এর একটা বড়ো কারণ আছে। তোমার বোনকে পড়াচ্ছি, তার পিছনেও একটা মহৎ কারণ আছে। এ পর্যন্ত এরা দুজনে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পথে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দুজনেরই বয়স অল্প। অনেক কিছু বিরুদ্ধ সামাজিক পরিস্থিতি, পুরাতন রুচি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, কারও কাছ থেকে কোনও অর্থসাহায্য না পাওয়া -- এত-সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই দুটি মেয়ে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হীরের টুকরোর মতো রয়ে গেছে। এইজন্য মনে হয় ওরা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তোমার বোনের মতো তার এক বান্ধবী মিলেছে, —এ-ও এক সৌভাগ্যের কথা।"

প্রস্তুতি

দাদাজী এই-সব বলতে বলতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন। তাঁর চেহারায় সবসময় এক প্রশান্তি ছেয়ে থাকত। আজ তাঁর চেহারার মধ্যে অস্তোন্মুখ সূর্যের রক্তিম বিন্দুর প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য দেখা দিয়েছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে, শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম —এই তিন ভাবে আপ্লুত হয়ে, তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি সব সময় এই কথা

ভাবি, যে সংস্কার সাধন করতে যাচ্ছে তার কেবল উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবে করলে চলবে না। তার কর্মের অন্তরে প্রবেশ করা দরকার, সমাজ-শরীরের ভিতরে যে রোগ প্রবেশ করেছে, ভিতরে ঢুকে তার বীজাণু নষ্ট করে দেওয়া উচিত।"

তিনি বলে চললেন, "এই সময় আমার এক পুরানো বন্ধুর কথা মনে হচ্ছে। আমি একদিন এই রকমই, সন্ধ্যাবেলায় গেটওয়ে অফ্-ইণ্ডিয়ার পাশে এক বেঞ্চে বসেছিলাম আর অনেকক্ষণ ধরে সূর্যাস্তের শোভা দেখছিলাম। আজ থেকে বিশ বছর আগের ঘটনা। আমরা তখন দু'জনেই তরুণ। আমাদের এই উচ্চাশা ছিল, যে এই দুনিয়াতে এসে এমন একটা চোখ-ধাঁধানো চমক-লাগানো ব্যাপার করে তুলব, যে সমস্ত পৃথিবী অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে। আমাদের দু-জনেরই অর্থবল কিছু ছিল না। কিন্তু আমাদের কল্পনা, উচ্চাভিলাষ কিছু কম ছিল না। আমরা দু-জনে যমজ ভাইয়ের মতো কথাবার্তা বলতাম। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারিক দিক অপেক্ষা কল্পনামণ্ডিত সুখান্বেষী ভাবনা থেকেই বেশি আনন্দ পেতাম। আমাদের দু-জনেরই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের পত্নীরা তাঁদের নিজেদের পিত্রালয়ে থাকতেন। যত-সব নূতন নূতন চিন্তাধারা, নূতন পরিকল্পনার ভাবনারাশি আমাদের মন অধিকার করে বসেছিল। বিশ বছর বাদে যখন সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হল, তখন আমরা পরস্পরকে দেখে হাসতে লাগলাম। সেই বন্ধুটি বলল তোমার আর আমার অবস্থা একই রকম। প্রথমে আমাকে আর্থিক সংস্থানের চেষ্টা করতে হয়েছে, পরে সমাজ-সংস্কার-সাধন। ঘরের স্ত্রীলোককে ঘরের সমস্ত কাজকর্ম করতে হত। এ-সব করবার পর অবসর সময়ে যদি তাদের স্বাচ্ছন্দ্য না দিতে পারি, আরাম না দিতে পারি, শুধু তাদের পিছনে লেগে থেকে— পড়ো! পড়ো! এই বলতে থাকি তা হলে তারা স্বস্তি হারিয়ে ফেলে। তারা সুখ পাবার বদলে দুঃখই পায়। তাই প্রথমে মনকে প্রস্তুত করা দরকার, তা হলেই শিক্ষার মূল্য তারা বুঝতে পারবে। যদি আমার ঘরে মেয়ে জন্মায়, তা হলে তার বিবাহ না দিয়ে লেখাপড়া করার আর

উপদেশ দিতে থাকব— ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষাদান করো —এটাই হচ্ছে দেশসেবা—। আমার বন্ধুটির এই অভিমত শুনে আমার মনে হল, কী যা-তা পাগলের মতো বকছে! তার আর আমার মধ্যে আদর্শের যথেষ্ট মিল ছিল, কিন্তু এখন এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে মতভেদ হল। সে উপন্যাস-নভেল ইত্যাদি খুব বেশি পড়ত, ওকে ঠাট্টা করে বললাম— তোমার এ পরিকল্পনা সব অবাস্তব। ওর নাম রেখেছিলাম— 'ভ্রমর'। সেইদিন রাত্রেই তার হঠাৎ জ্বর এল। নয় দিনের দিন ও মারা গেল। পুরো নয় দিন তার মাথার কাছে বসেছিলাম। সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিল। মৃত্যুর আগে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, বলেছিল "এখন আর আমার দ্বারা কিছু হবে না—। তুমিই সব করো।" এই রকম কিছু অস্পষ্টভাবে বলল। মধ্য রাত্রে সে মারা গেল। আমার সেই স্নেহশীল বন্ধুটি আমাকে একলা রেখে ছেড়ে চলে গেল। এই বিশাল বোম্বাই শহরে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। সে তার বাপ-মায়ের একই মাত্র সন্তান ছিল। তার স্ত্রীর বয়স খুব অল্প ছিল। তার পরিবার-বর্গকে এই মর্মন্তুদ ঘটনা জানাবার দুর্ভাগ্য আমার ওপর পড়ল। আমি ভেবেছিলাম ওদের তিনজনের আমিই একমাত্র আশ্রয়। এই ভেবে আমি চাকরি নেব ঠিক করলাম। কিন্তু বোধ হয় ভগবানের এটা মনঃপূত হল না। কেননা, কিছুদিনের মধ্যে ঐ তিনজনেরই মৃত্যু হল। অর্থাৎ এক বছরের ভিতর তার সমস্ত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই ব্যাপার আমার মনের ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। বার বার ঐ ঘটনা স্মরণে আসতে থাকে। আমার ঐ বন্ধুটির দূরদর্শিতা ও সততার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলাম। সে যা করতে চেয়েছিল, আমি যদি সেই আদর্শ অনুসরণ করি, তা হলে তার আত্মা শান্তি পাবে। আমার স্ত্রী যে গার্হস্থ্য কর্মে খুব পাকা হয়ে উঠবে, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত, কখনও তাকে অন্যমনস্ক বা ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি। আমার কামনা অনুযায়ী কথার জন্ম হল। সেও তার মায়ের স্বভাব পেল। সেই ছেলেবেলা থেকেই, আমি কখনও তার সঙ্গে রেগে কথা বলি নি। আমার কন্যা, সুন্দরী,

সমস্ত কাজই খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে করত। আমি সুন্দরীর মনকে খুব দৃঢ় করে তৈরি করেছি। আজ পর্যন্ত যা হয়েছে, তা কেবল পটভূমিকা। এখন পুরোপুরি রচনার দিন এসে গেছে। আমার ইচ্ছা, তুমি, তোমার বোন গংগুতাই, সুন্দরী আর আমি, এই চারজন মিলে কোনও কর্ম-যজ্ঞের শুভারম্ভ করি। যাদের কোনো কাজকর্ম নেই তারা এই মিথ্যা জল্পনায় সময় নষ্ট করে যে, 'প্রথমে রাষ্ট্রিক উদ্যোগ করব, না সামাজিক ?' কিন্তু আমাদের কথা তা নয়। আমরা এই ধরনের বৃথা জল্পনায় সময় নষ্ট করব না। আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রারব্ধ কাজ পূর্ণ করতে হবে। আমি আমার সারা সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইতিহাস পড়ে কাটিয়েছি। এতে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে, যে ছোটোখাটো তুচ্ছ কথার বিতর্কে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সুন্দরী ও 'তাই', দুজনেই খুব বুদ্ধিমতী। তাদের কোনও সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পথে যাওয়া উচিত। আমি সে পথ খুঁজে পেয়েছি। এখন দেখো, সেটা তোমার মনঃপূত কি না।"

দাদা-জীর কথা আমি নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম। সব-কিছুই আমার অসাধারণ ও অভূতপূর্ব বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু, কী তাঁর চিন্তাধারা, ঠিক কী তিনি করতে চাচ্ছেন, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবু, তাঁকে বললাম— "আপনি কী কী কাজের পরিকল্পনা করছেন, সেটা আগে আমাকে বলুন, এ সম্বন্ধে আমি নিজে যা ভেবেছি তা আপনাকে পরে জানাব।"

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আগে, তুমি তোমার নিজের পরিকল্পনার কথা বলো, পরে আমি, আমারটা বলব।"

এমনিতে সত্যি আমার কোনও পরিকল্পনা মাথায় ছিল না। দাদার পরিকল্পনাটাই আগে শুনব, এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করবার সাহসও ছিল না। শেষে আমি মন্তব্য করলাম— "আমার, আর যোজনা-পরিকল্পনা কি ? ধরুন, কখনও মনে হয়েছে, আপনি আমি সুন্দরী আর 'তাই'— সকলে মিলে এমন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করি যেখানে শিক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। আমরা সকলে মিলে পেট চালাবার কোনও ব্যবস্থা করে নেব। বিধবা নিরাশ্রয় নারীদের জন্য

এমন কোন কার্যক্রম বের করি, যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, পুঁতির কাজ, লেখার কাজ, ভাষণ বা গুছিয়ে কথা বলতে শেখানো ইত্যাদি সব ঘরোয়া কাজের নানা প্রকরণ শেখানো উচিত। সমাজ-সংস্কারের প্রচারের কাজে লেখা আর ভাষণ দেওয়া, দুটোরই খুব প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে সমাজ জাগবে। সব পরিশ্রম আমাদেরই করতে হবে, কাজেরও সুষ্ঠ বণ্টন হওয়ার দরকার।"

আমি এই কথাগুলো বলবার সময় দাদা-জীর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। আমি যা-কিছু বলেছি তা আগের থেকে ভেবেচিন্তে কিছু বলি নি। কেবল দাদা যখন আমার কাছে শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন তখনই আমি তাঁকে আমার পরিকল্পনা শোনালাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমাব মুখ থেকে যে-সব কথা বেরোলো, তা শুনে আমি নিজেই খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার ভাষণ শুনে দাদার কেমন লাগল বলতে পারি না। কিন্তু আমার উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বার বার আমাকে দেখছিলেন, আনন্দিত হয়ে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে। আমার কথা শোনবার পর তিনি বললেন, "তোমার সব কথার ভিতর উৎসাহের উদ্দীপনা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু এ উৎসাহ যেন অটুট থাকে— ধ্রুবতারার মতো দৃঢ় ও অচঞ্চল থাকে।"

তখন তিনি নিজের কথা বলতে লাগলেন—"ভাউ, অন্যান্য সংস্কার সাধনের আগে গৃহ-সংস্কার সমস্ত সংস্কারের প্রথমে। প্রগতিসম্পন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস যখন পড়ি তখন দেখতে পাই সে রাষ্ট্রের নারীসমাজ কত শিক্ষিত। যখন নারীরা শিক্ষিতা হয় এবং সমাজ-সংস্কারক হয়, তখন তাদের সন্তানেরাও শিক্ষিত, সমাজসেবী ও দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠে। পিতা ও পুত্রের, মা'র সঙ্গে সম্বন্ধ কম থাকে। মায়েদের আলাদা ভূমিকা। তাঁরা সংভাবনা, সংকর্মের প্রেরণাদাত্রী। মাতা সন্তানের জন্য যা করে তার মূল্য প্রথমেই বোঝা যায় না। পরে উপলব্ধি হয় যে, তিনিই সমস্ত চিন্তা ও কর্মের উৎসস্থল।" এইজন্য তিনি ভারতীয় নারাদের কার্যকলাপের পরিচয় দিলেন।

সেই দিন রাত্রে ঠিক করা হল যে, শীঘ্রই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের এই কার্য-ক্রম শুরু করা হবে। বাড়ীর প্রত্যেকেই অনুভব করল যে, যা-কিছু আমাদের করণীয় তাতে আমাদের যেন জন্মগত অধিকার আছে। তাই-এর এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল। সে বলতে লাগল—"আমার মতো অনেক অভাগিনী নারীর বুদ্ধির বিকাশ হবে, এবং এর দ্বারা আমার তরফ থেকে দেশকে কিছু সেবা করার সুযোগ পাব। যত কঠিন কাজই হোক-না কেন, আমি তা সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে পালন করব।"

কর্মারম্ভের কিছু মজাদার বৃত্তান্ত !

আমার শেষ পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পর দু'মাসের মধ্যে আমাকে বোম্বাই যেতে হয়। আমি ফেলোশিপ পেয়েছিলাম এবং কোনো এক ধনী হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি 'এল.' এল. বি.' পড়বার জন্য সাগ্রহে আমার সমস্ত কলেজ-ফিস্ দিয়ে দিয়েছিলেন ! কিন্তু শিবরাম পন্থ-জী, সুন্দরী, তার মা আর তাই সকলেরই ইচ্ছা যে, আমি এখানে না থেকে বোম্বাই-এ গিয়ে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করি। দাদা শিবরাম পন্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলাম না। ফলে আমাকে বোম্বাই রওনা হতে হল।

আমার বোম্বাই রওনা হওয়ার আর তিন দিন বাকি ছিল। একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। কথায় কথায় আমি তাই-কে বললাম "এত ছোটো ছোটো কথাতেই যদি তোমরা এত চিন্তিত হয়ে ওঠো তা হলে বড়ো বড়ো সব ঘটনার সম্মুখীন হবে কি করে ? আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বাড়ীর স্ত্রীলোক-দের মন আমার দিকে টেনে নিতাম। 'তাই', তুমি তো নিজেকে খুব সাহসী বলে মনে কর। এই কি তোমার সাহসের নমুনা !"

আমি এটা অবশ্য তাই-কে খ্যাপাবার জন্যই বলেছিলাম। কিন্তু কথাগুলি তাই'এর মনে গিয়ে আঘাত করল। পরের দিন তাই.

চুপ-চাপ কাউকে না বলে কোথায় যেন চলে গেল। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল, শুনে আমরা সকলে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লাম।

তাই ট্যাঙ্কের থেকে জল আনতে যেত। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। একদিন ঐ মেয়েটি তাকে বলল, সে সোয়েটার বোনা শিখতে চায়। সেই সূত্রে 'তাই' আজ ওর কাছে গিয়েছিল। মেয়েটির বাড়ীর সঙ্গে তাই-এর কোনও পরিচয় ছিল না। সে মনে মনে কল্পনা করেছিল, যে আজ এই প্রথম সে কাজ উপলক্ষে একলাই বাড়ীর বাইরে বেরোলো এবং সে-কাজ সম্পূর্ণ করলে সে খুব প্রশংসা পাবে। তারপর সন্ধ্যাবেলায় সেদিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভাউ-এর সামনে ব্যাখ্যান করবে। এই-সব ভেবে সে খুব আনন্দ অনুভব করছিল। তাই-কে সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল "আপনি কী সূত্রে এখানে এসেছেন ?" তাই তাকে আগেকার কথা মনে করিয়ে দিল এবং সাগ্রহে বলল, "আমি কাঁটা উল সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। চলুন, আপনাকে বোনা শিখিয়ে দিচ্ছি ; হাতে আমার এখন অনেক সময় আছে।"

তাই ভেবেছিল, এই কথা শুনে মেয়েটি হয়তো খুব খুশি হবে। তার বদলে সে ধীরে ধীরে বলল "আপনি শীগ্‌গির সরে পড়ুন এখান থেকে। ভাগ্যক্রমে আমার শাশুড়ী এখন ভেতরে খেতে বসেছেন। একদিন তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখে খুব বকেছিলেন। আর, আজ আপনাকে এখানে দেখলে, আমার অবস্থা যে কী হবে তা বলতে পারি না। আমার আর-কিছু শিখবার দরকার নেই। কৃপা করে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। ভবিষ্যতে আর কখনও আমার কাছে আসবেন না। শীগ্‌গির যান, ঐ দেখুন এসে পড়লেন বলে ! যদি আপনাকে এখানে দেখাতে পান, তা হলে আমার আর রক্ষা নেই।" তাড়াতড়ি এই-সব কথা বলতে বলতে সন্ত্রস্ত হয়ে মেয়েটি বাড়ীর ভিতর চলে গেল। তাই-ও, অমনি উল্টোপথ ধরে বাড়ী ফিরে এল। তাই, এই-সব ঘটনা হাসতে হাসতে আমাদের কাছে বলল।

বোম্বাই চলে আসবার পর 'তাই' চিঠিতে জানাল—"একটি ছেলে রোজ দাদাজীর কাছে আসত। সে বলত তার স্ত্রীর পড়াশুনা করবার ইচ্ছা আছে। পরে এ সম্বন্ধে খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। ফলে, আমি তার বাড়ীতে একদিন চলে গেলাম। তার বাড়ীর দরজায় এক পা রাখতেই শুনতে পাওয়া গেল, ছেলেটির মা তাকে গালাগালি দিয়ে বলছেন—

—"একবার আসতে দাও তাকে— আচ্ছা করে গালাগালি দিয়ে তাকে অপমান করব। যদি তোমার স্ত্রীকে পড়াতে চাও, তা হলে আমার এখান থেকে তুমি চলে যাও। আমার নিজের কাজ নিজেই সামলাতে পারব।"

"মা, এর ভেতর কী খারাপ কথা দেখলে? পড়াশুনা করাটা কিছু পাপ নয়?"

"যাই হোক-না কেন, তোমার যা-কিছু করবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে করো। না হলে বলো, আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, আমি পড়াব না। কিন্তু, আজ তাঁকে এখানে আসতে বলেছি। তাঁকে অপমান কোরো না…"

"তুমি এখনই যাও, তাঁকে গিয়ে বলো ভবিষ্যতে যেন কখনও এখানে না আসেন। পাজী. নির্লজ্জ কোথাকার? স্ত্রীকে পড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখন, স্ত্রীকে পড়িয়ে কোথায় কি রাজ্য জয় করবে কে জানে। যদি ঐ মেয়েছেলেটি আমার ঘরে আসে, তা হলে এঁটো বাসনের নোংরা জল তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারব।"

"না! না! মা, না…তোমাকে কতবার আমি বলেছি না?…"

"কিছু আর বলতে হবে না আমায়। যত সব তোমার ঐ ম্যাডাম আর খেরেস্তান্ না হলে, এমন কাজ কোনও ভদ্রঘরের মেয়েছেলেরা করে না। যাই হোক, আমি ওকে আমার দরজার চৌকাঠ মাড়াতে দেব না।"

এই-সব বার্তালাপ আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। যদি ঐ সময় চলে না আসতাম, তা হলে ঐ স্ত্রীলোকটি আমার

গায়ে সত্যি-সত্যিই নোংরা জল ঢেলে দিত। বাড়ীতে এসে আমি সব কথা জানালাম। এরকম অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মন শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের কথা শুনে দুঃখ পাই নি। বরঞ্চ, শুনে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন আরও এক মজার ব্যাপার ঘটল। সেই ছেলেটি এসে পন্থজীকে বলতে লাগল, "কাল আপনার এখান থেকে কেউ যায় নি। আমরা অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। শেষে আমার স্ত্রী বলল— উনি যদি পড়াবার সময় না পান, তা হলে কষ্ট করে আর আসার দরকার নেই—।" আমার তো এই কথা শুনে মনুষ্য-প্রকৃতির বিচিত্র সব রূপের পরিচয় পেয়ে, হাসি পেতে লাগল। নিজের আত্মাভিমান বজায় রাখবার জন্য ছেলেটি কত মিথ্যা বলছিল। যদি সেই সময় আমার সব শোনা কথা বলে দিতাম, তা হলে ছেলেটি কী ভীষণ লজ্জা পেত।"

এই রকম অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওদের হতে লাগল। কেউ নিন্দা করত, কেউ বা করত অপমান। তবু ঐ দুই মেয়ে সব সহ্য করে প্রসন্ন মনে থাকত। এখন অনেক লোক জেনে গেছে যে এই দুই মেয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হয়েছে।

একদিন দাদা কলেজের এক ছাত্রের চিঠি পেলেন। লিখেছে—"দু-চার জন তরুণ ছাত্র তাদের স্ত্রীদের পড়াতে চায়। তাতে তাদের যত লোকনিন্দাই হোক, সব সহ্য করবে। আপনার মেয়ে ও ভাউরাও-এর ভগ্নীর মতো বিদূষী শিক্ষিকাদের কাছ থেকেই তারা পাঠ গ্রহণ করতে চায়। এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় আমাকে লিখে জানান—।" এই চিঠি দাদাজী আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমার মত জানতে চেয়েছিলেন।

আমার মনে হল সারা ভারতবর্ষে 'তাই' আর সুন্দরীর কীর্তি শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়বে। এখন দু-জনেরই জীবন বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষ লক্ষ্যে ব্রত হবার সময় এসেছে। এখন বৃথা সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না— এই মনে করে শীঘ্র আমার অনুমতি লিখে জানালাম। তাই-এর চিঠিও পেয়ে গেলাম, লিখেছে, "আমি এই

করব, সেই করব, ইত্যাদি। আমরা এই-সব মেয়েছেলেদের বুদ্ধিমতী ও সুশীলা করে তুলব। পড়ানোর জায়গাও পন্থজীর ঘরে ঠিক হয়েছে। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ পড়ানোর ব্যাপার এল তখন দেখা গেল কেউ এল না। পনেরো মিনিটের মধ্যে ওই শিক্ষার্থিনীরা চলে যাবার কথা ধুয়া তুলে জানাল, তারা তো পড়তেই চায়, কিন্তু তাদের শাশুড়ীর ভৎর্সনা সহ্য করতে হয়। সেইজন্য তারা আসতে চায় না। এই রকম করে আমার আর সুন্দরীর, আর-এক নূতন অভিজ্ঞতা হোলো।"

আমার মন ঐ-সব শিক্ষার্থীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। যে ছাত্রটি দাদাজীকে চিঠি লিখেছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে তিরস্কারপূর্ণ চিঠিতে জিজ্ঞাসা করলাম—

"এই কি তোমাদের বিদ্যোৎসাহের নমুনা?" এই ভাবে দু-তিনটা চিঠি লিখবার পর, সে জবাব দিল—"আমার তো উৎসাহ পূর্বের মতোই আছে। কিন্তু আমার স্ত্রীর সে উৎসাহ আর নেই।" আমি এই কথা দাদাজীকে লিখে জানালাম। তিনি জবাবে লিখলেন, "যা কিছু ঘটে গেছে, তা সবই খারাপ মনে করে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। এই রকম তরুণ উৎসাহী যুবক অনেক আছে। কিন্তু স্ত্রীদের কারণে তাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয়। তবু, তাদের এই উৎসাহ খুবই প্রশংসনীয়।"

নূতন প্রগতি

এই রকম সব মজার মজার ব্যাপার ঘটতে থাকল। কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে লোকেদের মনের ভুল ধারণা দূর হয়ে যেতে লাগল। লোকেদের মনে নূতন কল্পনা, নূতন ভাবনা জাগতে লাগল। আমাকে যে ব্যক্তি গুপ্ত-দান করে যাচ্ছিল, তার দাক্ষিণ্য এখনও অব্যাহত। তার সাহায্যে আমি বই, সেলাই-এর কল, উল ইত্যাদি এখনও কিনতে পারছি। কিন্তু যতখানি আমি তাকে ব্যবহার করতে চাই ততখানি

করতে পারি না। আমার এই আশা ছিল, যে, যখন স্ত্রী-সমাজে এই আদর্শের যথেষ্ট প্রচার হবে এবং যখন তারা স্বেচ্ছায় পড়বার জন্য, শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসবে তখনই এই-সব কথা ফলপ্রসূ হবে। কিছুদিন বাদে দুজন মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এল এবং তারা অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল। আমাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে মুখ্যত পরিচ্ছন্নতা ও গৃহ-সজ্জার ওপর ঝোঁক দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আর এইসঙ্গে ঐ স্ত্রীলোক দুটির উৎসাহও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রথমে এরা মাত্র এক ঘণ্টা করে কাজে বসত, এখন দু-ঘণ্টা করে বসছে। ক্রমে ক্রমে তাদের ক্লাসে কখনও ঐতিহাসিক কাহিনী, কখনও পুরাণের কথা আলোচনা করতে লাগলাম। ওরা এ কথাটাও মনে রেখেছিল যে, কাপড় সেলাই করলে কাপড়ের অনেকখানি সাশ্রয় হয়। সেলাই-এর কাজ, মেয়েদের বেশি শেখাতে লাগলাম। ক্রমে পায়জামা, কুর্তা, ব্লাউস ইত্যাদি তৈরি করাও শেখানো হল। কখনও কখনও, পাণ্ডব, প্রতাপ, হরিবিজয়, ভক্তিলীলামৃত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির উপর ব্যাখ্যান চলত। উদ্দেশ্য এই, যে ঈশ্বরের প্রতি যেন ভক্তি-ভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই রকম সমস্ত কথা, 'তাই' আমাকে চিঠিতে লিখত।

আমার পরীক্ষা কাছে এসে গেল। আমি সমস্ত মনোযোগ একাগ্রতা নিয়ে পড়তে লেগে গেলাম। কিছুদিন বাদে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। ভবিষ্যতের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা, জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য পুণায় যাওয়া ঠিক ছিল। কিন্তু এমন সময় তাই-এর এক চিঠি এল। ওর মধ্যে বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত কথা লিখেছিল। সেটা পড়ে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল।

অধীরতা

তাই-এর চিঠির আরম্ভটা এই রকম—"আমি এই চিঠি আমার নিজের বাড়ী থেকে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ীর থেকে লিখছি— প্রথম লাইনটা পড়বামাত্র আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে উঠলাম। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে 'তাই' শেষ পর্যন্ত তার শ্বশুরালয়ে কেন গেল। যে বাড়ীকে সে বলেছিল, শ্মশান, সেখানে ও গেল কেন? ঐ চিঠিটার, আর-কিছু না পড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এবং ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। আমার বিচারবুদ্ধি নিজের আয়ত্তে ছিল না। আমি এতই অধীর হয়ে উঠেছিলাম যে সেই মুহূর্তে কাগজ কলম নিয়ে তাইকে চিঠি লিখতে বসলাম।—

"তুমি খুব খারাপ কাজ করেছ। কমপক্ষে আমার কাছে জিজ্ঞাসাও তো করতে পারতে? তুমি যে এরকম করবে, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত তুমি যদি এই করবে ঠিক করেছিলে, তা হলে সমাজ-সংস্কারক হবার কী দরকার ছিল? দিদিমা, মামা, মামী ও রাওজীর ইচ্ছাকে পায়ে দলে, সমস্ত দুনিয়া-জুড়ে, কলঙ্কিনী, এই দুর্নাম সহ্য করবার কী দরকার ছিল? অনেক অবলা নারী যেমন নিজের বাসনাসক্ত স্বামীর কাছে জুতাপেটা খেয়েও সম্মানের সঙ্গে স্বামীর ঘর করে এবং স্বামী যদি কোনও খারাপ কাজ করতে বলে, বাধ্য পত্নী তাই করে এবং নীচ দুশ্চরিত্র লোকেদের সেবা করে, তুমি এই পন্থায় চললে না কেন?" —এরকম ভাবে তাকে চিঠি লিখলাম।

চিঠি ডাকে দেওয়ার পর আমার মেজাজ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে লাগল, মন শান্ত হল। তাই-এর যে চিঠিটা ফেলে দিয়েছিলাম, সেটা পড়বার ইচ্ছা হল। ভাবলাম, দেখিই না, 'তাই' কি ভাবে নিজের পক্ষ সমর্থন করেছে। তাই-এর পত্রে ছিল—"এই চিঠি পড়ে তুমি অত্যন্ত আশ্চর্য হবে, কিন্তু আশ্চর্য হোয়ো না, কারণ বিষয়টা এইরকম: আজ চার দিন হল এখানে এসেছি। ঘরে কেউ নেই। সুন্দরী একদিন আমার অনুরোধে এখানে এসেছিল। আমি ক্লাসে একটি

মেয়েকে কাপড়ের ওপর সূচের কাজ শেখাচ্ছিলাম, এমন সময় একজন চাকর দৌড়তে দৌড়তে আমার কাছে এসে বলতে লাগল— 'তাড়াতাড়ি চলুন, ঘরে কেউ নেই, বাড়ীর মালিকের ভীষণ অসুখ, অর্ধেক শরীর অসাড় হয়ে গেছে, সারা শরীর ভীষণ কাঁপছে!' এই শুনে ঘাবড়ে গিয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার শরীর কাঁপতে লাগল। এমন সময় দাদাজী ভিতরে এলে, তাঁকে আমি সব বললাম। তিনি একজন চাকরকে সঙ্গে করে সোজা সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। দাদা প্রথমে ভেবেছিলেন চাকরটা হয়তো বাড়িয়ে বলছে। কিন্তু না ভাউ, ওর কথা একেবারে সত্যি!

"দাদাজী যেমন ঘরের ভিতর পা দিয়েছেন, অমনি দেখতে পেলেন তার শরীরের অবস্থা। দাদা বাড়ীতে এসে আমাকে সব বললেন। এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে আমি সোজা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁর এই শরীরের অবস্থা দেখে অতীতের সব কথা ভুলে গেলাম। আমার শরীর কাঁপতে লাগল। তাঁর নিষ্প্রভ চোখ দুটোর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আমাকে কাছে পেয়ে তাঁর চেহারায় একটা স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। দাদাজী এসে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিলেন— আমি দিনরাত মাথার কাছে বসে। অপর কেউ ঘরের ভিতর আসছিল না। ঘরের একটা বাসনও অবশিষ্ট ছিল না, সব চুরি হয়ে গিয়েছে। যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, তারা এখনও আমার বদনাম রটাবার চেষ্টা করছে। বলছে, এখন এ বিষ খাওয়াবার জন্য এসেছে। এতদিন ওর বাড়ী আসা উচিত ছিল, হঠাৎ এখন এল কেন? কিন্তু আমি এ-সব কথায় একেবারেই কান দিচ্ছি না। তারা কী করে জানবে, আমি কেন গৃহত্যাগ করেছিলাম। লোকে যাই বলুক-না কেন, আমার সেবা-শুশ্রূষায় যদি এঁর প্রাণ বেঁচে যায়, তা হলে নিশ্চয়ই তা করব। কোন্ পরিস্থিতিতে কী করা কর্তব্য তার পুরো জ্ঞান আমার আছে। আমি তোমাকে শীগ্‌গীর এখানে আসতে বলতাম। কিন্তু তোমার পরীক্ষা সামনে বলে তোমাকে ডাকি নি। আশা করি তোমার পরীক্ষা হয়ে গেলে তুমি নিশ্চয়ই এখানে আসবে। আজ এখানেই আমার চিঠি শেষ করছি, কারণ

এখনই উঠে আমার স্বামীকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।" —এই-সব লিখে 'তাই', শেষে কাবুলী আঙুর পাঠাবার জন্য লিখেছিল। এই পত্র পড়ে আমার অত্যন্ত দুঃখ হল। আমি মূর্খতাবশত অধৈর্য হয়ে 'তাই'-কে যে চিঠি লিখেছিলাম, সেটা পড়ে তার মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল, এটা ভেবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। ওর দুঃখী মনের ওপর কিরকম আঘাত লেগেছিল কল্পনা করা যায় না।

'তাই'এর চিঠি

"ভাউ, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। দুঃখও পেয়েছি। আমি আমার চিঠিতে সমস্ত বিষয় লিখে জানিয়েছিলাম, তবু তোমার এই ভুল ধারণা হল কী করে? আমি ঘর ছেড়েছি, এর মানে এই নয় যে, আমার কর্তব্যজ্ঞান, দয়া মায়া সব ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যদি এইরকম ধারণা করে থাকো, তা হলে খুব ভুল করেছ। এখন ভাউ, যে পরিস্থিতি এসেছে সেটা ধর্মপত্নীর পরীক্ষার সময়।

এমনিতে এ পরীক্ষা দেব কার কাছে? আমার নিজের মনেরই এ পরীক্ষা। এটা আমার কর্তব্য, এই ভেবেই আমার সহজ প্রবৃত্তি আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। যতই আমার মনে স্বামীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব থাকুক, এই দারুণ সংকটময় পরিস্থিতিতে শেষ সময় পর্যন্ত আমাব কর্তব্য পালন করে যাওয়া উচিত।" এই ধরনের কথা 'তাই' বারবার লিখেছিল। আমার চিঠি ওর হৃদয়ে আঘাত দিয়েছিল। ও হয়তো ভেবেছিল, আমার কাছ থেকে আশ্বাস ও শুভেচ্ছা পাবে। কিন্তু হয়ে গেল ঠিক তাব উলটো। আমি ওর চিঠি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যিই পুরুষেরা কত ধৈর্যহীন আর নিষ্ঠুর হয়! নারী আবার ততখানিই ধৈর্যশীলা, উদার ও স্নেহময়ী হয়। তাই-এর স্বামী তাই-এর প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করেছে, যদি আমি হতাম, তা হলে সেই দুর্ব্যবহারের কথা মনে রেখে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু 'তাই' অত্যাচারের

কথা সব ভুলে গিয়ে উদার ক্ষমাশীল মনে কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে দুষ্ট পতির সেবা করার জন্য ছুটে এসেছে। তিন-চার দিন বাদে দাদা-জীর পত্র এল। তিনি লিখেছেন— "ভাউ, তোমার বোনটি সত্যি ধৈর্যশীলা, কর্তব্যনিষ্ঠ ও উদার স্বভাবের। এইরকম নারী, আর কোথাও দেখি নি। যদি এই নারী পাশ্চাত্ত্য দেশে জন্মাত তা হলে তার কীর্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। সে আমার পূজনীয়া। সত্যই সে অসামান্যা নারী! যে পতিগৃহের প্রতি তার ঘৃণা ছিল, স্বামীর এই অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে সে অবিলম্বে পত্নীর কর্তব্য পালন করতে সেখানে চলে গেল। স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে।" এই রকম চিঠি দাদাজীর কাছ থেকে পাচ্ছিলাম। দিনের পর দিন, তাই-এর স্বামীর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। চিঠি পড়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

সত্য ঘটনা

পরীক্ষার শেষ পেপার দিয়ে সেই রাত্রেই আমি তাই-এর বাড়ীতে পৌঁছলাম। তাই-এর শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার স্বামীর অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নি। ডাক্তার সকাল-সন্ধ্যা আসছিল। তাই-এর স্বামী অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে। ওষুধ খাওয়াবার জন্য জোর করে মুখ খুলতে হত। কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। তাই-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে ডাক্তারবাবু আমার কানে কানে বললেন, "যদি ইনি এই রকম সেবা না করতেন, তা হলে একদিনের মধ্যেই ওঁর মৃত্যু হত। এতদিন, আমার ওষুধে নয়, এঁর সেবা-শুশ্রূষাতেই বেঁচে আছেন।"

এই রকম ভাবে পনেরো-বিশ দিন কেটে গেল। যা ভেবেছিলাম, গংগুতাই শেষ পর্যন্ত অসুখে পড়ে গেল। তবু নিজের অসুস্থতা ভুলে কর্তব্য পালনের জন্য পতিসেবা করতে আসত। তাই-এর শরীর

একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবু বিছানায় শুয়ে শুয়েই তার স্বামীর ওষুধপত্রের ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করত। তাই-এর স্বামীর শরীরের অবস্থা দেখে মনে হল, তার আর বাঁচবার আশা নেই। ডাক্তারবাবুর অভিমতও তাই। সেইজন্যে তাই-এর স্বামীর যদি শীঘ্র দেহান্ত হয়ে যায়, তখন অন্ততঃ তাই-এর শরীরের দিকে ভালো ভাবে নজর দেওয়া যায় এই বিচার করে ভাবছিলাম, তাই-এর স্বামীর যত তাড়াতাড়ি মৃত্যুই হয় ততই ভালো।

কয়েকদিন পর্যন্ত এই ভাবেই চলল। 'তাই' নিজের শরীরের জন্য ঠিকমতো ওষুধও খেত না। তার স্বামীর অবস্থারও কোনও উন্নতি দেখা গেল না। ফলে আমার পরিস্থিতি খুবই বিচিত্র হয়ে দাঁড়াল। এইরকম করে আরও দেড় মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার পরীক্ষার ফল বেরোলে জানতে পারলাম, আমি খুব ভালো ভাবে পাস করেছি। তাই-এর শরীর দিনের পর দিন অবনতির দিকে যেতে লাগল। তার শরীরে যক্ষা রোগের চিহ্নগুলি দেখা দিল। কিছুদিন পরে একদিন সুর্যাস্তের সময় তাই-এর স্বামী মারা গেলেন। 'তাই', এতে ভীষণ শোকাহত হয়ে পড়ল।

আমি এই ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছিলাম যে, এই ঘটনার ফলে তাই-এর সাংঘাতিক কিছু না হয়ে বসে। ঈশ্বরেচ্ছায় সে রকম কিছু হল না। ধীরে ধীরে 'তাই' আপনার মনকে শক্ত করে ফেলল, এবং দিনে দিনে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা যেতে লাগল। এতে সুন্দরীর এবং সুন্দরীর পিতা-মাতার, সকলেরই খুব আনন্দ হল। গংগুতাই আর সুন্দরীর যে দুইজন ছাত্রী ছিল, তারাও তাইকে অনেক করে বোঝাল। আমার কথার চেয়ে, তার ঐ দু'জন শিষ্যার কথা তাইএর মনে অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজকাল 'তাই', খুব কম কথাবার্তা বলে, প্রায়ই উদাস বিষণ্ণ মনে বসে থাকে, যেন মনে হয় সে গভীর ভাবে কোনও চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে।

এই ভাবে সংকটের যে ভয়ংকর কালো মেঘ তাই-এর জীবনে ঘনিয়ে আসছিল, তা কেটে গেল। এখন আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী জনসেবার ব্রতপালনে আর কোনো বাধা রইল না। কেবল

তাই-এর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য কিছুদিন তা স্থগিত ছিল। তাই-এর স্বাস্থ্য ঠিক হয়েই যেত এতদিনে। কিন্তু কিছু অন্তরায় ঘটল। তার স্বামী কিছু ঋণ করে গিয়েছিলেন, সেই সুবাদে মহাজনেরা তাগাদা দিতে বার বার বাড়ীতে আসতে লাগল। আমি তার শ্যালক. সেই সুবাদে আমাকেই এসে সব ধরল। ঋণের পরিমাণ আন্দাজ করার জন্য একটা ফিরিস্তি করে ফেললাম। দেখলাম ঋণের পরিমাণ অনেক। যা-কিছু অস্থাবর সম্পত্তি উদ্বৃত্ত ছিল সব বেচে দিতে হল। শেষ পর্যন্ত বাড়ী বিক্রি করার প্রস্তাব এল। তাই-এর অংশে এক কপর্দকও রইল না। তার ঐ পাজী স্বামীটার মৃত্যুর পর তার কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয় সম্পত্তির ওপর অধিকার দাবি করতে এসেছিল। এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা এইটুকু যে এক বৎসরের মধ্যে তাই-এর দুঃখের অবসান হল। তার বাড়ীটা বেচে ফেলবার যে প্রস্তাব হয়েছিল, সেটা রদ হল। বাড়ী তাই-এর দখলেই রইল, এবং যা-কিছু দান-সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি তার স্বামীর নামে ছিল, তা তাইএর নামে হল। আর বাকি সব কিছু বন্ধক রেখে ঋণ শোধ করতে হয়েছিল।

জন-প্রবাদ

একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ী! বাইরে সাইন বোর্ডের ওপর একজনের নাম লেখা আছে. তার নিচে লেখা আছে, বি. এ., এল্. এল. বি., উকীল, হাইকোর্ট, বম্বে। বাড়ীতে পাঁচজন লোক থাকে। আপাতত তার মধ্যে তিন জনের সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছি। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন তরুণ, একজন তার চেয়ে বয়সে বড়ো এক তরুণী স্ত্রীলোক, আর একজন বৃদ্ধা। এই তিনজনের মধ্যে এক বিচিত্র সংলাপ চলছিল। তাদের চেহারার মধ্যে বিসম্বাদের রুক্ষ মূর্তি ফুটে উঠে, ক্রোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। পুরুষটি মেজাজ চড়িয়ে কথা বলছিল। তরুণী স্ত্রীলোকটির চেহারায় ছিল এক বিচিত্র ভাব। আর বৃদ্ধার চেহারায় আহত সন্তাপের ছাপ।

বৃদ্ধা তরুণ পুরুষটিকে চোখ পাকিয়ে বলছিলেন—"ভাউ, এ তুমি ভালো কাজ করো নি। তুমি আজ এত বড়ো হয়ে গেছ, তোমার কল্যাণে আজ আমরা সুদিনের মুখ দেখেছি, আর এই সৌভাগ্যের দিনে, এ তুমি কী করছ?…

"তোমার এই জেদী খামখেয়ালী স্বভাব ঠিক নয়। আজ যদি তোমার মা থাকত, তা হলে তোমার এই সুদিন দেখে কত খুশি হতেন! ভালোই হয়েছে, সে আজ নেই। তোমার এই খাম-খেয়ালীপনা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। ভগবান কেন যে আমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখলেন! তোমার এই-সব জঘন্য কার্য-কলাপ দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকলাম। তোমার বাবা তোমার মাকে আজীবন কষ্ট দিয়ে গেছেন। আজ তুমি আমার মুখে কলঙ্ক লেপে দিলে। আমি বাইরে আর মুখ দেখাতে পারি না। তুমি কেন এত হতচ্ছাড়া আর নিষ্ঠুর হয়ে গেলে, বলো তো?"

"দিদু!…দিদু, আমি কী এমন করেছি? কোনো চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি? না কাউকে খুন করে ফাঁসীর আসামী হয়েছি? তোমার মুখে চুনকালি দেবার মতো কী এমন কাজ— কী এমন মহাপাপ করেছি— যে তুমি মান ইজ্জত সব খোয়াতে বসেছ?"

"সে-সব করলেও ভালো ছিল। লোকে বলে হতভাগার কপাল-টাই এ রকম। কিন্তু আজ তুমি একজন বিখ্যাত লোক হয়েছে, সেই কারণে তোমার লোকলজ্জাকে ভয় করা উচিত। আজ পর্যন্তও আমি চুপ করে ছিলাম, কিন্তু আর পারলাম না। আমি এসেছি তোমার এই স্বভাব ঠিক পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য।"

"ভালোই হয়েছে, তুমি এসেছ। অন্তত স্বচক্ষে দেখতে পাবে আমার স্বভাব-চরিত্র কত ভালো। আমি আমার মর্যাদা কখনও হারাই নি।"

"আমার জানা আছে তুমি কত সৎভাবে থাকো! কিন্তু লোকে-দের মুখের আগল তো খুলে গেছে— সবাই বলছে, তোমার স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে।"

আমি দিদিমাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তাঁর ভুল

ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই-এর ওপর দিয়ে যখন মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ঘটে গেল আমার বিশ্বাস ছিল দিদিমা হয়তো আসবেন। কিন্তু তিনি আসেন নি। বোধ হয় মামাই দিদিমাকে আসতে দেন নি। তাই-এর স্বামী মারা যাবার পর, তার সম্বন্ধে খুব খারাপ কথা সব রটানো হত। তবেই তো দিদিমা, মামা ও মামীর আপত্তি সত্ত্বেও জিদ করে এখানে চলে এসেছেন। যেদিন দিদিমা এলেন সেদিন তিনি কোনও অন্ন গ্রহণ করলেন না। উপরের ঘরে গিয়ে তিনি আমাদের দুজনকে গালাগালি দিয়ে কান গরম করলেন। দিদুর কত চেঁচামেচি, কত কান্নাকাটি, কিন্তু আমরা বুঝতেই পারলাম না আমরা কী এমন মহাপাতক কাজ করেছি। রেলগাড়ীতে আসার ফলে তিনি খুব ক্লান্তও হয়েছিলেন। আমরা এতবার বললাম—স্নান করে, খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন, তারপর কথাবার্তা হবে। কিন্তু না— তিনি কোনো কথাই শুনলেন না। বার বার বলতে লাগলেন—"তুমি যদি এই রকম খারাপ পথে চলো, তা হলে এইখানে বসেই আমি মাথা কুটে মরব।"

শেষে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আজ পর্যন্ত আমি কাউকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভোলাবার চেষ্টা করি নি। আমি বললাম, "তোমার যা বলবার আছে সরাসরি বলে দাও। এই রকম উতলা হয়ে পড়লে কোনও লাভ হবে না।"

বুড়ো লোকেরা জেদ ধরলে যে কি রকম হয়, আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল। মনে পড়ল আমার এক বন্ধুর কথা, তার সমাজ-সংস্কারের কাজ, মা আর দিদিমার জেদেই বন্ধ করতে হয়। তখন সে কথা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু আজ সে বিশ্বাস হল।

তিনি বললেন, "কী? বলো— এখন চুপ করে আছ কেন? নিজের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বলতে লজ্জা পাচ্ছ? ওই নির্লজ্জ তাই-টাও মহা পাজী! ওর জন্যেই যত কলঙ্ক রটেছে।" এই বলে তাই-কে গাল পাড়তে শুরু করলেন। আমার শুনে খুব রাগ হল। 'তাই', চুপচাপ সব শান্ত হয়ে সহ্য করছিল। আমি ক্রোধের আবেশে বললাম—"দিদিমা, তুমি একদম চুপ করো। তাই-কে

এরকম গালাগালি দেবার কোনও প্রয়োজন নেই তোমার। যা-কিছু দোষ হয়েছে, তা আমারই হয়েছে। তোমরা রটনায় বিশ্বাস করো। ঠিক আছে, বাইরের লোকেদের কথাই শুনে যাও এবং যা করবার করো···"

"হাঁ, করবই তো। আমি ঐ নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েটাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

তাই, রেগে উঠে বলল, "দিদু, তুমি যত ইচ্ছা গালাগালি দাও, কিন্তু একবার—এবং এই শেষ বার, তোমাকে বলছি, তুমি যে লোকের রটনার ওপর আস্থা স্থাপন করেছ, সে সমস্ত ভুল। বোধ হয় আমার কাজকর্ম দেখে ভেবেছ আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করব। কিন্তু বিশ্বাস করো, এ রকম কখনোই হবে না। আমি আমার সমস্ত জীবন সৎকার্যে ও পরোপকারে নিয়োজিত করব। সে পরোপকার কেবল কতকগুলি ব্রত পালন ও ব্রাহ্মণ ভোজন করানো নয়। তুমি যদি বলো—এ রকম করো, ওরকম করো, এইভাবে চলো, ঐভাবে চলো, তা হলে এ-সব কাজ আমার দ্বারা হবে না। ঐ ধরনের কর্মপ্রয়াসে নিজের জীবনকে নষ্ট করতে পারব না। আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই যাব না, এটা মনে রেখো। আমি পুণাতেই থাকব। পুণার লোকেরা খুব নিন্দুক এবং নানা উৎপাত সৃষ্টি করতে ও সৎকার্যে বিঘ্ন ঘটানোতে অভ্যস্ত। তাই আমি এইখানেই, এদের মধ্যে থেকেই কাজ করতে চাই।"

দিদিমার যত রাগ তাই-এর ওপরে। 'তাই' চুল ছেঁটে ফেলেছিল দেখে তাঁর ক্ষোভ আরও বেড়ে গিয়েছিল। ওর চুলের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "দেখো দেখি, মাথার চুলের কী ছিরি করেছ? যেন মাথার ওপর চুপড়ি বসিয়েছে! এখন তো এই নির্লজ্জটা···"

দিদুর এই-সব বিষোদ্‌গার শুনে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আমি তাঁকে খাওয়াবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলাম, কিন্তু তিনি কেবল ফলাহার করলেন এবং বারবার তাইকে কথা শোনাতে লাগলেন। তাই-কে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বার বার বলতে লাগলেন। "আমি এখনই যাচ্ছি— আজই যাচ্ছি", বলতে বলতে

দু'দিন থেকে গেলেন। আর ঐ দুই দিন ধরে শিবরাম পন্থকে খুব গালাগালি দিলেন। তাই আর সুন্দরীর হাতে জল পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। দুই দিন উপবাস করবার পর তিনি বুঝলেন যে তাই-কে সঙ্গে নিয়ে যাবার মহৎ কীর্তি অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে খুব গালাগালি দিয়ে তৃতীয় দিনে খুব রাগারাগি করে চলে গেলেন।

নূতন কাজের সূত্রপাত

অভিজ্ঞতার দ্বারা আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় হল যে অর্ধশিক্ষিত লোকেদের দ্বারা, এক বাধার সৃষ্টি ছাড়া আর কোনো সাহায্য বা কার্যসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য যে লোকেরা একেবারে অশিক্ষিত তাদের নিয়েই কাজ শুরু করা উচিত। এই ধরনের কাজে লেখনের চেয়ে ভাষণের উপযোগিতা বেশি। লেখা যতই সুন্দর হোক, পড়বার লোক কই? সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তাই বা কে করবে? এইজন্য ঠিক করেছিলাম সপ্তাহে দু-এক দিন সময় ও সুযোগ বুঝে, ব্যাখ্যানের দ্বারা শ্রোতাদের মন সুসংস্কৃত করি, তাদের মনে কোনও বিরাট কল্পনার ছবি এঁকে দিই এবং ধীরে ধীরে এই-সব ভাষণের ওপর তাদের মনে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হোক। এই রকম কোনো উপায়েই সমাজ-সংস্কার সম্ভব। এইজন্য বিদ্যার্থীদের ওপর নজর দিলাম।

ছাত্রদের মনে সহজেই সংস্কারের ছাপ পড়ে। যখন আমি দুশো-চারশো ছাত্রদের শিক্ষা দিই, তার মধ্যে এক-আধটা ছাত্রই বুদ্ধিমান বেরোয়, এ আমার জানা ছিল। তাই ঠিক করলাম যে, একটা খুব বড়ো ঘর নিয়ে নিজের কাজ শুরু করি। কাগজে আমি বিজ্ঞাপন দিতে চাই নি, কারণ বিজ্ঞাপন দেখে অনেক লোক ভিড় করে আসবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজনও টিঁকবে না। শুভারম্ভ অল্প লোক দিয়েই হোক, ক্রমে শেষের দিকে এই কর্ম ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে।

এই মনে করে আমি স্কুলের কিছু শিক্ষক এবং কলেজের কয়েকটি ছাত্রকে আলাদা ভাবে বাইরে জানাজানি না করে, ডেকে জড়ো করলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক মহত্ত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে কাহিনীর রূপ দিয়ে ব্যাখ্যান করলাম। অন্যবার, ইংলণ্ডের ইতিহাস থেকে ঐরূপ কথকতা সাজালাম। এই দুই দেশের ইতিহাসের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্যের প্রসঙ্গ তুললাম, তুলে বললাম, নিজের অধিকার ও দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে ওদের দেশ কত অগ্রসর, কত জাগ্রত! আর এ বিষয়ে আমাদের কতটা অনগ্রসর, আমরা কতটা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতায় ডুবে আছি— এই-সব বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তৃতীয়বার, আমি ফ্রান্সের ইতিহাসের উদাহরণ দিলাম। ক্রমশ আমার এই ব্যাখ্যানগুলির শ্রোতা বেড়ে যেতে লাগল। কখনও কখনও আমি দাদাজীকে নিয়ে যেতাম, তিনিও কিছু কিছু উপদেশ দিতেন। প্রথমে, আমি যখন ভাষণ দিতাম তখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ঠিক করা হত না, উদ্দেশ্য কেবল এই ছিল যে, কোনোপ্রকারে আমার এই ব্যাখ্যান শোনবার জন্য কিছু লোক একত্রিত হোক। তখন কোনো কোনো দিন আমার ব্যাখ্যানের ভিতর দেশাত্মবোধক কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করতাম। উদাহরণ স্বরূপ বলতাম, সিংহগড় অধিকার করবার পর শিবাজীর, তানাজীর দেশভক্তির সাধনার কথা— তা কত উচ্চশ্রেণীর ও গভীর ছিল, তার ব্যাখ্যা করতাম। কখনও বা অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতাম। কুটির শিল্প, গ্রামোদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগহীন হলে, দেশের লোককে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ না করলে দেশের কত ক্ষতি হয়। এই সুযোগে অন্য দেশ আমাদেরই অজ্ঞতা এবং জড়তার জন্য প্রচুর টাকা লুটে আমীর বনে। সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে কতখানি, এ-ও আলোচনা করতাম। কখনও বা আমার বিষয়-বস্তু হত, রামায়ণ, মহাভারত, বা উপনিষদের কথা। এই-সব মহান গ্রন্থ থেকে কী কী অমূল্য তত্ত্বসকল আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, সে-বিষয়ে আলোচনা করতাম। আমার শ্রোতৃবর্গ আমার এই আলোচনা, ব্যাখ্যানাদি খুব নিবিষ্ট হয়ে শুনত। তারা নানা

বিষয়ে প্রশ্নও করত। আমার সব সময় এই প্রচেষ্টা ছিল, যেন শ্রোতাদের মনে নীতিবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগে। কখনও যেন আমার শ্রোতারা আমার কোনও ব্যাখ্যা বা আলোচনা শুনে বিরূপ না হয়, এইজন্য কোনো বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজী নভেল থেকে কাহিনী পড়ে শোনাতাম। আমার কোনও মন্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ এই-রকম ভাবে আমি ভাষণ ও ব্যাখ্যানের দ্বারা দেশপ্রেমের ভাবনা জাগাবার প্রয়াসী হলাম। আমার এই কার্য নির্বিঘ্নেই চলতে লাগল। আমার মনে আত্মবিশ্বাস এল। মনে হল এই-রকম ভাবে আমি আমার কাজে আরও অগ্রসর হতে থাকব।

নব-চেতনা

আমার ব্যাখ্যান ভাষণ ইত্যাদির কাজ চলতে লাগল। ব্যাখ্যানের জন্য আমাকে বেশ পরিশ্রম করতে হত। শ্রোতার দলও দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখতাম যে, এদের ভিতর কারোর দেশভক্ত হবার সম্ভাবনা আছে কি না। দু-একজন তরুণ ছাত্র এমন পাওয়া গেল, যারা আমার সমস্ত ব্যাখ্যান খুব একাগ্র হয়ে শুনত। ঐ দু'জন ছাত্র আমাকে খুব ভক্তি করত। কখনও কখনও আমার নিন্দুকের দলকে তারা আমার পক্ষ নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করত। এতে আমার কর্মে উৎসাহ খুব বেড়ে যেত। তখন আমার মনে এই বিচার এল যে, শুধু ব্যাখ্যানের দ্বারা কিছু হবে না। এর সঙ্গে বেশ ভালোরকম বিধিবদ্ধ লেখার কাজ হওয়া উচিত। মাথায় এল, একটা 'ন্যাশনাল প্রেস' স্থাপন করা যাক। কিন্তু আমার মতো স্বল্প-বুদ্ধি, স্বল্প-শক্তি ও স্বল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা এ কাজ হবার নয়। অথচ ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাব এই যে, যে কথা একবার মনে স্থান নেয়, তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পরিত্রাণ নেই। আমার এই পরিকল্পনা দাদাজীকে বললাম। তাঁর মনেও এই একই চিন্তা। আমার কাছে যে-সব শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা

আসতেন, তাঁদেরও এই 'প্রেস'-এর কথা বললাম। তাঁদের কাছে অবশ্য কোনও সাহায্য চাওয়া হয় নি। তবে, এমনই যোগাযোগ হল, যে আমার এই পরিকল্পনা সফলকাম হবার দিন এসে গেল।

আমার রোজনামচা এরকম ছিল : রোজ রাত্রে শোবার আগে দেড় ঘণ্টা কিছু-না-কিছু পড়তাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ উচ্চৈঃস্বরে পড়ত আর অন্যরা সব বসে বসে শুনত। খুড়ি-মা, অর্থাৎ —সুন্দরীর মা, ইদানীং, শরীর ভালো না থাকায় আমাদের পাঠচক্রে এসে বসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সারাদিন কে কী কাজ করল, কার কিরকম অভিজ্ঞতা হল—এই-সব আলোচনা হত। কখনো কখনো নূতন কোনো ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনা হত। একটা পত্রিকা চালানোর পরিকল্পনা আমরা রোজই করতাম। যদি পত্রিকা চালাতে হয়, তা হলে কী কী ধরনের লেখা থাকা উচিত? —এর উপর আমাদের বিতর্ক চলত।

এই রকম সব আলোচনা চলতে চলতে তাই-এর হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে বলে উঠল—"আরে-আমি একদম ভুলেই গিয়েছি, তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে, তাড়াতাড়িতে আমি সিন্দুকের ভেতর তুলে রেখেছি।" এই বলে অবিলম্বে চিঠিটা নিয়ে এল। চিঠিতে শুধু এই কথা লেখা—"আমি আপনার সঙ্গে একবার একান্তে দেখা করতে চাই।" যিনি এই চিঠি লিখেছেন তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হল। শেষে, আমার সঙ্গে দেখা করার সময় জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলাম। তিনি পরের দিনই এসে হাজির হলেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হবার পর তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁর একটা প্রেস চালাবার ইচ্ছা আছে, এবং এর সঙ্গে একটা পত্রিকাও শুরু করতে চান। আপনি এই বিষয়ে তাঁকে কি কোনো সাহায্য করতে পারবেন?"

এই প্রশ্ন শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অনেকদিন থেকে যে জিনিসটার অপেক্ষায় ছিলাম তা দৈবযোগে হঠাৎ আমার কাছে এসে গেল দেখে আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হলাম। কিছুক্ষণ স্তব্ধ

হয়ে থেকে, তাঁকে বললাম—"আমার তরফ থেকে কী ধরনের সাহায্য চান ?"

"তাঁর কোনও অর্থ সাহায্যের দরকার নেই, তিনি নিজেই অর্থবান। তিনি একটি নূতন মুদ্রণ-যন্ত্র কিনে, একটি পত্রিকা চালাতে চান। সেইজন্য তিনি চান, এই পত্রিকা চালানোর ভার আপনিই নিন। আপনাকে আমি চিনি। আপনার নাম আমি তাঁকে বলেছিলাম, এবং তাঁকেও আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আমার ইচ্ছা আপনি এই কাজের ভার নিজের হাতে নিন।" এই কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হল। সেই ভদ্রলোকটি বলতে লাগলেন—"তিনি আপনার সমস্ত ব্যাখ্যান শুনেছেন। এইজন্য তাঁরও ইচ্ছা এই যে, এ কাজটা আপনিই হাতে নিন। আমারও তাই নিবেদন আপনার কাছে।"

বস্তুত আমার কাছে এ বিষয়ে অনুরোধ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম এইজন্য যে, আমি যে রকম পরিকল্পনা করেছিলাম, ঠিক সেই অনুযায়ী পত্রিকা বের করতে পারব কি না। সেইজন্য বললাম—"আমারও অনেকদিন থেকে এই রকম একটা পত্রিকা বের করবার বাসনা ছিল। আমি কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে এই প্রেস ও পত্রিকা চালানোর ইচ্ছা কি কেবল পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে ? আমার ইচ্ছা, এই কাজে যদি দু-পয়সা পাওয়া যায় তা হলে ভালো, এবং না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। শুধু পয়সা রোজগারই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য দেশের জন্য যে-সব চিন্তাধারার প্রয়োজন, সে-সব এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করে কাগজটাকে লোকপ্রিয় করে তোলা।"

"ব্যস্, এইটুকুই আপনার শর্ত তো ? আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। আপনার কর্তৃত্বাধীনেই এই পত্রিকার সমস্ত কাজকর্ম চলবে। লেখা নির্বাচনের ভারও আপনার ওপর রইল। আমি কেবল এইটুকুই চাই যে কাগজ চালাতে গিয়ে লাভ না হোক, লোকসান যেন না হয়।"

"এটা নিশ্চিত রূপে কি করে বলা যায় ? আমার নূতন চিন্তাধারা অনেকের ভালো লাগবে, কেউ হয়তো পড়ে চটে যাবে।

আমার সমস্ত বিচার, ভাবনা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য নিয়োজিত হবে। আমি চাই না, দোষকে ঢেকে রেখে, ইংরেজদের কেবল গুণগানই করি। স্তুতিতে সরকার অবশ্য খুশি হয়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তা নয়। আমরা আমাদের নূতন চিন্তাধারা লোকেদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছি, তার উপযুক্ত প্রয়োগ আমাদের দেশের জন্যই হওয়া উচিত, তাদের দেশের জন্য নয়। যদি আমার এই চিন্তাধারা আপনার মনঃপূত হয়, তা হলেই আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমার কাছে, আমার বাড়ীতে চারজন লেখক আছেন। তাঁরা লেখার জন্য এক পয়সাও পারিশ্রমিক নেবেন না। আমি আমার দিক থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। আপনি এখন ভেবে দেখুন।"

আমার বক্তব্য ঐ ভদ্রলোক খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। নবপরিচিত ভদ্রলোককে নীরব ও চিন্তান্বিত দেখে, আমার পূর্ব-পরিচিত ভদ্রলোকটি বললেন, "ঠিক আছে, আমি পরে সমস্ত বিষয় বিচার করে আমরা কী ঠিক করলাম, জানিয়ে দেব।" এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। এমন সময় ঐ নবাগত ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন—"না, না, এখন আর ভেবে দেখবার কি আছে? ব্যস্, পাকা হয়ে গেল সব কথা— আমি কথা দিচ্ছি। আপনি আপনার পরিচিতি-পত্র ইত্যাদি সব লিখে কালকে আমার কাছে দেবেন। এই সিদ্ধান্তের আর কোনো রদ-বদল হবে না। পত্রিকার নাম কী দেবেন ঠিক করেছেন?"

"নাম? নাম সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু ভেবে রাখি নি। তবু হঠাৎ একটা নাম মাথায় এসে গেল— নাম দিন 'নবচেতনা'।" শেষ পর্যন্ত পত্রিকার ঐ নামই রয়ে গেল।

আমার জীবনের এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা শুরু হল। পত্রিকা চালাতে গিয়ে বহু লেখা নিজের নামে দিতে লাগলাম। প্রথমে উকিল হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলাম, এখন 'নবচেতনা'র দৌলতে সর্বজনপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠলাম। সনাতন পন্থার লোকেরা আমার নিন্দা করতে লাগলেন। তারা, আমার বোন, ভাই, আমার মা আর সুন্দরীর সম্বন্ধে নোংরা কথা অন্য কাগজে রটাতে লাগল। আমাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হতেই উদাহরণ স্বরূপ তারা ছাপালো—

"আমাদের এক চতুর ভাই জন্মগ্রহণ করেছে। সে নিজের ফষ্টি-নষ্টি, নষ্টামির জন্য মোটেই লজ্জিত নয়। নিজের নামটাও রেখেছে 'চতুর' অর্থবাচক। এই কাগজের সম্পাদনা একজন নতুন ডানা গজানো উড়ুক্কু যুবকের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাম চারেক বই পড়ে উনি পাণ্ডিত্য ফলান। পেনাল কোডের দু-চারটা লাইনও এঁর পড়া আছে। এই হচ্ছে এঁর নব চেতনা। এই ব্যক্তিটির পটভূমিকা ধূর্তামি আর বদমাইসিতে ভরা। এর মাতৃদেবী শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মায়ের কাছেই কাটিয়ে গেছেন। মামার সাহায্যে এঁর বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল। তবু তাঁর মামার আজ্ঞা পালন না করে, তাঁকে অপমান করে, অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন দিয়েছেন। কিছুদিন হল, এই চতুর-চূড়ামণি কতকগুলি ছাত্রদের একত্র ক'রে একটা ক্লাবের স্থাপনা করেছেন। সেখানে এঁর বক্তৃতা-বাজি চলে। এই হচ্ছে এঁর নবচেতনা! যে লোক নিজের মেয়েকে অবিবাহিতা রেখে মিশনারীদের স্কুলে পাঠিয়ে মেম-সাহেব বানিয়েছেন, তিনিই এঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আর একজন সাহায্যকারিণী আছেন, তিনি ঐ মেয়েটি, যার বর্ণনা এখনই আমরা দিলাম। তৃতীয় সাহায্য-কারিণী, এ 'নব-চেতনা'-বিদ-এর ভগ্নী। এই নির্লজ্জ উদ্ধত স্ত্রী-লোকটির পরিচয় পাঠকের আগেই দিয়েছি। এই হচ্ছে চালিয়াৎ নব-চেতনা-ওয়ালাদের চিত্র। ক্রমশ আমাদের এই চতুর ভ্রাতাটি কী খেলা দেখাবেন তা আপনারা অনুমান করতে পারছেন।"

এইভাবে সকলে আমার নূতন পত্রিকাটিকে স্বাগত জানাল।

একদিন আমি এক সুন্দর কাহিনী ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলাম। আমার শ্রোতৃবর্গ নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধুর পাশে বসে থাকা একটি লোক জিজ্ঞাসা করল—"ভাষণ যিনি দিচ্ছেন তিনি কে? বোধ হচ্ছে কোনো সমাজ-সংস্কারক হবেন··· কিন্তু···"

"না, না, ইনি সমাজ-সংস্কারক নন। আমি আজ কয়েকমাস থেকে এঁর ভাষণ শুনছি, কিন্তু ইনি কখনও স্ত্রী-শিক্ষা বা বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোনো প্রচার করেন নি। এ রকম হলে আমি কখনো এঁর ভাষণ শুনতাম না। বরঞ্চ এঁর ব্যাখ্যানে সর্বদা কোনো নূতন চিন্তাধারা বা উপন্যাস সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান থাকত। কখনও বা কোন ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতেন।"

"আরে! তা হলে তো এ এক লোচ্চা মিশনারী। যখন দেখবে যে আপনারা তার ব্যাখ্যান শুনে আকৃষ্ট হচ্ছেন, তখন এই ধূর্ত সংস্কারকটি আপনাদের, তার নিজের ভাবধারার দিকে টেনে নেবে। আমি শুনেছি, ইনি একজন নিষ্কর্মা সমাজ-সংস্কারক। এঁর কার্যের নিন্দাবাদ হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিবেশী বিনায়ক রাওএর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন। বিনায়ক রাও প্রথম থেকেই একে চেনে। সে একদিন এসে এর কেচ্ছা গাইবে। দেখবেন তখন কী মজা হয়!"

এই-সব কটূ সম্ভাষণের দরুন আমি সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু মিথ্যা বদনামের ভয়ে নয়। সাবধান হওয়া দরকার আমার আরব্ধ কর্মের জন্য। এ শুভ কর্ম যেন নির্বিঘ্নে চলে, কোনো বাধার সম্মুখীন না হতে হয়। আমার ব্যাখ্যানে যে তত্ত্ব প্রচার করা হত, তার ভাষা ও শব্দচয়নও অত্যন্ত সাবধানে করতে হত। একদিন আমার ব্যাখ্যান শুনতে আমার বাড়ীর সকলে এসেছিলেন, তার মধ্যে দেখলাম কতকগুলি লোকও এসেছে আমার কুৎসা রটানোর উদ্দেশ্যে। তার পরের সপ্তাহে আমার ব্যাখ্যান শুনতে প্রচুর শ্রোতাদের ভিড় হয়েছিল। তার ভিতর দেখলাম এক ছাপানো বিজ্ঞপ্তি হাতে হাতে

বেঁটে দেওয়া হচ্ছে, যার ভিতর আমার সম্বন্ধে অনেক কুৎসা ছাপানো হয়েছে! তার ভিতর ভয়ংকর ভয়ংকর সব কথা লেখা ছিল আমার সম্বন্ধে। সৌভাগ্যবশত আমার বাড়ীর সকলে সেদিন আমার ব্যাখ্যান শুনতে আসে নি। ওর ভেতর থেকে এক বদমাইস লোক দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"কাগজে এই-সব যা ছাপানো হয়েছে তা কি সত্যি ?" যারা বসে ছিল তারা হাততালি দিতে শুরু করল। সেদিন যা-সব ঘটল সব অপ্রত্যাশিত এবং হঠাৎই ঘটল। আমার ব্যাখ্যানের মধ্যে এ রকম ব্যাঘাত আর কখনোই ঘটে নি। এর আগের দিন আমার ভাষণের সময় 'তাই', আর সুন্দরী এসেছিল। সেইজন্য ঐ বদমাইস লোকেরা আশা করেছিল, বোধহয়, আজও তারা আসবে। এলে খুব হৈচৈ-হাঙ্গামা করবে। কিন্তু তারা না আসায়, ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্যরকম। ওদের এই হৈচৈ, আর অভব্য কথা-বার্তা সহ্য করা যাচ্ছিল না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। এমন সময় কে যেন বলে উঠল—"আরে, কেউ ওর বইটা কেড়ে নে না!" কেউ বলতে লাগল "আরে, তোর বউ যদি ঘরে থাকতে না চায়, তা হলে এর কাছে পাঠিয়ে দে —ও খুব যত্ন ও পীরিত দিয়ে নিজের কাছে রাখবে।" এই কথা শুনে আমি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হলাম। আমি আমার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে গেলাম। আমি কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। কেউ আবার বলতে লাগল—"আরে একেবারে চুপ করে গেলে যে ? দাও, দাও-না তোমার ব্যাখ্যান।" এই রকম সব বকেই যেতে লাগল, চুপ করার কোনও লক্ষণ দেখতে গেলাম না। ভাবছিলাম কী করা যায় ? একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমি খুব ধৈর্যাবলম্বন করে হাতে একটা লাঠি নিয়ে বাইরে যাবার জন্য দরজার কাছে এলাম। দরজার কাছে আসা পর্যন্ত যদি ধৈর্য না ধরতাম, তা হলে আমার কী অবস্থা হত আমি জানতাম। আর, এ-এও জানতাম, এই ধরনের খারাপ কাজ যারা করে তারা আসলে খুব ভীতু হয়। এই-জন্য, যদি আমি ধৈর্য অবলম্বন করি, তা হলেই এখান থেকে বাইরে চলে আসতে পারব। এই ঠিক করে আমি বাইরে চলে এলাম।

অবশ্য একটু আধটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল, মাথার পাগড়ীটাও পড়ে গিয়েছিল। তবু, এদের কাছ থেকে পরিত্রাণ তো পেলাম!

এটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল। আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে গেলাম। এই ধরনের ব্যাপার আমি ইংরেজী গ্রন্থে পড়েছি। কিন্তু কাহিনী আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে কত তফাত! আমি এই-সব লোকদের হাতে নিগৃহীত হতে লাগলাম। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করলাম। লোকেরা কিরকম অপমান করেছে, সেই নিয়ে আলোচনা চলছিল। এমন সময় সুন্দরী বলল, "এ ঘটনা পুনরায় ঘটার চেয়ে আমরা ব্যাখ্যান, ভাষণ ইত্যাদি সব বন্ধ করে দিই। কারণ, এ পর্যন্ত ব্যাখ্যানের দ্বারা কোনো উপকার পাওয়া যায় নি। অন্যথায়, পুনরায় ওদের গণ্ডগোল সৃষ্টি করার সুযোগ মিলে যাবে এবং তার ফলে কোনো গুরুতর দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।" গংগুতাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে বলল—"কী বললে? ব্যাখ্যান বন্ধ করবে? আমরা কিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করব। এই-সব বদমাইস লোকেরা যাতে না আসতে পারে। কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া, একেবারেই আমার মনঃপূত নয়! কি ভাউ, সত্যিসত্যিই তুমি তোমার ব্যাখ্যান-ভাষণ সব বন্ধ করে দেবে না কি?"

আমি অত্যন্ত স্নেহাপ্লুত দৃষ্টিতে তাইএর দিকে তাকালাম। আমি মনে মনে বললাম— ছেলেবেলায় এই মেয়েটি কি রকম ভীরু ছিল! মা'র সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ছিল না। সবসময় দিদিমার আঁচল ধরে তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াত; একি সেই গংগুতাই!

কী উপায়ে হবে

স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েকমাস পর্যন্ত তাই-এর শ্বশুরবাড়ীর তরফের কয়েকটি লোকের হাতে অনেক নাজেহাল হতে হয়েছে, গালাগালিও শুনতে হয়েছে। অত্যন্ত নোংরা সব গুজব শুনে শুনে মন ভেঙে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে অনেক বেনামী চিঠিও পাওয়া যেত। যে বদমাইস লোকটা তাই-এর স্বামীকে বদ-অভ্যাস করিয়ে খারাপ পথে নিয়ে গিয়েছিল, সে কোর্টে নালিশ করেছে যে, তাই-এর স্বামী তার কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার করেছিল। সে এখন টাকাটা ফেরত চায়। আমার দুঃখ হল এই ভেবে যে, সমস্ত ঋণ শোধ করার পরও এই মিথ্যা ঋণ আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে। ঋণ মিথ্যা হোক, কিন্তু তা প্রমাণ করব কি উপায়ে? আমি নিজে উকিল ছিলাম সেইজন্য এর কায়দাকানুনও আমার জানা ছিল কিছুটা। কিন্তু তবু, উপায় কি? তাই-এর স্বামী পাগল ছিল না, কাগজের ওপর দস্তখত তারই ছিল। তার সঙ্গে সাহুকারের হস্তাক্ষরও ছিল। তবু এটা বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সত্যই তাই-এর স্বামী এত টাকা ধার করেছিল। কেউ তো সাক্ষী ছিল না। এই-সব দুশ্চিন্তায় সব সময় জর্জরিত হয়ে থাকতাম। ওদিকে আমার ব্যাখ্যানও চালু রেখে-ছিলাম, কিন্তু তখন ক্লাসে গণ্ডগোল করবার জন্য অনেক বেশি সংখ্যায় লোক আসা আরম্ভ করেছিল। আমার মন একেবারে হতাশায় ডুবে গেল। তাই-এর স্বামীর দূর সম্পর্কের দুশ্চরিত্র আত্মীয়টি এই মতলবে ছিল যে তাই-এর নামে যা-কিছু সম্পত্তি রাখা ছিল, তা কোনো ছলছুতা করে আত্মসাৎ করে নেবে। তাই এর জন্য মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। সে বলতে লাগল, "যা ঋণই থাক্, আমি সব চুকিয়ে দেব। এ করতে গিয়ে যদি সর্বস্বান্ত হই, সেও ভালো। কিন্তু এ মনোকষ্ট আর সহ্য করা যায় না।" সেই পাজী লোকটা এই রকম আদা জল খেয়ে তাই-এর পিছনে লেগেছিল।

রহস্য

আমাদের বাড়ীর সকলের মনের শান্তি নষ্ট হল। আমার তো সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। জনসমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে যাওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল। চিন্তা হল, এখন এটাকে কী করে সফল করা যায়। আমার এ বিষয়ে মন পবিত্র ও একাগ্র থাকা সত্ত্বেও, লোকেরা নানা প্রকার অনর্থ সাধন ও বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করত।

কাগজে রটাত, ব্যাখ্যানের মাধ্যমে সব অপরিণতবয়স্ক যুবকদের খারাপ পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার ভাষণ আর উপদেশাবলীর কল্যাণে কিছু বন্ধু জুটুক, এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা আশানুরূপ পূরণ হয় নি। তার চেয়ে যদি বলি, শত্রুই বেশি পেয়েছিলাম, তা হলে অত্যুক্তি হবে না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অতি অদ্ভুতভাবে সকলে আমার দিকে তাকাত, যেন এক অতি বিচিত্র জন্তুকে দেখছে। তারা ঠাট্টা টিটকারি করত, গালাগালি দিত, কেউ বা দূর থেকে মজা দেখত।

যতদিন যেতে লাগল ততই নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। আমার হাত দিয়ে কোনো কাজ আদৌ সফল হবে কি না, এ বিষয়েও মনে সন্দেহ জাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় একা বেড়াতে বেরোলাম। যেতে যেতে কতদূর চলে গিয়েছি খেয়াল ছিল না। ক্লান্তি বোধ হওয়ায় সামনের এক পাথরের ওপর গিয়ে বসলাম। চতুর্দিকে খুব শান্ত, নীরব। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, ঘরে ফিরে যাবার কথা মনেও ছিল না। হঠাৎ হুঁশ হল, দেখি চারিদিক চন্দ্রালোকে ছেয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। নিজের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করে কোনও সমাধান খুঁজে পেলাম না। বাড়ী ফেরবার জন্য উঠলাম। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখি, রাত ন'টা বেজে গেছে। বাড়ীর সকলে খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছিল, কারণ সাধারণত আমি কখনোই বাড়ী ফিরতে এত দেরি করি না। দাদাজী আর ভাই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। সুন্দরী আর তার মা জল্পনা

করছিলেন, আগে যেমন পরিস্থিতি হয়েছিল, আজও হয়তো সেরকম কিছু ঘটেছে। পরে দাদা আর 'তাই' আমাকে জানাল, তারা কোথায় কোথায় আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে আমি একেবারেই শুতে যাই নি। মনে হচ্ছিল যেন সামনে খুব বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ঘুম আসছিল না। একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম। কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না। আমি বার বার ভাবতে লাগলাম আমি যা চাইছি, তা কী উপায়ে কোন্ সাধনার দ্বারা পাওয়া যাবে এবং সে সাধন-পদ্ধতিটা কি? আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আমার বইয়ের এক ছোটো আলমারি ছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওতে অল্পসংখ্যক ভালো ভালো গ্রন্থ ছিল। আমি শূন্য দৃষ্টিতে ঐ বইগুলির দিকে চেয়ে রইলাম। কয়েকজন গ্রন্থকারের কয়েকটি বই আমি পড়ে প্রেরণা পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ সেগুলিও আমার কোনও কাজে এল না। আমার মাথা ঘুরে গেল— মনে হল আমি পাগল হয়ে যাব না তো? কোনো সমস্যার ধাক্কায় আমি পাগল হয়ে যাব না। কোনো কথার ভূত ঘাড়ে চাপলে, তার পিছনে পাগল হয়ে যাবার মতো মহান ব্যক্তি আমি নই, এটা আমি জানতাম। আমি চুপ করে চেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। রাত তখন আড়াইটা কি তিনটা বাজে। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে মাথা স্নিগ্ধ হল। বাগানের ফোটা ফুলের সুগন্ধে চারিদিক মেতে উঠেছিল। আমার মন প্রস্ফুটিত ফুলের মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এর মধ্যে টের পেলাম, বাগানে যে দু-চারটা চেয়ার রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে একটাতে কে যেন বসে আছে। এই সময়, এত রাত্রে, কে চেয়ারে এসে বসবে? এমন সময় সেই ব্যক্তিটির দীর্ঘনিশ্বাস ও একটু কাশির আওয়াজ কানে এল। আমি খুব মন দিয়ে দেখছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, ব্যক্তিটি কে।

আমি চুপ করে দেখছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে ঐ মনুষ্যদেহধারীটি বাগানের বাইরে এসে গেল। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি এগিয়ে এসে বলে উঠলাম— "এ কি? এত রাত্রে তুমি এখানে?"

কোনো উত্তর নেই। আমরা দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমি আবার বললাম, "তুমি কি চিন্তা করছ? কথা বলছ না কেন?"

তবু কোনও উত্তর নেই।

ঐ ব্যক্তিটি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিল না দেখে ভাবলাম একবার বাগানে গিয়ে দেখি। সে তাড়াতাড়ি হাত তুলে মানা করল। ঐ সময় তার চেহারা খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সে একটু হাসল— দেখতে পেলাম তার চেহারা রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার মনে এই আশঙ্কা জাগছিল যে নিশ্চয়ই এ বাগানে কোনো বাইরের লোক এসেছে। কিন্তু আমার মনে কোনো অস্বাভাবিক চিন্তার উদয় হয় নি।

আমি আবার বাগানের দিকে যাবার চেষ্টা করলে সে আবার মানা করল। আমি আর থাকতে পারলাম না! সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম— "এ কি ব্যাপার? তুমি এত রাত্রে এদিকে কি করে এলে? বাগানে কী আছে? আমি দু'দুবার বাগানে যাবার চেষ্টা করলাম, তুমি দুবারই যেতে মানা করলে কেন?" সে তবু কোনো জবাব দিল না। ওর কোনো জবাব না পেয়ে আমি চটে গেলাম। রেগে গিয়ে বললাম— "মনে হচ্ছে, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই, না হলে তুমি এমন চুপ করে থাকতে না। ঠিক আছে, এখন থেকে আমারও তোমার ওপর কোনো বিশ্বাস থাকবে না। আচ্ছা··· আমি চললাম।"

আমার রাগ চড়ে গিয়েছিল। সেই ঝোঁকে আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা একে অন্যের সহায়ক— তুমি কি চাও আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হই?" তবু সে নিরুত্তর রইল। তার চোখ সজল হবার আভাস পেলাম। তার চোখে জল দেখে দুঃখ পেলাম। আমি সব সময় বলতাম— 'আমার গংগু-তাই এক সমুদ্রের মতো'। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে বললাম— "তোমার এত দুঃখ কিসের? কাঁদছ কেন? কি··· আমাকে সত্যিই কিছু বলবে না? আমাকে বাগানে কেন ঢুকতে বারণ করেছিলে? এর মধ্যে কী রহস্য আছে, বলো?"

"বলব, সব বলব, তোমার সম্বন্ধেই সব কথা। একটু সুযোগ পেলেই তোমাকে সব বলব। তুমি মিছিমিছি ঝগড়া কোরো না।"

"আবার সুযোগের অপেক্ষায় কি, এখনই বলে ফেল না।"

"বলব, কিন্তু এখন না।"

"বাগানের ভেতর কেউ আছে না কি ?"

"কেউ নেই।"

"তা হলে আমাকে যেতে দিলে না কেন ?"

"ওখানে গিয়ে কি করবে ? ওখানে কিছুই নেই··"

এই বলে সে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল—"ভাউ, যদি ওখানে কিছু হয় তা হলে আমি আর বেঁচে থাকব না।" আমি আরও হয়তো প্রশ্ন করব এই মনে করে বলল— "চলো, ভিতরে চলো। ভাউ, তুমি তো কখনও রাত্রে জেগে থাকো না ? আজ জেগে আছ কেন ?"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমি কখনও জাগি না, এটা কি করে জানলে ?" সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কি করে জানলাম মানে ? কখনও তো আগে জাগতে দেখি নি তোমাকে।"

এই কথার সূত্র ধরে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "তা হলে, কয়েক দিন থেকে রোজ তুমি এই বাগানে আসছ ?"

"কয়েক দিন থেকে ঠিক নয়, আজ এই তৃতীয় দিন··· না, মানে, এই তৃতীয় রাত। ···চলো, ভিতরে চলো। বাড়ীর সবাই জেগে উঠবে।"

এই রকম ভাবে 'তাই' আমার প্রশ্নের উত্তর বেশ কায়দা করো এড়িয়ে গেল।

আমার চিন্তাধারাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে 'তাই' বলতে লাগল—"ভাউ, তোমাকে এত হতাশ লাগছে কেন ? রাত্রে ঘুম আসে নি বুঝি ? জানালা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্ত করছিলে না কি ? আর এই তিনটে বই খোলা পড়ে আছে কেন ? তিনটে বই একসঙ্গে পড়ছিলে না কি ? তোমার মনও কি কোনো কারণে অসুস্থ হয়েছে ? ···আর, একি ? বিছানাতে শোবার কোনো

লক্ষণই দেখছি না—সারারাত বসেই কাটিয়ে দিয়েছ না কি?"

উত্তর দেবার কোনও সময় না দিয়ে ও তাড়াতাড়ি এতগুলো প্রশ্ন করে ফেলল।

তারপর কিছুক্ষণ থেমে হেসে উঠল, মনে হল জেনেশুনেই ও হাসছে। তারপর বলতে লাগল—"ভাউ, তোমার কি বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে?"

'তাই' যে আমাকে নিয়ে এরকম রঙ্গ-তামাশা করবে, এটা ভাবতে পারি নি। আমি চুপ করে রইলাম। আমার কোনো জবাব না পেয়ে ও আবার জিজ্ঞাসা করল—"কি, এই-সব প্রশ্ন করছি বলে চটে গেলে নাকি? তোমার মনে যদি ঐ রকম কোনো অভিলাষ জন্মায় তা হলে আমি খুব খুশি হব। তোমার যোগ্য···"

আমি আর শুনতে পারছিলাম না। আর অপেক্ষা না করে বললাম "তাই, আজ তোমার হয়েছে কি? কী সব পাগলের মতো আবোলতাবোল বকছ? রাত জেগে বোধহয় মাথাটা ভারী হয়ে গিয়েছে। যাও ভিতরে যাও। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে কখনো এ-সব প্রশ্ন তুলব না। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম আবোলতাবোল প্রশ্ন কোরো না।"

সকাল হল। বাড়ীর লোকেরা সব জেগে উঠেছে দেখে ও চলে গেল। কিন্তু আমার মনের ভার হাল্‌কা হল না।

ভগবানের মার

তাই-কে আমি কথা দিয়েছিলাম, যে সেই রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখ বা জিজ্ঞাসা করব না। আমি নীরবে তাই-এর সারা দিনের কাজকর্ম লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। তার জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। ওর যেন সব বিষয়ে হতাশার ভাব এসে গিয়েছিল। তার নিজের প্রাণ-প্রিয় সখী সুন্দরীর সঙ্গেও সে আজকাল ঠিকভাবে কথা বলত না। একলা নির্জনে বসে চিন্তামগ্ন

হয়ে পড়ত। আগে যে-সব কাজে উৎসাহ বোধ করত, সে উৎসাহ এখন আর নেই। তাই-এর মনের নৈরাশ্যের ছায়া সারা বাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। আমিও খুব উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়লাম। আমি কেবল এই চিন্তা করছিলাম যে আমাকে একটা বিশেষ কোনো কাজ করতে হবে। কিন্তু মৎসদৃশ দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব কিনা, আমি জানতাম না। আজ পর্যন্ত পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যা অর্জন করেছি। দরিদ্রদের সাহায্য করতে কোনও ত্রুটি করি নি। আমি ভেবেছিলাম আমার উপর নির্ভরশীল, যারা আমার পরিবার আছে, তাদের জন্য যতটুকু উপার্জন করার দরকার, তার চেয়ে বেশি উপার্জন করার প্রয়োজন নেই। উকিল হওয়ার সুবাদে অনেক মক্কেল জুটত। আবার, কেউ গরিব লোক এলে, তার কাছ থেকে এক পাই-পয়সাও নিতাম না। ইদানীং বার বার একটা কথা মনে হত, কেবল একজন লোকের প্রচেষ্টায় দেশের হিত করা যাবে না। আমার চিন্তাধারায়, আমার আদর্শে অনুপ্রাণিত লোক পেলে উৎসাহের সঙ্গে দেশসেবা করব। মিশনারী লোকদের প্রয়াস দেখে আশ্চর্য হতাম। আত্মত্যাগের আদর্শ কি কেবল তাদের কাছেই আছে! আমার দেশ অনগ্রসর, অবনত। কিন্তু কারো মনে কেন আত্মত্যাগের আদর্শ জাগছে না? কোনও নব্য যুবক সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে কেন অজ্ঞান ও অশিক্ষিত লোকদের জাগিয়ে তুলছে না। আমি কি কোনো একটা কাজে ব্রতী হতে পারব? আমার কি কোনা সহকর্মী মিলবে? এই ধরনের চিন্তায় পনেরো-বিশ দিন কেটে গেল। একদিন হঠাৎ আমার মনে, সূর্যের দিব্যজ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত এক নব চিন্তাধারা উদিত হল, মনের অনীহা ও হতাশা দূর হয়ে গেল। ঐ উজ্জ্বল পরিকল্পনার আলোয় মনের ভার ধীরে ধীরে হাল্‌কা হয়ে গেল। আর্য আদর্শ অনুযায়ী সর্ব বিষয়ে উপযোগী ও সনাতন কর্মপন্থী উদ্ভাবনের শ্রেয় পথের কি সন্ধান পাব? আমার সঙ্গে কাজ করবার জন্য চারজন সহকর্মী, সহধর্মী কি মিলবে? এই ভেবে ধীরে ধীরে উৎসাহিত বোধ করতে লাগলাম, এবং দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আমি খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলাম।

হাততালি দিতে লাগলাম। মনে হল যেন আমি এক নূতন পন্থা পেয়ে গেছি। মনে খুশির আমেজ লেগেছিল। এমন সময় দাদা শিবরাম পন্থ এসে গেলেন। আমাকে দেখে তিনি হয়তো খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকদিন তিনি আমার এরকম অবস্থা দেখেন নি। দেখে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন— "একলা একলা এত খুশি হয়ে হাসছ কেন ?"

"আমার মনে এক রহস্য লুকিয়ে ছিল, এখন তার সমাধান পেয়ে গেছি। এইজন্য হাসছি ; আর কিছু নয়।"

"রহস্য ? কিসের রহস্য ?"

"এতদিন পর্যন্ত একটি চিন্তার আলোড়নে খুব বিপর্যস্ত হচ্ছিলাম। আজ তার রহস্য টের পেয়ে গেছি।" 'তাই' এসে গেল। দাদাজী ও তাইকে উদ্দেশ করে বললাম, "আমার মনে যে উদার পরিকল্পনা মাথায় এসেছে, যে আহ্বান এসেছে, তা পূরণ করতে আপনাদের কাছে আমি শপথ গ্রহণ করব। আপনাদের দুজনের পাদস্পর্শ করছি, কারণ আপনারা দুজনেই আমার কাছে গুরু-সদৃশ, পিতৃতুল্য !"

আমার কাছ থেকে এই রকম অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে তাঁরা হতবাক্ হয়ে গেলেন। হয়তো ওঁদের মনে হল, আমার মস্তিষ্কের কোনো বিকৃতি ঘটে থাকবে। "আমার শপথ", "আপনাদের পাদস্পর্শ করছি" ইত্যাদি সব কথা ওঁদের কাছে খুব অস্বাভাবিক লেগেছিল বোধহয়।

গংগু-তাই আমার কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "ভাউ, তুমি এ-সব কী পাগলের মতো বকছ ? মাথার ঠিক আছে তো ? এমন কী সংকল্প তুমি করে বসেছ ? শিবরাম পন্থজী তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার জন্য এসেছিলেন। তাঁর কথা আগে না শুনে তুমি নিজের কথাই কেবল বলে চলেছ। আগে তিনি যে কথাটা বলতে এসেছেন সেটা তো শুনে নাও।"

"তুমি কি ভেবেছ, আমি তাঁর কথা শুনব না ?"

"কি জানি, তুমি কী সংকল্প করেছ আমাকে তো জানালে না।

তেমনি আমার সংকল্পও তুমি চার দিন বাদে শুনলে আনন্দিত হবে, বুঝ্‌লে ?"

"আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে— তুমি একটু চুপ করো তো। হাসি-ঠাট্টা আর করতে হবে না। দাদাজী, আপনি কি বলতে চান বলুন।"

"ভাউ, এখনও পর্যন্ত সুন্দরীর বিবাহ দেব না ঠিক করেছিলাম, এ তোমার জানা আছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল সে যেন নারী-প্রগতির জন্য স্বাধীনভাবে কিছু কাজকর্ম করে। কিন্তু দেখতে পেলাম, ও স্বাধীনভাবে কার্য করার মতো মেয়ে নয়। স্বভাবে, ও তোমার বোনেরই মতো। আজকাল আমার শরীরেরও অবনতি ঘটেছে। কাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম পরীক্ষা করাতে। ডাক্তার রায় দিয়েছেন, আমার হৃদ্‌যন্ত্র রোগাক্রান্ত। এইজন্য ভাবছি কোন্‌দিন বা এই পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নিয়ে চলে যাব, তার ঠিক নেই। তুমি সুন্দরীকে শৈশব থেকেই জানো। তোমাদের দুজনের পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতির ভাবও আছে। এই-সব বিচার করে এবং তাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছি, তোমার সঙ্গে সুন্দরীর বিয়ে দেব।"

পাথরকে বললে যেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায় না, আমার অবস্থাও যেন সেরকম, আমি চুপ করে রইলাম। যদি গতকাল এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হত তা হলে কি হত ? আমি ঘাড় ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার এই অবস্থা দেখে 'তাই' খুব বিস্মিত হল। সে ভেবেছিল, যে দাদাজীর প্রস্তাব শুনে আমি খুব খুশি হব, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হবে। আমি চুপ করে আছি দেখে 'তাই' ভাবল, আমি লজ্জা পাচ্ছি। সে বলল "আরে —, তুমি ছোটো ছেলের মতো লজ্জা পাচ্ছ কেন ? যেন তোমার মনেও এই রকম কোনো ইচ্ছা নেই ! আমি পরশু দিনই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— এখন চুপ করে আছ কেন ?" আমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া শুরু করল।

দাদা আর 'তাই' আশ্চর্য হয়ে গেল। তাই বলতে লাগল— "তা হলে কথা পাকা হয়ে গেল তো— কেমন ?"

আমি বলে উঠলাম "অসম্ভব ! অসম্ভব !!"

"অসম্ভব ? অসম্ভব কেন ?"

"কারণ, আমি এখনই যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা পালন করবার পথে বাধা আসবে।"

পরীক্ষা পর্ব

আমার মুখ থেকে, অত্যন্ত খেদ, দুঃখ ও আবেগের বশে এই কথা বেরোলো। যে কথা দাদাজী আমাকে বললেন সেটা তো আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। ছোটবেলায় যখন আমি সুন্দরীকে প্রথম দেখি তখন থেকেই, সে আমার জীবন-সহচরী হোক, এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তখন দাদার ইচ্ছা হয়তো অন্যরূপ ছিল। সেজন্য আমার সমস্ত ইচ্ছা আমার মধ্যে চেপে রেখেছিলাম। আজ আমার সেই গুপ্ত ইচ্ছা প্রকাশিত হবার প্রসঙ্গ এল, কিন্তু 'অসম্ভব !' এই কথাটা বলে ফেলার দরুন, সেই শব্দের দুর্জয় প্রভাব আমার ওপর এসে পড়েছিল। এই ছিল আমার ভাগ্যের ক্রূর পরিণতি ! ঠিক একদিন আগে যদি দাদাজী আমাকে এই প্রস্তাব দিতেন তা হলে কত ভালো হত ! কিন্তু না, অন্য কিছু হবার ছিল। আমি যখন দৃঢ়তার সঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করে ফেলেছি, তখন আর এ-সব কথার কী অর্থ ? আমার মুখ দিয়ে একবার এই কথা বেরিয়ে গেছে, এইজন্য অত্যন্ত দুঃখ হল।

আমি একেবারে নির্বাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের তিন জনের মুখে কোনো কথা নেই।

'তাই' ধীরে ধীরে বলল— "ভাউ, তুমি এ কী বলছ ? এর মধ্যে অসম্ভব কোন্ কথাটা আছে ? তুমি অন্য কোথাও কথা দিয়েছ না কি ?"

এই কথা শুনে হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল। যে উদাস কল্পনায় আমার জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছি, সে লক্ষ্য ছেড়ে আমি

অন্য কোনো মেয়েকে সহধর্মিণী হিসাবে বরণ করব, এ কল্পনা আমার কাছে অসহ্য। তাই-এর এ প্রশ্ন আমার কাছে অসহ্য মনে হল। আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে বললাম— "তাই, তুমি আমাকে এ কী প্রশ্ন করলে ?"

তাই জবাব দিল, "আমার পক্ষে যে কথাটা সম্ভব বলে মনে হয়েছিল, তাকে তুমি অসম্ভব বলে দিলে। সেজন্যে আমি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রশ্ন তুলেছিলাম।" তাই-এর বিশ্বাস ও আনন্দের ভিত্তি খুব ধাক্কা খেয়েছিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কী এমন বাধা এসে গেল সেটা তো বলো ? আরে, তুমি ছেলেবেলা থেকেই মনে এ ইচ্ছা পোষণ করে এসেছ এবং একবার তোমার শক্ত অসুখও হয়ে গেল। তোমার মনের পরিবর্তন হয়েছে এটা যদি মেনে নিই, তা হলে তা সত্যি হবে না। আর সত্য সত্যই যদি মন বদলে গিয়ে থাকে তা হলে তোমার মতো হতভাগ্য ব্যক্তি আর দুনিয়ায় নেই। এ রকম রত্ন পাবার জন্য সাতজন্ম তপস্যা করতে হয়। তুমি কি রকম মানুষ! এর মধ্যে কী এমন অসম্ভব কথা আছে ? মনে পড়ে, ছেলেবেলায় তাকে একটা চিঠি লিখেছিলে ? আর, আজ তুমি তার এই উত্তর দিচ্ছ ?"

আমি বুঝতে পারছিলাম না, কী এর জবাব দেব। আমার মন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। আমার আশাবাদী মনের সামনে জীবনের সমস্ত স্বপ্ন-সাধ সফল হবার সুযোগ এসেছিল। সে-সব ত্যাগ করে আমি মনে মনে যে শপথ করেছিলাম, সেটা ভঙ্গ করব ? না, এই আত্মসুখ লাভের পথে নিজেকে চালিত করব ? এ নারীরত্ন সহজলভ্য নয়। এক সুন্দর সুখী গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আমার সামনে ভেসে উঠল। তার পাশাপাশি আমার সংকল্পের মূর্তিও আমার সামনে ফুটে উঠল। নূতন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করে সারাজীবন পরোপকার ও সমাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করবার ইচ্ছা, যা আমি মনের মধ্যে পোষণ করেছিলাম, তার সমস্ত বিচার ভাবনা চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। 'তাই' বলতে লাগল— "তুমি এমন কী শপথ করেছ ? এমন তো নয়, যে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হতে চায়, এমন

কোনো মেয়ের খোঁজে লেগে যাব?" এই-সব প্রসঙ্গে আমি খুব অসুস্থ বোধ করছিলাম। আমি তাই-কে বুঝিয়ে বললাম— "আমি সব খুলে বলব, তবে এখন নয়। এখন কারও মন শান্ত নয়। আগে সকলের মন শান্ত হতে দাও।" দাদাজীরও মনের অবস্থা বিচিত্র হয়ে গিয়েছিল, এটা বুঝতে পারছিলাম। তিনি ওখান থেকে উঠলেন এবং উঠতে উঠতে বললেন, "সত্য সাধনার পথ ত্যাগ কোরো না। ওতেই সমস্ত সুখ।" এ ছাড়া তিনি আর কিছুই বললেন, না। তাঁর এই শেষ বাণী শুনে স্থৈর্য ফিরে পেলাম।

মানসিক সংঘর্ষ

আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলে গেল! একান্তে বসে আমি মনের মধ্যে অনেক চিন্তা, বিতর্ক-বিচার করে দেখলাম। কিন্তু কোনো ফল হল না। কখনও কখনও বাইরে ঘুরে বেড়াতাম, কখনও কোনো নদীর ধারে, কখনও চতুঃশৃঙ্গী পাহাড়ের পাথরের ওপর— কোথাও গিয়ে যদি আগুনজ্বলা মাথাটাকে ঠাণ্ডা করা যায়। কিন্তু মাথার মধ্যে তখন দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ চলছে। এই সময়, আমার কারও সাহায্যের দরকার। নিজের বিচার, নিজের সিদ্ধান্ত অন্যকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম। এইবার তাই আমার বিচারের বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে গেছে, সেইজন্যে ওকে বোঝানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই বাড়ীতে আমার বিশ্বাসের দৃঢ় আশ্রয়স্থল ছিলেন দাদাজী। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিনি আমাকে কতদূর সাহায্য করতে পারবেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। এইজন্য কোনো সৎগ্রন্থ অথবা কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। আমি কয়েকটি বই নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম, কিন্তু তাতে মন শান্ত হল না। নানা রকম বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে আমার সামনে হঠাৎ এক আগামীকালের চিত্রপট ফুটে উঠল : সেই চিত্রের নায়ক আমি, —সুন্দরীকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য সুখ উপভোগে মগ্ন। 'তাই' আমার

কাছে আছে। সে খুব আনন্দে আছে। ভাই-এর কোলে, হুবহু আমার চেহারার সঙ্গে মেলে এমন একটি ছোট্ট ছেলে, তার হাত ধরে হাসছে। সুন্দরীর মায়ের কোলে একটি মেয়ে বসে আধো আধো ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করছে। তাই আর সুন্দরী মিলে অন্য সব স্ত্রীলোকদের এ. বি. সি. শেখানোর ক্লাস চালাচ্ছে। ওরই ভিতর একদিকে সেলাই-সূঁচের কাজের শিক্ষাদানও চলছে। আমি যেন কোথাও ভাষণ দেবার জন্য গিয়েছি, কাউকে কোনো আবেদন পত্র লিখে দিচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আমার পরিচালিত দৈনিক পত্রের জন্য, আমার লেখা নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় চিত্রটি এইরূপ :— আমার পোষাক একেবারে বদলে গেছে। নূতন মঠ স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। জনহিতায় কিছু উপদেশাত্মক আলাপ-আলোচনা চলছে। আমি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আমার জীবনের এই দুই বিভিন্ন চিত্র-রূপ দেখতে পেলাম। এক দৃশ্য আনন্দ-হাস্যোচ্ছল পারিবারিক সুখের, আর অপরটি ছিল মানসিক সুখের— যার ভিতর গার্হস্থ্য সুখ একেবারে নেই। ব্যক্তিগত সুখ বরঞ্চ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সামাজিক সুখ বেড়েই চলে। ব্যক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু সমাজ নষ্ট হতে কোটি বছর লাগে। আমি হিন্দু— আর্য বশিষ্ঠ বাসুদেব রাম হরিশ্চন্দ্রের আমি বংশধর— স্বার্থপর নই, আমি পরার্থপর। এই পরার্থপরতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেই আজ আমাদের দেশের এই অধোগতি। দেশকে আবার উন্নত করতে গেলে এই অত্যাবশ্যক গুণগুলিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই-সব চিন্তা রাত-দিন আমার মাথায় ঘুরছিল।

যত এ-সব চিন্তা ও বিতর্ক করছিলাম ততই সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছিলাম। এমন সময় আমার দৃষ্টি দরজার দিকে গেল এবং দেখলাম যার সম্বন্ধে অহরহ চিন্তা করেও কোনো নির্ণয়ের পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সেই সুন্দরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ও একলা দাঁড়িয়েছিল। দেখে আমার মন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল। সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ঐহিক সুখকে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজেকে পরমার্থের সন্ধানে নিয়োজিত করা থাক্। কেন ? গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেও দেশের

সেবা করা যায় না ? পরমার্থের সন্ধানে চলতে গিয়ে আমার যদি কোন উপযুক্ত সঙ্গী না জোটে, তা হলে আমার একলার প্রচেষ্টা আমাকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবে ? এবং এর পরিণামই বা কী হবে ?

এই-সব চিন্তা আমাকে আবার বিপর্যস্ত করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন আমি আরও বেশি মোহপাশে আবদ্ধ হতে চলেছি। পাশবদ্ধ ব্যক্তির যা হয় আমারও তাই হল। যখন বুঝতে পারলাম যে নিজের অজান্তে আমি এর ভিতর জড়িয়ে পড়ছি, তখন আমি দরজার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। মনে মনে সংকল্প করলাম, যে শপথ আমি গ্রহণ করেছি তা ভঙ্গ করব না। সেটা করলে দুর্নীতির পরিচায়ক হবে। ব্যস্, মন স্থির করে ফেললাম। স্থির করলাম যে দাদাজীকে ডেকে আমার স্থির সংকল্প জানিয়ে দেব, তাতে যা হবার হয় হোক। এটা স্থির করে আমি ধীরে ধীরে উঠলাম, উঠে দাদা যেখানে বসে ছিলেন সেখানে ভয়ে ভয়ে গেলাম। আমার ভয় করতে লাগল— মুখ দিয়ে কী করে কথাটা বলি ! অদ্ভুত অবস্থা হল আমার। মনের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলাম— সব কথা স্পষ্ট লিখে জানাই, না মুখে বলি। শেষে ঠিক করলাম, লিখে জানানোর চেয়ে মুখে বলাই শ্রেয়।

তিনি মাদুরের উপর বসে ছিলেন। কাল সকালের কথাবার্তার পর তাঁর চেহারা বেশ কাহিল হয়ে গেছে দেখলাম। সাহসে বুক বেঁধে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম "দাদাজী, যে কথা আপনার মনঃপূত নয়, সেই কথাটা বলবার অনুমতি প্রার্থনা করছি। এতে আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু এখন আমার আর অন্য কোনো উপায় নেই। আপনি ভেবেচিন্তে আমাকে আপনার অভিমত ব্যক্ত করবেন। আপনি ও 'তাই' আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি তার কতখানি যোগ্য, আপনি তা জানেন। কিন্তু সে প্রস্তাব, আমার কাছে কেন অসম্ভব, তা আমি বলতে চাই। আপনাকে না জানিয়ে আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম। আজ আপনি আমার সংকল্প শুনুন। আপনি একবার যদি আমার ঘরে আসেন, তা হলে সব খুলে স্পষ্ট করে বলতে পারি।"

দাদা চুপচাপ উঠে আমার পিছন পিছন এসে সামনের আরাম-

কেদারায় বসে অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি তাঁকে আমার মনের সমস্ত সংকল্প খুলে বললাম। শুনে অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে থাকলেন। চুপ করে থাকতে দেখে মনে আশঙ্কা হল যে, হয়তো আমার এই সংকল্প তাঁর কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এতক্ষণ ধরে তিনি কী চিন্তা করছেন? আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাবছিলাম। খুব বেশি হলে হয়তো দেড় মিনিট হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হতে লাগল, দেড় ঘণ্টা! আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, "দাদা, আপনি কিছু বলছেন না কেন? আমি যা বলেছি, আশা করি তা আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় নি। আজ এরকম কাজে সমর্পিত-প্রাণ যুবকদের প্রয়োজন আছে। দেশবাসীদের মনে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেতনার প্রসার হওয়া দরকার। এ কাজ শুধু স্কুলের শিক্ষাতে হবে না। এর জন্য নূতন মঠের স্থাপনা করে নতন পথ-নির্দেশ করতে হবে। এই সাধনার জন্য ভালো ভালো উচ্চশিক্ষিত লোকদের গ্রামে গ্রামে যেতে হবে।" তিনি আমার দিকে চেয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন— "তোমার ভিতর যে চেতনার উদয় হয়েছে তা সর্বৈব কালোপযোগী। তুমি নির্দ্বিধায় ঐ কাজ আরম্ভ করো। আমি জানি, তোমার এতে হয়তো যশঃপ্রাপ্তি হবে না, কিংবা তোমার মনের মতো সব জিনিস হয়তো পাবে না। কিন্তু আর-কিছু না হলেও তোমার নূতন চিন্তাধারার পরিচয় সকলে পাবে। একটি আত্মত্যাগের উদাহরণে অনেক কিছু কাজ হয়। আমি তোমাকে যে পথের সন্ধান দিয়েছিলাম, তা ছিল ঐহিক সুখের। যে সুখ শাশ্বত নয়। মৃত্যু এসে মানুষের শরীরকে নষ্ট করে দেয় কিন্তু তার আত্মা ও উন্নত জীবনদর্শন অমর হয়ে থাকে। এর কোনও অবনতি ঘটে না।" এই বলে তিনি চুপ করে গেলেন। দাদাজীর এই উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার এত উৎসাহ দেখে, আমাকে উৎসাহ দিতে এই-সব বললেন না তো? মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম— দেখলাম ওঁর চেহারার মধ্যে আশীর্বাদ মূর্ত হয়ে রয়েছে।

আমি উৎসুক জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তাঁর চেহারায় বেদনা-ক্লিষ্টতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। সত্যই তিনি এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি। আমরা দু-জনে নিশ্চল মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিলাম। আমি ছিলাম ওঁর দিকে তাকিয়ে, আর তিনি তাকিয়ে ছিলেন নীচের দিকে। যে-ব্যক্তির আশ্রয়ে ও শিক্ষাদানে আমার শিক্ষাপর্ব সম্পূর্ণ হতে পেরেছে, তাঁর মহানুভবতা কত বিরাট। মনে মনে ভাবছিলাম, এই মহৎ ব্যক্তির মতো, লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মোন্নতি সাধনের দৃষ্টান্ত, পৃথিবীতে বিরল। এঁর হাত দিয়ে কত মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়েছে, যে কার্যে পৃথিবীর কত উপকার সাধন হয়েছে— সে খবর কে রাখে! ইনি সত্যিকারের শিক্ষক, সত্যি-কারের কর্মী ছিলেন। এদিকে, দাদাজীর মানসিক অবসাদের কোনও পরিবর্তন ঘটল না। তিনি ক্ষীণস্বরে আমাকে বললেন— "তুমি নিজের পথ বেছে নেবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তুমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ। ক্ষণিক ও চিরন্তনের মধ্যে কী তফাত, এটা আগে তোমার বোঝা উচিত। এই পথে যে-সব নিষ্কর্মা ব্যক্তি, অন্যত্র কোথাও ঠাঁই মিলছে না বলে তোমার মঠে থাকতে চাইবে, তাদের জন্য তোমার মঠের দরজা বন্ধ রেখো। কারণ এ-সব মানুষ তোমার কোনো কাজে আসবে না। যে মনে-প্রাণে জ্ঞানের আলোকের সন্ধানে যেতে চাইবে, তারই অগ্রস্থতি সম্ভব।" এইটুকু বলে আবার তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে তাই ও সুন্দরীর বিষয় চিন্তা করতে লাগলাম। আমি দাদাকে বললাম, "দাদা, তাই-এর সমস্যার সমাধান কে করবে? সে কি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার সহায্যেই সব ঠিক করে নেবে? তা না হলে ওর মনে দুঃখ দেওয়া অনুচিত হবে।"

"ওর জন্য চিন্তা কোরো না। ও একটু জেদী মেয়ে। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব। তোমাকে আর একটা কথা বলতে চাই, তুমি

যে পথ খুঁজছ, তার ওপর যদি খুব বেশি আস্থা রাখো তা হলে তোমাকে নিরাশ হতে হবে। কারণ তুমি যে গাছের বীজ পুঁততে যাচ্ছ সে বীজ থেকে অন্তত ছয় মাসের মধ্যে গাছ বেরোবে না। তারও কয়েক বৎসর পরে সে গাছ অঙ্কুরিত হবে। তারপর ডাল পাতা ফুল ইত্যাদি বেরোতে অনেক অনেক বৎসর লেগে যাবে। আর ফল পাবার কল্পনাও তুমি কোরো না।

"বীজ লাগানোর পর যদি অঙ্কুর দেখতে পাও তা হলে— তুমি খুবই ভাগ্যবান! এবার, আমি চললাম। তোমার পথে কোনো বাধা না আসে এবং নিরুৎসাহ না হয়ে যাও— এই আমার উপদেশ, এই আমার আশীর্বাদ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বললেন— "যতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিক থাকবে। কিন্তু আমি চলে গেলে— আমি তোমার আর তাই-এর সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে চাই। প্রথম কথা— আমার নির্বাচিত পথ, আর দ্বিতীয় কথা— আমার কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ। এখন আমার কন্যা, তোমার স্ত্রী হতে পারে না— নিজের ভগ্নীরই মতো ওকে লালনপালন কোরো। স্বাধীন-ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে চলবার মতো মেয়ে এ নয়, এইজন্য ওর আশ্রয় দরকার। তুমি আর তোমার বোন তাই— এই দুজনই ওর একমাত্র আশ্রয়; ওর মা অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মহিলা। ওঁর কাছ থেকে সুন্দরী অতটা সাহায্য পাবে না।" এর পর আর কিছু বলতে পারলেন না, হয়তো সব বুঝেশুনেই চুপ করে গেলেন। তারপর উঠে বাইরে চলে গেলেন।

দাদাজীর কথা শুনে আমার মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠল। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওখানেই চুপ করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে খাবারের ডাক পড়ল। সকলেই নীরবে খাওয়াদাওয়া সমাধা করল— কোনো কথাবার্তা বার্তালাপ নেই। 'তাই', এ-সব কথা যা দাদার সঙ্গে হয়েছিল— কিছু জানে না। পরে সেইদিনই সন্ধ্যার সময়, 'তাই'কে এ কথা ডেকে সব কথা জানিয়ে দিই। তাই এ-সব কথা শুনে, নিজেকে খুব সামলে নিয়েছিল। 'তাই'-এর মনে

দুঃখ এসেছিল, এসেছিল হতাশা, কিন্তু বেশিক্ষণ সে মুহ্যমান হয়ে বসে থাকতে পারে নি। ঐদিনই সে আমার ঘরে এসে বলল— "ভাউ, এ-সব শুনে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি, এটা মনে কোরো না। দাদাজী আমাকে সব খুলে বলেছেন। নিজের যা কর্তব্য তা-ই করা উচিত আর সেটাই মঙ্গলপ্রদ। এই শিক্ষা আমিও গ্রহণ করেছি। কিন্তু ভাউ, আজকাল তোমার নিজের শরীরের এ কী হাল করেছ? এটা খেয়াল রাখো কী?...আমি অর্ধেক রাতে কেন বাগানে ঘুরে বেড়াতাম জানো? তোমার কথা ভেবে ..."

"আমার কথা?" খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— "আমার তো কল্পনাতেও আসে না, এর ভিতর আমার কথা কি আছে। আমাকে সব খুলে বলো।"

'তাই' বলে, "আমি আমার মায়ের দৃষ্টান্তে বুঝতে পারছিলাম, তোমার ওপর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে।" তাই-এর কথায় আমার হাসি পেল, আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। হাসতে হাসতে 'তাই'-কে বললাম "হে 'তাই' মহোদয়া! আপনি কী আজকাল এই 'দৃষ্টান্ত' ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন?"

"ভাউ, হাসো আর যাই করো, আমার কিন্তু পূর্বাভাসের ওপর বিশ্বাস আছে।"

"কি রকম?"

"একবার তো স্বপ্নে দেখেছি এবং তিনবার প্রত্যক্ষ দেখলাম।"

"স্বপ্নের ব্যাপারটা আমি জানি, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তটা কীরকম বলো।" আমি অবশ্য উপহাসের ছলেই এ-সব বলছিলাম, কিন্তু 'তাই'-এর সে-সব দিকে খেয়াল ছিল না। সে সরলভাবে সব বলতে আরম্ভ করল—

"একদিন মা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন— মাথা ভর্তি সিঁদুর— এটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মা বললেন—তোমার একটা বড় রকমের বিপদের সম্ভাবনা আছে, ওর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে— এই রকম তিনবার বললেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চিন্তামগ্ন হয়ে যখন মাঝরাতে বাগানে ঘুরে

বেড়াচ্ছিলাম তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আজ তিন রাত্রি ধরে ঐ দৃশ্য দেখে আসছি আর বারবার ঐ কথাটা কানে এসেছে—"

"কোন্ কথাটা ?"—জেনেশুনেই আমি গাম্ভীর্য রক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলাম। এতক্ষণ ওকে আমি উপহাস করছিলাম, কিন্তু ওর গম্ভীর ভাব দেখে বুঝতে পারলাম 'তাই' যা বলছে তার মধ্যে অবশ্য কোনও গূঢ় রহস্য আছে।

'তাই' বলল— "মা যা বলেছিলেন, তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, তোমার গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তোমার জীবন যাত্রার পথ তুমি বদলে দিলে। এ এক প্রকার সংকট বই-কি !" ওর এই-সব কথায় হাসি পেয়ে গেল। আমি, আমার নূতন জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। ও কেবল শুনে গেল। কয়েকদিন পর্যন্ত 'তাই' উদাস ভাবে কাটাল। এই-সব কথা সুন্দরীর মা জানতেন না। কিন্তু বোধহয় সুন্দরী সব জানতে পেরেছিল। আমি চাইছিলাম তাই-এর মনের প্রসন্নতা ফিরে আসুক। কিন্তু সে প্রসন্নতা ফিরে এল না।

দুই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

'তাই'-এর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যাবার পর, মনে মনে ঠিক করলাম, আমার নূতন সিদ্ধান্ত, নূতন চিন্তাধারা, আমার প্রিয় সখীকে জানিয়ে দিই। এমনিতে হয়তো সে তাইএর কাছ থেকে জানতে পেরেছে। তবু, ভাবলাম, নিজের তরফ থেকে তাকে জানিয়ে দেওয়া বেশি সমীচীন হবে। কিন্তু, কথাটা কি করে ওকে জানাই ? আমি কোন্ মুখে ওকে বোঝাব ? এইজন্য আমি 'তাই'-এর পরামর্শ গ্রহণ করলাম। তাই বলল "এখন তুমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। এটা নিশ্চয়ই তুমি ভাবছ না, যে তোমার নূতন পথ-নির্বাচনে সে খুব লাভবান হয়েছে ? তুমি জান না সে কত দুঃখী !"

আমি দেখলাম যে 'তাই' আর সুন্দরীর মন আমার সংকল্পের

অনুকূল নয়। যে সংস্থা আমি প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি তার সম্বন্ধে আমি ভাবতে লাগলাম। এমন সময় আমার মামার কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম। এমনিতে আমার সঙ্গে মামার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হতে চলেছিল। বছরে এক-আধবার আমাকে চিঠি লিখতেন। আমি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, যে কথা তিনি লিখেছেন তা আমার নূতন সংকল্পেরই বিষয়ীভূত। আমি ভাবলাম, আমার এই সিদ্ধান্ত টের পেলেন কি করে! কারণ, আমার নিজের বাড়ীর লোকেদের ছাড়া আর কাউকে এ বিষয়ে কিছু জানাই নি। অথচ ঠিক ঐ সম্বন্ধেই ওঁর চিঠি এল। পত্রে লিখেছেন—

"অনেক আশীর্বাদ সহ, কয়েক মাস হতে চলল আমরা পরস্পর কোনো পত্রবিনিময় করি নি। দিনের পর দিন মা'র শরীর ক্রমশ খারাপ হতে চলেছে। মনে হচ্ছে আর অল্পদিনই আমাদের কাছে থাকবেন। মাঝে মাঝে তোমার খবর ওঁর কানে আসলে খুব দুঃখ পান। এখন তুমি বড়ো হয়েছ, উচ্চ শিক্ষা পেয়েছ। সেইজন্য আমার বিশ্বাস আছে তুমি যা করবে তা ন্যায়সম্মতই হবে। তুমি নব্য ভাবধারার বাহক, সেইজন্য নূতন চিন্তার মাধ্যমে তুমি অগ্রসর হবে। আমি আজ পর্যন্ত তোমার নূতন চিন্তার, নূতন পদ্ধতির কোনও বিরোধিতা বা অবমাননা করি নি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা মা শুনতে পেয়ে, মার আগ্রহেই এই চিঠি লিখতে বসেছি। যদি ভাবো যে আমি পুরাতনপন্থী সুতরাং মূর্খ এবং নব্য ভাবধারাকে শ্রদ্ধা করতে পারব না, তা হলে ভুল করবে। আমার এ যুক্তি যদি অবান্তর মনে হয় তা হলে এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলো।

"সম্প্রতি শুনতে পেলাম তুমি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে নূতন মঠ স্থাপনা করে নব্য পন্থার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চলছে। আমার এই আশা ছিল যে, অন্তত আমার ইচ্ছানুসারে অথবা তোমার নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করবে। কিন্তু নূতন সংকল্প গ্রহণের ফলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আশ্রম স্থাপনা চূড়ান্ত বাতুলতা হবে। আমার এই অভিমত। আমি এও শুনেছি যে তুমি শপথ

গ্রহণ করেছ এবং তাকে কোনমতে ভঙ্গ করতে চাইছ না। কিন্তু তোমার এই বিবেচনাহীন শপথ গ্রহণের ফলে তোমার বাড়ীর লোকদের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই হবে। আমি সামান্য ব্যক্তি, ভীষ্মের মতো অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নই। গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেও, নূতন আশ্রম স্থাপনা সম্ভব। প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে যে আশ্রমের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তার পবিত্রতা, শুচিতা কি তোমার আশ্রমে থাকবে? অযথা তুমি আশ্রমের নাম কলঙ্কিত করতে চলেছ। সমাজে, তুমি প্রতিষ্ঠার বদলে বদনামই অর্জন করবে। এইজন্য এই-সব পাগলামী ছেড়ে সুস্থ গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে গিয়ে বংশ রক্ষা করো, এটাই তোমার উচিত হবে।"

এই চিঠিটা পড়ে আশ্চর্য হলাম, এইজন্য যে, এর ভিতর যে নব্য চিন্তাধারার কথা লেখা আছে, তা 'তাই' আর দাদাকে ছাড়া আর কারোর কাছে বলি নি। তাই-এর ওপর আমার সন্দেহ হল। আমার সন্দেহের বিষয়ে 'তাই'-কে জানালাম না। মামার চিঠির সম্বন্ধেও কিছু বললাম না। ভাবছিলাম মামার চিঠির জবাব দেব কি না, আর যদি চিঠি লিখি, কতদূর পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করব। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, যা হয় হোক, আমি নিজের সমস্ত চিন্তাধারা, সংকল্প ইত্যাদি ব্যক্ত করে বিস্তারিত চিঠি দেব এবং এই মনে করে কাগজ নিয়ে লিখতে বসলাম।—

"পিতৃপ্রতিমেষু, প্রণামান্তে নিবেদন

"ভাবছিলাম, উত্তর দিই কি না দিই। আর উত্তর দিলে কি-ই বা লিখি। অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিবারের কোনও পূজনীয় ব্যক্তি যদি বাড়ীর ছোট ছেলেদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা করে বসেন, তা হলে তা নিরসন করবার চেষ্টা করেও কোন ফল হয় না। কারণ সে দুরদৃষ্টের প্রভাব থেকেই যায়— বরঞ্চ আরও বেড়ে যায়। চিঠি লিখলেও সেই একই কথা— খুব সরল মনে খোলাখুলি ভাবে লিখলে তার বিপরীত অর্থ করা হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার এ চিঠির বেলায় সেরকম কিছু হবে না, কারণ ছোটবেলা থেকেই আমি আপনার উদারতা ও সারল্যের পরিচয় পেয়ে এসেছি। এ জন্য

আমি ভেবেছি আপনাকে এ চিঠিতে সব সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে লিখে জানাই। আজ পর্যন্ত আমার আচরণ আপনার, মামীমার বা দিদিমার, কারোরই মনঃপূত হয় নি, এটা আমি স্পষ্টভাবে জানি। আমি জানি, আপনার সাহায্যে, আপনার আশ্রয়ে থেকে বর্তমান যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি। এ সত্ত্বেও আমি জেনেশুনে আপনাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করছি বা আমি অকৃতজ্ঞ, এই রকম কিছু আপনি আমার সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়েছেন। এই-সব হওয়া সত্ত্বেও আপনি কখনও আমার মুখের ওপর সে কথা বলেন নি বা লিখে জানান নি। যাই হোক, আমি আমার জীবনকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত এবং এই সূত্রে অনেক জ্ঞানও সঞ্চয় করেছি। অর্থাৎ, গত পাঁচ-ছয় বছর হল, আমি এক গুরুর সন্ধান পেয়েছি যাঁর সৎ চারিত্র্যের প্রভাবে আমার জীবনের দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে, এবং সে দৃষ্টিকোণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে কথা আমার কাছে সত্য বলে ঠেকেছে তাকেই আমি নিজের জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছি। যে তত্ত্ব পূর্ণভাবে সত্য ও জনহিতকর তাকে আমি সব সময় স্বীকার করি। দীন-দরিদ্রের সেবা করেছি, তাদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেছি। ভগবৎ-কৃপায় আমি অনেক উপাধি ও জ্ঞান অর্জন করেছি। এত সব হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের লোভ কোনদিন আমার হয় নি। লোকেদের কাছে প্রশংসা পেয়েও কখনও গর্ব অনুভব করি নি। সব সময় সত্যের দিকে আকর্ষণ অনুভব করেছি। ওকালতি করবার সময়েও নিজের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হই নি। দুধের মধ্যে জলীয় অংশ বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করেছি। আমার এই পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কিছু লোক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। আমি কয়েকবার আমার কাজে অসফলও হয়েছি। তা, অসফল হয়েছি তো কী হয়েছে? আজ পর্যন্ত আমার স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয় নি। আমি কেবল সত্য ও বিবেকপ্রসূত জ্ঞানের প্রচার করতে চেয়েছি। সকল সঙ্গ পরিত্যাগ করে আশ্রমবাসী হবার সংকল্প করেছিলাম। আপনি এর যা অর্থ করেছেন— অর্থাৎ গেরুয়া ধারণ করে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ'

বলে অন্যকে ধোকা দেবার জন্য, এ আশ্রম স্থাপনা করতে যাচ্ছি না। মুখে রাম নাম আর বগলে ছুরি—এই ধরনের প্রবৃত্তিকে নিজের মনের মধ্যে কখনও পালন করি নি। সত্য ও সততা এই দুইটি শব্দ আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল। আমি বিবাহ না করে আমার বন্ধুদের এই বোঝাব যে, আমার এই আত্মত্যাগের তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও উপদেশ গ্রহণ করে লোকেরা যেন সুখী হয়। সারা দেশ ঘুরে এই তত্ত্ব প্রচার করব। পুরাতন রীতিনীতি, অন্ধ বিশ্বাস, যা লোকেদের জীবনে দুঃখপ্রদ হয় তা ভাববার চেষ্টা করব। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যাদের আছে তারা আমার নূতন পথের পথিক হতে পারে। আমার নূতন আশ্রমের সভ্য হতে পারে। এতে আমি কৃতকার্য হই বা না হই, আমি আমার কর্তব্য করেই যাব। এই কাজ কোনো এক ব্যক্তির বা এক পুরুষের নয়, এ কাজ দু-এক গোষ্ঠীর, ভাবী কালের দু-এক পুরুষ মনুষ্য-সমাজের জন্য। এর জন্য চেষ্টা করে যাওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

"আজ পর্যন্ত আমার মতো সুশিক্ষিত লোকেরা কেবল খাওয়া-পরা শোওয়া আর সম্মান লাভ করা ছাড়া আর কি করছে? এই আত্মসুখ অন্বেষণকেই তারা কর্তব্য মনে করে। কখনও গরিবদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা আমরা করি না। জাতিভেদ দূর করার প্রয়াসও নেই। সব আমরা আত্মসুখে নিমগ্ন। আমার এই তত্ত্বকে আপনার কঠোর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, মামা, আমার মতে সুখলাভের আর অন্য কোনও পন্থা নেই, তাই এই পথ আমি অবলম্বন করেছি।

"এতে আমি আমার সমস্ত প্রতিভা, শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োজিত করেছি। আপনার মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আমার এ-পথে যেন বাধা না হন, এই আমার মিনতি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

"ক্ষমা! ক্ষমা!! ক্ষমা!!!...ইতি আপনার সন্তান—"

এইভাবে আমার সিদ্ধান্ত, বিচার সব লিখে জানালাম মামাকে।

আশ্রম স্থাপনার পর আমি ছাত্রদের সভায় এক ভাষণ দিলাম। এরপর দ্বিতীয় ভাষণ দিলাম বোম্বাইয়ের মেডিকাল কলেজের ছাত্রদের সামনে। তাদের বলেছিলাম "আপনারা রোগগ্রস্ত

ব্যক্তিদের জীবন দান ও আরোগ্য দান করে কত পরিবার, কত বন্ধু-বর্গকে আনন্দ দান করেন। শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আচরণের দ্বারা আপনারা এ কাজ সহজেই করতে পারেন। এই কাজ কারও উপদেশ দ্বারা সাধিত হয় না। আপনাদের দ্বারা কত মহৎ কাজ হয়। উকিল চাতুর্যের প্রয়োগে কারও অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে, কিন্তু জীবন দান করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়। এইজন্য, হে প্রতিভাবান ছাত্রবর্গ! আজ দেশ আপনাদের সেবা চায়— দেশের কাজে আপনাদের সেবার প্রয়োজন আছে।" আমার আশ্রমে কোনও ডাক্তার যোগদান করুক, এই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার এই ব্যাখ্যান হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়েছিল বলে খুব প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্যাখ্যান সমাপ্ত হবার পর আমি চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পেছন দিক থেকে এক যুবক এল। সে কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায়, বলতে পারছিল না। তার দুই বিশালায়ত চক্ষুর ভাব লক্ষ্য করে আনন্দিত হলাম। কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। তারপর আমি তাকে বললাম, "কী, আপনি কি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন? বলুন-না, কী বলবেন?" সে ইংরাজীতে উত্তর দিল, "আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আমি আপনার আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করতে চাই। আপনি কোথায় উঠেছেন? আমি সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

কার্যারম্ভ অথবা স্থাপনা

সেই ছাত্রটি বলল, "যখন আমি হাইস্কুলে পড়তাম, তখন থেকেই আপনার নাম শুনে আসছি। আপনার চিন্তা, বিচার, লেখন, চরিত্র, সব-কিছুই আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। আপনাকে দর্শন করবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল। সে ইচ্ছা আজ পূর্ণ হল।

—আমি আপনার সান্নিধ্যে থেকে আপনার আদর্শে চালিত হতে চাই। কিন্তু আমার মা-বাবা এর জন্য প্রস্তুত ন'ন। গত বৎসর তাঁরা আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বারবার অস্বীকার করায়, এক বৎসরের জন্য তা স্থগিত রাখেন। এখন আবার তাঁরা আমার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছেন। আমি আপনার মতেই দীক্ষিত হতে চাই। আমার ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, আপনার কাছে আসতে চাই। আমার আরও দুই ভাই আছে— তারা আমার মা-বাবার কাছে থাকবে।"

ছেলেটির, খুব বেশী হলে, উনিশ কি বিশ বছর বয়স হবে। ওর কণ্ঠস্বর, ঔৎসুক্য আর উৎসাহ দেখে আমার খুব আনন্দ হল। একজন খুব ভালো সঙ্গী, সহকর্মী, সহমর্মী জুটল। আমি তার বাড়ীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে-ও আমার ভাবধারা, আদর্শ, নব্যপন্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। এক ঘণ্টার বার্তালাপে আমরা পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে গেলাম যে মনে হল যেন আমার কোনও ছেলেবেলার বন্ধুকে অনেক দিন বাদে আজ ফিরে পেলাম। সেদিন আরও অনেক বিদ্যার্থী দেখা করতে এল। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। তারা খুব শীঘ্রই আমার নব্য-পন্থা গ্রহণ করবে এইরূপ আশ্বাস দিল। কিন্তু শুধু এই-সব আশ্বাসে আনন্দিত হবার মতো লোক আমি নই। তাদের অনেক বন্ধু আমাকে আরও কয়েক জায়গায় ভাষণ দেবার জন্য আহ্বান জানাল। আমার নিয়ম এই যে, কেউ ব্যাখ্যান করবার জন্য ডাকলে, না বলতে পারি না। আমি অনেক বিষয়ের ওপর ব্যাখ্যান দিতে লাগলাম। কেউ আমার প্রশংসা করলে, আমি তা কানে তুলতাম না।

এই রকম চলত আমার দিনচর্যার ক্রম। ভোর চারটার সময় উঠে সাড়ে চারটা পর্যন্ত লিখতে বসতাম। 'নব-চেতনা' পত্রিকার জন্য কিছু লেখা লিখতাম। কখনও কখনও ব্যাখ্যান করবার জন্য সমস্ত ভাষণটা লিখে নিয়ে যেতাম। কিছুদিন পরে আমি "রাষ্ট্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ"— এই বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনার জন্য উদ্যোগী হলাম। এইজন্য ঐ বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহে মন দিলাম

ভোর সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বই লেখবার কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এর পর আমি শহরে যেতাম। সাধারণ লোকদের ঘরে ঘরে গিয়ে শিক্ষা বিষয়ে কিছু কিছু উপদেশ দিতাম। প্রায় দশটার সময় খাওয়াদাওয়া সেরে, পাঠ ও আলোচনায় ব্যাপৃত থাকতাম। এতে দু-তিন ঘণ্টা সময় দিয়ে, বিকালে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হতাম। সমস্ত দিনের মধ্যে যে যে কাজ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করতাম। চিঠি ও ডায়ারি লেখার কাজও চলত। এর পর এক ঘণ্টা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হত। প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ আমি শুতে যেতাম। যতদূর সম্ভব এই ভাবে আমার দিনচর্যার ক্রম বজায় রেখে চলেছিলাম। শনিবার ও রবিবার স্কুল, অফিস আর কারখানার ছুটি থাকে বলে প্রচারকার্যের জন্য বাইরে চলে যেতাম। শনিবার দ্বিপ্রহরে স্কুলের ছেলেদের একত্র করে তাদের উপযোগী ব্যায়াম অভ্যাস করাতাম। আমার এই দৈনিক কার্যক্রমের মধ্যে কখনও কোনও ব্যতিক্রম হত না, এমন কথা নয়। তবে সে ব্যতিক্রম খুব গ্রাহ্য করতাম না। 'ভাই'-কে নিয়মিত চিঠি লিখতাম, এবং ওর কার্যে নিয়তই প্রেরণা জোগাতাম। বিনা বেতনে গরিবদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম। সাহুকার আর ব্যাপারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্কুল খোলা হয়েছিল। দু-এক জায়গায় পাঠশালা খুব ভালোভাবেই চলছিল।

এই কাজ তিন বছর পর্যন্ত চলল। ইতিমধ্যে আমার পাঁচজন বন্ধু জুটে গিয়েছিল। প্রথমজন বোম্বাইতে থাকেন— এল. এস. অ্যাণ্ড এস. পরীক্ষা দিয়েই আমার দলে যোগ দেন। তাঁকে তার পিতামাতার কাছ থেকে অনেক ভৎর্সনা, অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তিনি পরে আমার একজন পরম শুভার্থী বন্ধুরূপে গণ্য হলেন। এর পর দুইজন বি. এ. পাস করা ব্যক্তি এসে যোগদান করেন। তারপর একজন ম্যাট্রিক পাস করা ছোকরা এবং কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্র আমাদের দলে যোগ দেয়। আমাদের মধ্যে কোনও মতানৈক্য ছিল না। এই ছয় জনের মধ্যে একজন ভাগবত গীতার

মহাভক্ত। দ্বিতীয় জন বস্তুবাদী। আর-একজন ছিল বৈদান্তিক এবং আরও দুজন। এই ছয়জনে মিলে অনেক বিষয়ে চর্চা করতাম। কিছুদিন বাদে মনে হল আমাদের মঠের জন্য একটা কেন্দ্রস্থল ঠিক করা দরকার। সেখানে একটা আশ্রম থাকবে। এইসঙ্গে এই সংস্থার একটা নামকরণেরও অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এ ছাড়া এই দলটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। আজ পর্যন্ত আমি নাম ও আশ্রমের প্রয়োজন অনুভব করি নি। কিন্তু এখন আমার এ বিশ্বাস হতে আরম্ভ করেছে, যে, আমার পিছনে এমন তিন ব্যক্তি আছেন, যাঁদের পরিশ্রম আর উৎসাহে এই দলটি বেঁচে থাকবে। তার সমূহ উন্নতিও হবে। আর, যতটুকুই হোক, দেশের হিতসাধন করা যাবে, এ বিশ্বাস আমার জন্মাতে লাগল।

একদিন আমার খুব মাথা ধরেছিল। বাইরে না গিয়ে মঠের ভিতরেই লেখাপড়ার কাজ করতে লাগলাম। সে সময় দ্বিপ্রহরের তাপ ছিল বলে বেশি কষ্ট হচ্ছিল। কিছুদিন থেকে আমার শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি কিছু লিখছিলাম, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে রামানন্দ ভিতরে ঢুকে আমাকে বলল, "প্রায় একমাস থেকে ভাবছি, একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলব।" ওর কথায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাপার কি? ও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায় নাকি? ওর মুখ অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল। আমি একটু চুপ করে থাকলাম, মনে সন্দেহ জমে উঠতে লাগল। ওর চারজন বন্ধু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে রামানন্দকে বললাম—"রামানন্দ, আমি যদি কিছু দোষ করে থাকি বা আমার আচরণে যদি কোনও ত্রুটি থাকে, তা হলে আমাকে নির্ভয়ে খুলে বলবে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেন কোন সন্দেহ না থাকে। এরকম ভাবে তুমি তোমার পথ ও আদর্শ ত্যাগ কোরো না। তোমার মনে যা আছে বিনা দ্বিধায় আমাকে বলো।"

আমার কথা শুনে ওর মন আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ থেমে সে বলল, "ভাবানন্দ, আপনার আচরণের ত্রুটি কোন শত্রুও

দেখাতে পারবে না। আমি তো আপনার একজন একনিষ্ঠ শিষ্য। আপনার যদি কোনও দোষ না হয়ে থাকে তা হলে দোষ দেখাব কোথা থেকে? আমি এসেছি, আমাদের সকলের হয়ে, আপনার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমার কাছে প্রার্থনা! রামানন্দ, আমরা সকলে একই পথের পথিক, একই আদর্শের ভক্ত। এর মধ্যে গুরু-শিষ্যের কোনও সম্বন্ধ নেই, উচ্চ-নীচেরও কোন ব্যবধান নেই। এর মধ্যে আবার এ-সব প্রশ্ন কেন আনতে চাচ্ছ? মনের ভিতর যা আছে স্পষ্ট করে খুলে বলো। প্রার্থনা বা মিনতি করবার কোনও প্রয়োজন নেই।"

"ভাবানন্দ, আপনাকে আমরা এই বলতে এসেছি যে আপনি দু-চার মাস পূর্ণ বিশ্রাম নিন।"

খুব আশ্চর্য হয়ে বললাম— "একেবারে পূর্ণ বিশ্রাম! দেখো রামানন্দ, এ পথ আরাম আর বিশ্রামের পথ নয়। বিশ্রাম হবে একেবারে পরলোকে গিয়ে। আমরা যে কার্যে ব্রতী হয়েছি তার আরম্ভই এখনও হয় নি, আর তুমি বিশ্রামের কথা বলছ? ছিঃ ছিঃ, এই শরীরে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ বিশ্রামের কথা মুখে এনো না। আমার আয়ু প্রতি মুহূর্ত নিবেদিত দেশের জন্য। এর মধ্যে যদি কোনও ফাঁকি থাকে, তা হলে প্রত্যবায়ভাগী হতে হবে! নিজের হাতে যেটুকু কাজই করি, তার পরিমাণ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করতে হবে। এই আমাদের কর্তব্য।" এই শেষ কথাটা বলবার সময় আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম এবং কথাটা পুরোপুরি শেষ করবার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

রামানন্দের শুশ্রূষায় আমার জ্ঞান ফিরে এল। যে চারজন বাইরে দাঁড়িয়েছিল তারা ভিতরে এসে গেল। সকলে আমাকে বলতে লাগল— "ভাবানন্দ, কিছু দিন আপনাকে বিশ্রাম নিতেই হবে। আমরা আপনাকে জোর করে বিশ্রাম নেওয়াবই।"

রামানন্দ বলল, "প্রায় দেড় মাস থেকে দেখছি, আপনার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। চোখ দুটো আর চেহারা একেবারে নিস্তেজ

হয়ে গেছে, গলার স্বরও ক্ষীণ হয়ে গেছে— এ-সব কি আপনি খেয়াল করেন নি ? আপনার মতো লোকের জীবনাবসান হয়ে গেলে কার দ্বারা এই মহৎ কার্য সম্পন্ন হবে ? আমরা আপনাকে বাদ দিয়ে কী করে এ কাজ করব ? আপনি আরাম করে বসে থাকুন। যা-কিছু করবার, আমাদের আদেশ করুন। আপনাকে কিন্তু কয়েকদিন বিশ্রাম নিতেই হবে।"

আমি এ-কথা শুনে উপহাস করে হেসে উঠলাম।

অন্ততঃ

রামানন্দ নিজের দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, আর আমি নির্বিকার ভাবে সব শুনে যাচ্ছিলাম। হাসতে হাসতে বললাম— "তুমি যতই বলো-না কেন, আমি তোমার কথা মানতে রাজী নই। মামুলী সর্দিকাশিতে ঘাবড়াবার মতো লোক আমি নই। এই-সব ছোটোখাটো তুচ্ছ বিষয়ে তোমরা ধ্যান দাও বলে সব কাজ নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা এখন যাও, আমাকে নিজের কাজ করতে দাও। কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না, কারণ চারটার সময় আমাকে এক জায়গায় ব্যাখ্যান দিতে যেতে হবে।" এই বলে আমি আমার কাজ শুরু করে দিলাম। রামানন্দের চেহারার মধ্যে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। সে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার এই নির্মম ব্যবহারে সে চুপ করে গেল। পরে সে ধীরভাবে বলল, "আমাকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে আপনার বুকটা পরীক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ আপনাকে বাইরে কোথাও যেতে দেওয়া হবে না।"

"এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ কেন ? আমাকে আমার কাজ করতে দাও। তুমি তোমার কাজ করো। পরে সন্ধ্যাবেলায় সকলের বুক আরাম করে পরীক্ষা করে দেখো।" আমি তাকে হালকা ঠাট্টার সুরে এই কথা বললাম, তার ফলে সে রেগে চলে গেল। বাকি চারজনকে আমি চলে যেতে বললাম।

আমি আমার কাজ শেষ করে ব্যাখ্যান দিতে চলে গেলাম।

কিন্তু ঐ দিন থেকে আমার মনে এই চিন্তা এসেছে যে, আমার সত্যই হয়তো কিছু রোগ হয়েছে। বার বার মাথা ঘুরে যেত। মাথায় বেদনা হত। পূর্বের কর্মোদ্যম ও উৎসাহ কমে যেতে লাগল। তবু আমার কর্তব্য আমি করে যাচ্ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, রামানন্দ রোজ আমার কাছে এসে আমাকে রোগের সম্বন্ধে ভয় দেখাচ্ছে। আমার কল্পনাতেও আসে নি যে আমি কোনোদিন গুরুতর অসুখে পড়ে যাব। ওরা ভেবেছিল যে আমি হয়তো কেবল তাই-এর কথাই মেনে চলতে পারি। এই ভেবে তারা তাই-এর বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। সেই সময় আমার মনের শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং খুব সন্তপ্ত হয়ে বলে উঠলাম, "তোমরা কি এখানে কাজ করতে এসেছ, না কোনও নতুন ভুলের স্বর্গ রচনা করতে এসেছ?" এই কথাটা আমি এত জোরে চেঁচিয়ে বলেছিলাম যে কী বলেছিলাম তা বোধ করবার আগেই আবার মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর কখন আমার জ্ঞান হল, কী চিকিৎসা হল, কোথায় নিয়ে গেল কিছুই জানতে পারি নি।

রামানন্দ-লিখিত সমাচার

"কিন্তু ঐ দিন থেকে আমার শারীরিক দুর্বলতা আর প্রবল ইচ্ছা-শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল।" —এই কথা ভাবানন্দ নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন। এর পরে আত্মকথা লেখবার আর সময় পাওয়া যায় নি। যখন ভাবানন্দের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হল তখন আমি তাঁকে তার ডায়ারি লেখার অনুমতি দিলাম। পরন্তু উনি খুব কম লিখতেন। তিনি আজ পর্যন্ত যা লিখেছেন, তার পরে আত্মকথা লেখবার মতো এমন কোনো ঘটনা নেই যা উল্লেখ করবার যোগ্য। এই রকম লোকের শারীরিক ও মানসিক বল কতদিন পরস্পরের সহায়ক হয়ে থাকবে? বাল্যকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত আত্মকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাঁর

মানসিক শক্তির বহু অপব্যয় হয়েছে। শারীরিক শক্তি যত বেশি থাকুক-না কেন, আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অনুযায়ী এটা ভেবে আশ্চর্য হয়েছি, যে লোকটি নিজের মৃত্যুর আয়োজন এত দ্রুতগতিতে পূর্ণ করে এনেছিলেন, তিনি অতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারলেন কী করে!

যে দিনের ঘটনা তিনি নিজের ডায়ারিতে লিখে রেখেছিলেন সেটা প্রায় তাঁর শেষ অবস্থার চিত্র। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর তিনি ব্যাখ্যান দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁর এই জেদ ছিল, শরীরের অবস্থা যা-ই হোক, তিনি যে কথা দিয়েছিলেন দৈনিক ব্যাখ্যান তিনি দেবেনই, সেটা কখনও ভঙ্গ করবেন না। আমরা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নি। আমি এও বলেছিলাম, আপনার বদলে আমি ব্যাখ্যান দিয়ে আসি, তাও ব্যর্থ হল। শেষে তিনি নিজেই ব্যাখ্যান দেবার জন্য চলে গেলেন। কেবল তাই নয়, এক রুগ্‌ণ শ্রমিকের ঘরে গিয়ে ওষুধ দিয়ে এলেন এবং নিজের শরীরের এই দুরবস্থা একেবারেই গ্রাহ্য না করে রোজ সেই রোগীর ঘরে যেতে লাগলেন। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি আমার সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাঁর সঙ্গে যেতে লাগলাম। এতেও তিনি আপত্তি করলেন। কিন্তু মরিয়া হয়ে তাঁর এ আপত্তি না মানাতে তিনি চুপ করে গেলেন। এই রকম জেদ করে কয়েকবার তিনি ব্যাখ্যান দিয়ে সেই রুগ্‌ণ শ্রমিকের ঘরে গিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে তার সেবা করলেন। এক দিন রাত্রে চিঠি ডাকে দেবার জন্য বাইরে গেলেন। ফেরবার সময় বৃষ্টি শুরু হল এবং তিনি খুব ভিজে বাড়ী ফিরলেন। পরের দিন সকালে তাঁর কথা বলবার মতো অবস্থা ছিল না। পরে, খুব জ্বর এসে গেল এবং গলা একদম বসে গেল। এইজন্য আমি খুব রেগে বললাম— "আজ আমি কোন ক্রমেই আপনাকে ব্যাখ্যান দিতে যেতে দেব না। এই রকম যদি অত্যাচার করতে থাকেন তা হলে শীঘ্রই আপনার দেহান্ত হয়ে যাবে।"

উনি জবাব দিলেন— "তাতে হয়েছে কি? আশ্রমে বসে বসে

ছটফটিয়ে মরার চেয়ে দেশের কাজে শরীরপাত করাটা কী এমন খারাপ কাজ? পাগলা কোথাকার! ব্যাখ্যান দিলে কি লোকে মারা যায়? আজ তো আমার শরীর বেশ ভালোই আছে এবং ব্যাখ্যানের বিষয়ও খুব ভালো। অনেক সব বিদ্বান লোকেরা শুনতে আসবেন। আজ আমি তো চুটিয়ে বলব। তুমি নিজে ডাক্তার বলে সব সময় অশুভ চিন্তা কর। এখন যাও, নিজের কাজ করোগে যাও।"—

এই রকম ভাবে আমার কথা স্রেফ্ উড়িয়ে দিতেন। সেইদিন জানি না তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল। তিনি আমার কথা শুনতে একেবারে রাজী ছিলেন না। আমার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ব্যাখ্যান দিতে গেলেন। ওঁর ব্যাখানের বিষয় ছিল— কি? আমরা কি চিরকাল অবনত থাকব? —ব্যাখ্যান দেবার সময় তাঁর বিশেষ অনুপ্রেরণা এসে গিয়েছিল।

ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য বর্ণনা করবার সময় তাঁর উদ্দীপনা এসে গিয়েছিল। সেইদিন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রোতাদের কাছে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় কিছু দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। স্বপ্নেও ভাবি নি যে এই ব্যাখ্যানই তাঁর শেষ ব্যাখ্যান হবে। সেই দিন ব্যাখ্যান্তে মঠে ফিরে এসে আমি তাঁর অনেক প্রশস্তি করলাম। আমি তাঁকে তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, কারণ তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি আর আপত্তি না করে চুপচাপ ঘরে ফিরে, নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি অবাক হলাম, এত তাড়াতাড়ি আমার অনুরোধ মেনে নিলেন কি করে? নিজের ঘরে গিয়ে শোবার আগে আমি ভাবানন্দের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নিদ্রার প্রসাদে তাঁর ক্লান্ত শরীর সুস্থ হবে, তিনি আরাম পাবেন, এই মনে করে একটু শান্তি পেলাম। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে ঘুম আসার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। সেইদিন ভাবানন্দের বিশেষ ভাবোদ্দীপক ব্যাখ্যান, তাঁর তেজোদ্দীপ্ত

চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, এই দিব্য মূর্তি যদি আমাদের মধ্য থেকে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হয়ে যায় তা হলে আমাদের এই প্রারব্ধ মহৎ কার্যের কী দশা হবে! এই উজ্জ্বল মূর্তিই আমাদের প্রেরণা, আমাদের প্রাণ-স্ফূর্তির উৎস। মধ্যরাত্রে দু-তিনবার তাঁর ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এলাম। দূর থেকে দেখলাম, যেন এই-মাত্র তিনি শান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। রাত তিনটার পর আমার ঘুম এসে গিয়েছিল। সকালে উঠতেই আমি সোজা তাঁর ঘরে চলে গেলাম। তখনও তিনি জেগে ওঠেন নি। কিন্তু তাঁর চেহারা একেবারে নিস্তেজ আর পীত-বর্ণ দেখাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি নাড়ী দেখলাম, এবং স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করলাম। তাঁর বুক পরীক্ষা করবার সময় আমার নিজের বুকও ধড়-ফড় করে উঠল। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র আর ফুস্‌-ফুস্‌ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বুক পরীক্ষা করতে করতে তাঁর পিঠে স্টেথোস্কোপ লাগালাম। তিনি জেগে উঠে হড়বড় করে জোরে বলে উঠলেন—"কে? কে তুমি? কি চাও?" আমি অত্যন্ত বিনীত হয়ে বললাম—'আজ আপনার বুক আর নাড়ী পরীক্ষা করবার দিন ছিল।' আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার, কী রোগ হয়েছে?" আমি চুপ করে থাকলাম। কিন্তু ঐ বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকটি তৎক্ষণাৎ সব ব্যাপার বুঝে ফেলেছিলেন। বললেন "আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এটাই তুমি লুকোবার চেষ্টা করছিলে, তাই না? ওটা লুকিয়ে রাখবার কোনও দরকার নেই— ও তো আমি কবের থেকে জানতাম। ঐ দেখো সামনে টেবিলের ওপর কী রাখা আছে!"

ঐ কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, ভয় পেয়ে গেলাম। উনি বললেন—"তুমি ভয় পেয়ো না। আমি যাবার জন্য তৈরি হয়েছি। আমি যদি আর-কিছুটা কাজ করে যেতে পারতাম তা হলে আরও বেশী আনন্দ পেতাম। কিন্তু তোমার মতো উপযুক্ত কর্মীর হাতে চালাবার দায়িত্ব পড়বে, এই ভেবে, আমার আর কোনও দুঃখ নেই।"

এই-সব কথা যখন হচ্ছিল, তখন আমি টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা খুব বড়ো খাম রাখা ছিল, আর তার পাশে আরও একটা খাম ছিল— বেশ ভারী। খামটা উঠিয়ে দেখলাম আমার নাম তাতে লেখা আছে। ওরই সঙ্গে খুব বড়ো অক্ষরে উপরের কোণে লেখা ছিল—"আমার মৃত্যুর পর যেন পড়া হয়।"

এই দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং এই মহাত্মার অটুট ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে আমি মনে পবিত্রভাব নিয়ে উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এই লেখার কাজ কখন তিনি করলেন— এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই যেন বলে উঠলেন, "আমি প্রায় একটা নাগাদ জেগে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমার মেয়াদ তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। আমার হৃদ্-যন্ত্র খুব তীব্র গতিতে দাপাদাপি করছিল। যখন একটু আরাম বোধ করলাম, তখন হঠাৎ চিঠি লেখবার ইচ্ছা হল। প্রায় সাড়ে চারটা পর্যন্ত চিঠি লিখে ঐ টেবিলের ওপর রাখা খামের মধ্যে পুরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম—মৃত্যু যখনই আসে আসুক, আমি প্রস্তুত!"

মরবার কথা শুনে, আমি সব জেনেশুনেই বললাম—এই রকম মরবার কথা কেন বলছেন! এখনও তো কত কাজ বাকী। সত্য-সত্যই আপনার এমন সাংঘাতিক কিছু হয় নি। কেবল আপনার শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। দু-এক মাস বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এ বিশ্রাম আপনার বোম্বাইতে থেকে হবে না। কালই আপনি কোনও গ্রামে চলে যান। এতদিন আপনার আজ্ঞা পালন করেছি, আজ আমার আজ্ঞা আপনাকে পালন করতেই হবে।

তাঁকে অনেক বোঝানোর পর সমস্ত কথা মেনে নিলেন। বললেন—"যে যা বলবে তা করবার জন্য আমি প্রস্তুত। কিন্তু তোমার আশা ব্যর্থ হবে। আমার ইচ্ছা, আমি যেন কাজ করতে করতেই মৃত্যু বরণ করি। কিন্তু সে ইচ্ছা তুমি পূর্ণ হতে দেবে না।" এই বলে তিনি চুপ করে গেলেন। এত তাড়াতাড়ি সবকথার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, এটা আমরা কেউ ভাবি নি। কিন্তু ওঁর কথায় আরও কিছুর আভাস পেয়ে দুঃখ পেলাম। আমি ভাবলাম, অবশ্য

এর একটা কিছু উপায় করতেই হবে। এই জন্য বোম্বাই ত্যাগের আয়োজন করতে লাগলাম। যে করেই হোক তাঁকে তাঁর জিদ অনুসারে চলতে দেব না। এই মনস্থ করে পরের দিনই তাঁকে নিয়ে এক গ্রামে চলে গেলাম।

আমি তাঁর শরীরের দিকে বিশেষ নজর রাখছিলাম। তবু কখনও কখনও তাঁর বোখ্ চেপে যেত। একটু আরাম বোধ করছেন, শরীর একটু সুস্থ হয়েছে, আর অমনি আশেপাশের চাষীদের ডেকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলেন। দু-চার ঘণ্টা হয়তো রৌদ্রেই বসে রইলেন, কিম্বা এলোমেলো হাওয়ার ভেতর বসে কাশতে শুরু করলেন। কখনও হয়তো ছোটো ছেলেদের একত্র করে কিছু পড়ানো শুরু করে দিতেন। আমি কিছু বলতে গেলে আমার উপর চটে উঠতেন। এই রকম করে, তিনি গ্রামে এসেও যথেষ্ট বিশ্রাম নিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর দুর্বলতা এত বেড়ে যেতে লাগল যে তার ফলে তাঁর চেহারা যেন কেমন অদ্ভুত এক বিচিত্র রূপ ধারণ করতে লাগল।

শেষকালে আমি ঠিক করলাম যে পন্থজী, গংগুতাই, ইত্যাদি পরিবারের সব লোকদের খবর দেওয়া যাক।

রামানন্দের লিখিত সমাচার

আমার চিঠি পেয়েই সেই দিনই সব এখানে চলে এল। ওদের দেখে ভাবানন্দ খুব খুশি হলেন। ওঁর এই অবস্থা দেখে, তাই আর সুন্দরী এত কাঁদল যে তাতে পাথরও গলে যায়। শিবরাম পন্থ ভাবানন্দের কাছে বসে ছিলেন। তাঁর চেহারায় মালিন্যের ছাপ এসে গিয়েছিল। পুত্রের সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসে পিতার অন্তরে যেমন শোক-বহ্নি জ্বলে ওঠে শিবরাম পন্থেরও সেই অবস্থা হল। ভাউরাও—ভাবানন্দ তাঁর পুত্রের সমান নয়, পুত্রই ছিলেন। 'তাই', খুব কাঁদছিল। ভাবানন্দ চুপ করে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে

তাই-এর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন— "তুমি এখানে এসে এরকম কাণ্ড করবে এটা আমি ভাবি নি। আমি ভাবতাম তুমি একজন নির্ভীক ও ধৈর্যশালিনী নারী। তোমাকে তো আরও অনেক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ এখনও অনেক কাজ, অনেক প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।"

"ভাউ··· ভাউ তুমি এরকম কথা বোলো না। তুমি না থাকলে আমারও আর কিছু থাকবে না, ··"

তাই-এর কথা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে, তাঁর কাঁধ ধরে ভাউ বলতে লাগল— "ছি, ছি! তুমি এরকম পাগলের মতো কেন বলছ? তুমি যদি এরকম ধৈর্য হারাও তা হলে লোকেরা তোমাকে নেহাংই অবলা বলবে। ···দাদাজী, আপনার চেহারাই বা এমন হয়েছে কেন?..."

"আপনি একে একটু বোঝাবেন··· আর··· আর ঐ দেখুন ওধারে সু···" আর তিনি বলতে পারলেন না। তিনি সকলকে ধৈর্য দান করছিলেন, কিন্তু এ সময় তাঁর নিজের ধৈর্য ভেঙে গেল। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগ-মন্থর হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে লাগল। এই ভাবে প্রথম দিন সকলের দুঃখে কাটল। পরের দিন আমি ঠিক করলাম, যে করেই হোক ওঁর কাজ বন্ধ করতে হবে। আশেপাশের গ্রামবাসী ও চাষীরা যখন টের পেল যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তখন তাঁর খবর নেবার জন্য দলে দলে আসতে লাগল। ভাবানন্দের বিদ্যা, জ্ঞান, তাঁর ঐহিক সুখ বিসর্জন, সন্ন্যাস গ্রহণ ইত্যাদি সব গুণাবলী সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং গ্রামাঞ্চলে এ-সব কথা তাড়াতাড়ি রটে যায়। ফলে তাঁকে দর্শন করবার জন্য দিনের পর দিন দর্শনার্থীর ভিড় বেড়ে যেতে লাগল। আমি লোকদের ঠেকাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ভাবানন্দ আমার কথা মানেন নি। কোনোদিন বা খুব জ্বর এসে যেত এবং সাত-আট দিন জ্বর লেগে থাকত। আমি রোজ নিয়মিত ওষুধ দিতাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হত না, কারণ তিনি তখনও রোজ পরিশ্রম করতেন। একদিন তো তাঁর জ্বর একশো সাড়ে চার ডিগ্রী উঠল। তবু গ্রাহ্য

না করে বলতেন— 'নবচেতনা'র জন্য প্রবন্ধ লিখতে হবে। কোনও জায়গায় স্কুলের খুব প্রয়োজন আছে, সেখানে স্কুল খোলা উচিত, এইরূপ বিজ্ঞপ্তি দিতেন। এই মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তি সত্যই খুব প্রবল ছিল। আমরা নিজেদের তরফ থেকে খুব চেষ্টা করতাম, কিন্তু অধিক পরিশ্রম করার জন্য তাঁর শারীরিক বল ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছিল। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য পাঁচজন লোক এল। কথায় কথায় একজন বলল, "আপনি সমাজ-সংস্কারক হয়েছেন। যদি তা না হতেন তা হলে এতদিনে আপনি একজন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে পারতেন।" এই কথা শুনতেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন— "উচ্চপদস্থ কর্মচারী! কী, আমার এ পদ কি নিম্ন শ্রেণীর? ধিক্কার আপনাদের! নিজের দেশের সেবক আর ভক্ত হওয়াটা কি উপাধি আর পদের দিক থেকে কম মনে করেন? ছি, ছি, ছি! এ আমারই দুর্ভাগ্য!" এই রকম কথার পরিণাম ক্রোধ আর সন্তাপ। শেষে আমি ঐ লোকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে চলে যেতে বললাম।

ভাবানন্দের ক্রোধাবেশের পরিণাম বিপরীত হল। সেইদিন রাত্রে তাঁর খুব জ্বর এল। জ্বর বৃদ্ধির ফলে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি হল। আমি নিজের তরফ থেকে যা চেষ্টা করবার করলাম, কিন্তু উত্তপ্ত মাথা আর শীতল হল না।

তারপর জ্বরের ঘোরে ভুল বকা শুরু হয়ে গেল। ঐ-সব লোকদের সঙ্গে দুপুরে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল, সেই সবই আওড়াতে লাগলেন অনবরত। এর মাঝে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— "রামানন্দ, তোমার কি মত? তুমি কি রকম করবে? আমাদের এই রকম করতে হবে।"

মাঝে মাঝে উঠে বসতেন এবং তীব্র গতিতে ইংরাজীতে কিছু ভাষণ দেওয়া শুরু করতেন। সেদিন রাত্রে আমরা সকলে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বার বার তাঁর কাছে এসে বসতাম। 'তাই' আর সুন্দরী, দু-জনে দিবারাত্রি ওঁর মাথার কাছে বসে ছিল। আমি তাই-কে অনেক করে বোঝালাম 'আপনি যদি এই রকম ভাবে দিবা-

রাত্র বসে থাকেন তা হলে আপনিও অসুখে পড়ে যাবেন।' 'তাই' উত্তর দিলেন— "আমার কিছু হবে না। যে লোক সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তারই দেখবেন যত অসুখ বিসুখ হবে। আমার মতো অকৃতার্থ, অপ্রয়োজনীয়কে ভগবান একশো বছর বাঁচিয়ে রাখবেন।" ভাবানন্দ তাই-এর সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে শেষ সময়ে 'তাই' খুব পতিসেবা করেছিলেন। কিন্তু আমি বলছি, তার অন্তত চতুর্গুণ সেবা করেছিলেন তাঁর ভাইএর অসুখে। মামাও এসে গিয়েছিলেন। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন "তোমার ঐ আইরিশ দেশভক্তের ভাষণটা মনে আছে? তিনি নিজের ভাষণে দেশের লোকেদের কান খুব ভরিয়ে রেখেছিলেন।" এই বলে তিনি ঐ বিষয়ে সমস্ত তথ্য দ্রুতগতিতে বলা শুরু করে দিলেন। পরে ভীষণ ভাবে হেসে উঠে বললেন— "একেই বলে দেশাত্মবোধ!"— বলেই তিনি দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেলেন। দু-এক মিনিট পরে লংফেলোর এক বিখ্যাত কবিতা খুব জোরে জোরে আবৃত্তি করতে লাগলেন। এই সময়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি বলতে বলতে তিনি ফের ডেকে বললেন— "রামানন্দ, ঐ পঙ্‌ক্তিগুলি শুনিয়ে দাও তো—" এই বলে তিনি নিজেই উঁচু গলায় শোনাতে লাগলেন :

Let us then be up and doing
With a heart for any fate
Still achieving still pursuing
Learn to labour and to wait.

খুব জোরে জোরে এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করার ফলে ওঁর ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। তিনি চুপ করে চোখ খুলে পড়ে থাকলেন। এই-সব ইঙ্গিতের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু মুখে বলতে পারছিলাম না। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, ভাবানন্দ আর বারো ঘণ্টার বেশি বাঁচবেন না। আমরা সকলে তাঁর কাছেই বসেছিলাম।

এক এক ঘণ্টা যেতে লাগল, আর আমার ধড়ফড়ানি বাড়তে লাগল। পরের দিন সকাল ছ'টার মধ্যেই বুঝলাম, আমি যা

ভেবেছিলাম তার ঠিক উল্টোটাই হয়েছে। ভেবেছিলাম সকাল নাগাদ এঁর জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে যাবে। কিন্তু, তা না হয়ে তাঁর বায়ুর উপসর্গ অন্তর্হিত হল। জ্বরও ছেড়ে গেল এবং তাঁর চেহারার মধ্যে একটা প্রসন্নতার আভা দেখা দিল। 'তাই'-কে দেখে তিনি বললেন, "আমি শীঘ্রই তোমাদের ছেড়ে চলে যাব— কোনো ভয় নেই— আজ অথবা কাল পর্যন্ত আমি আছি। বাল্যকালে তোমার প্রতি যদি কোনও অপরাধ করে থাকি, যদি তোমাকে কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি বা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকি, তা হলে আমাকে ক্ষমা কোরো।"

"ভাউ! ভাউ! এ তুমি কী বলছ!" —আর কিছু বলতে পারল না, প্রবল ক্রন্দনাবেগে তাই-এর কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল। ভাউ, শিবরাম পন্থকে নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, "আপনি আমার পিতা। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন! এ ঋণ আমার শোধ করা সম্ভব হয় নি।" এর পর সস্নেহে সুন্দরীর দিকে তাকালেন। সুন্দরীকে যা বলবার তা ঐ দৃষ্টির মধ্যেই সমাহিত ছিল। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে ছিলেন। তারপর, আমি আর তাই বাদে সকলকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। সকলে বাইরে চলে গেলে তিনি আমাকে বললেন "রামানন্দ, এই সংসার ছেড়ে চলে যাবার সময় আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে। এমন দুঃখ আমি কেবল একবারই পেয়েছিলাম, যখন আমি আমার এই কাজ শুরু করব ঠিক করলাম এবং এর জন্য শপথ গ্রহণ করলাম। আমার এই কাজ সম্বন্ধে যা বলবার তা তোমার চিঠিতেই সব লিখে দিয়েছি।" এই কয়টি কথা বলে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। মনে হল এই মহাত্মার জীবনাবসান আর দু-চার ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। এই কথা ভেবে আমি নিজেকে আর ঠেকাতে পারলাম না, চোখ জলে ভরে উঠল। আমি জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম। আর কিছুক্ষণ বাদেই ইনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ওঁর কণ্ঠস্বর, ব্যাখ্যান আর জীবনে শুনতে পাব না। লোক-হিতৈষণা, সাহায্য,

উপদেশ, পরিশ্রম, উৎসাহ, স্ফূর্তি একনিষ্ঠতা— এ সব-কিছুই আর এঁর কাছ থেকে পাব না। ওঁর নাড়ী ধরে বসে থাকলাম এবং বার বার চোখ মুছতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ভাবানন্দের অবস্থা সংকট-পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হলে মানুষের যে অবস্থা হয়, তেমনি এই মহাকর্মী শক্তিমান পুরুষও মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। আমি সাড়া পাবার জন্য ওঁকে জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম। উনি চোখ খোলবার চেষ্টা করতে করতে অতি ক্ষীণ স্বরে বললেন "বলো, কী বলতে চাও ?"

আমি অবশ্য কিছুই বলতে চাই নি, কেবল দেখছিলাম ওঁর জ্ঞান আছে কি না। আমি বললাম, "ভাবানন্দ, এখন আমাদের কী হবে ? আমাদের আশ্রমের কি হবে ?"

আমি ভেবেছিলাম এর উত্তর হয়তো দিতে পারবেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তিনি চোখ খোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং ওঁর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকল।

"আপনি যদি কথা বলতে না পারেন, বলবেন না।" আমার এই কথা বলবার পর দেখলাম ওঁর মুখ দিয়ে কিছু একটা কথা বের হবার চেষ্টা করছিল। আমি তাঁর ঠোঁটের কাছে কান লাগিয়ে শুনলাম-- "একজন চলে গেল তো কী হয়েছে ? এক সৈনিক গেলে তার জায়গায় আর-এক সৈনিক তলোয়ার উঁচিয়ে খাড়া হয়ে যাবে।"

এই তাঁর শেষ কথা। এরপর ছ'ঘণ্টার ভিতর একজন খাঁটি দেশভক্তের আত্মা অনন্তে বিলীন হয়ে গেল!

এর পর

"একজন চলে গেল তো, কী হয়েছে ? এক সৈনিক চলে গেলে তার বদলে আর এক সৈনিক তলোয়ার উঁচিয়ে খাড়া হয়ে যাবে।" —যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সেনাপতি সৈনিকদের এই উপদেশই দেন। এই উপদেশে তাদের উৎসাহ অচলপ্রতিষ্ঠ হয়। নিজের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে তিনি যখন

প্রেরণাদায়ক বাণী দিলেন তখন আমি আমার সহকর্মীদের খুব প্রণিধান সহকারে সেই বাণী শুনতে বললাম। এই ছিল তাঁর শেষ ভাষণ।

ওই বাণী শুনে আমার মানসিক অবস্থা খুবই বিচিত্র হয়ে উঠল। তাঁর মৃত্যুতে মনে নৈরাশ্য ও বৈরাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই পুণ্যাত্মা নিজের জীবনের লক্ষ্য ও আশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। তাঁর শেষ বাণী কত অর্থবহ, কত উদার ছিল! আমার আর আমার সঙ্গীদের মনের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হয়েছিল, বলা যায় না। ওই মহাত্মা চলে গেছেন কিন্তু তাঁর অমোঘ বাণী মিশে গেছে আমাদের আত্মায়। তাঁর অমোঘ বাণী আমার মনে ধৈর্য এনে দিয়েছিল। অঙ্গীকৃত লক্ষ্যের সামনে একলা কেউ কিছু করতে পারে না। এরকম অনেক সৈনিককে প্রাণপণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। এই-সব চিন্তা আমার মনের মধ্যে আসার পর আমার শোকাবেগ ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল।

ভাউএর মৃত্যুর জন্য তাঁর পরিবারের সকলে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। তাদের সান্ত্বনা দেওয়া আমার কর্তব্য হয়ে পড়ল। তাই-কে শান্ত রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। দাদা পন্থজীকে উপরে উপরে শান্ত দেখালেও, ভিতরে তিনি শোকের আগুনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি সমুদ্রের অতল প্রশান্তি নিয়ে স্থির হয়ে বসেছিলেন। তাঁর কন্যা সেই সময় ওখান থেকে উঠে ভিতরে চলে গেল। তার মনের ভিতর যে কী হচ্ছিল একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। এটা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় সুন্দরীর দুঃখের পরিমাণ, তাই বা দাদাজীর থেকে অন্তত হাজার গুণ বেশি হয়েছিল।

ভাউ-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শান্তিপূর্বক হয়ে গেল। আশে-পাশের গ্রামে মৃত্যুসংবাদ দেরিতে পৌছেছিল। তবু এই উপলক্ষে সব গ্রামবাসী তাদের পরম পূজ্যকে শেষ দর্শন করতে এসেছিল। সকলে তাঁর গুণগান করছিল এবং তাঁর তিরোধানে শোকাহত হয়েছিল। দু-তিন দিন বাদে শোকাবেগ কিছু প্রশমিত হল। অন্যান্য বিষয় চিন্তা করবার জন্য মানসিক স্থৈর্য ফিরে এল। এই দুই-তিন দিনের মধ্যে

কয়েকবার ভাবানন্দের লিখিত পত্র পড়ে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু এই ইচ্ছা সম্বরণ করেছিলাম এই ভেবে যে পত্রটি 'তাই', দাদাজী আর সুন্দরীর সামনে পড়া হবে। দু-তিন বাদে নিজের কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু আর দাদাজীকে ডেকে এনে খামদুটি দেখাব। খুব সম্ভব চিঠির ভেতর, ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থা, আশ্রমের উন্নতি সাধন কি ভাবে করা যায়, এই-সব বিষয়ে লেখা আছে। সেই কারণে আমি ঐ চিঠি পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম। 'তাই' আর সুন্দরীকে ডেকে এনে আমরা সকলে দুঃখভারাক্রান্ত মনে বসে রইলাম। এই-সমস্ত দৃশ্য দেখে, এতক্ষণ ধরে চিঠি খুলে দেখার আগ্রহ, অল্পক্ষণের ভিতর চলে গেল। কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোচ্ছিল না। সকলে ঘাড় ঝুঁকিয়ে ভাবানন্দের প্রতি মূক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছিল। ঐ খামটি নেবার জন্য আমার হাত উঠছিল না। কিন্তু এরকম অবস্থায় কতক্ষণ আর থাকতে পারি? নিজের শোক সংবরণ করে ভারী খামটা উঠিয়ে নিলাম। আমার আঙুলগুলি কাঁপছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম এই চিঠিতে আমাদের আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে।

আমি খামটা খুলে দেখলাম— ওর মধ্যে তিনটা আলাদা চিঠি ছিল। প্রথম চিঠি আমার নামে লেখা, দ্বিতীয়টি তাই-এর নামে। প্রথম দুটো চিঠির ওপরকার নাম দেখে আশ্চর্য হই নি। কিন্তু সুন্দরীর নামে চিঠি দেখে আশ্চর্য হলাম এবং দেখতে পেলাম, সুন্দরীও আশ্চর্য হয়ে গেছে। আমি কোনো কথা না বলে ঐ তিনটে চিঠি নিয়ে, আমার নিজেরটা আমার কোলে রেখে তাই-এর চিঠি তাই-এর হাতে দিলাম এবং সুন্দরীরটা সুন্দরীকে দিলাম— চিঠিটা নেবার সময় তার চোখে অশ্রুধারা বইতে লাগল। সে তার কম্পমান হাতে চিঠিটা নিয়ে তার পিতার কাছে রেখে দিল। তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বললেন, "তুমি নির্জনে কোথাও গিয়ে চিঠিটা পড়ে নিয়ো, আমাকে দেখাবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি জানি চিঠিতে দোষাবহ কিছু নেই।" এরপর আর কিছু বলতে পারলেন না। নিজের শোক সংবরণ করে চিঠিটা খুলে মনে মনে পড়তে লাগলেন। ওদিকে

তাই-ও তার চিঠি খুলে পড়া আরম্ভ করল। সুন্দরী তার নিজের চিঠি খুলল না।

চিঠি পড়বার সময় বার বার আমার চোখে জল এসে অক্ষরগুলো ঝাপসা করে দিচ্ছিল। একবার সমস্ত চিঠিটা পড়ে, চোখ মুছে সকলকে শোনাবার জন্য পড়তে লাগলাম—

"শ্রী

অশেষ আশীর্বাদসহ— রামানন্দ, এখন, আর খুব অল্প দিনের জন্য এই পৃথিবীতে থাকব— এটা তুমি জানো। আমার উৎসাহের আমার শক্তির— আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তির আজ পর্যন্ত যা ব্যয় হয়েছে, তাতে বেশীদিন আর আমি বাঁচব না। বিশ্রাম নেবার জন্য অনেকদিন থেকে আমাকে অনুরোধ উপরোধ করেছ, কিন্তু, প্রিয় বন্ধু, আমি বিশ্রাম নিলেও আমার আয়ুর মেয়াদ বাড়ত না। এই চিঠির সঙ্গে যে কাগজ আলাদা ভাবে জুড়ে দেওয়া আছে, তাতে আমার সমস্ত জীবন-চরিত লেখা আছে। তোমরা অনেকবার আমার জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলে, কিন্তু আমি তোমাদের কিছু বলি নি, কারণ, আমি চাই না যে অন্য কেউ আমার জীবনী লিখুক। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ লিখতে বসলে, তা পক্ষপাতদুষ্ট হবে। কারণ তোমরা আমাকে ভালোবাসো। এবং যে আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী সে যদি লিখতে বসে সেটাও বিপরীতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হবে। যাতে এরকম কিছু না হয়, সেজন্য কয়েকমাস থেকে নিজেই নিজের জীবন-চরিত লেখা আরম্ভ করেছিলাম। বস্তুত এটা আমি লিখতে চাইছিলাম না। কিন্তু তোমরা অনেকেই আমাকে বহুবার এ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়েছিলে, তাই আমি লিখতে বসেছি। আমার এই জীবন-চরিত তোমার হাতেই সঁপে দিলাম, তবে এক শর্তে— তোমরা কেউ আমার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের মধ্যে এই জীবন-চরিত প্রকাশ করতে পারবে না। আমি যে বীজ বপন করেছি, সেটা যদি অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয় তা হলে খুবই ভালো।

তুমি ও তোমার বন্ধুবর্গ যদি মনে করেন এই পরিস্থিতিতে আমার জীবন-চরিত সকলেই জানুক, সকলে পড়ুক, সকলে এ সম্বন্ধে

আগ্রহান্বিত হয়ে উঠুক, এবং আমার মৃত্যুর বারো বছর পর যদি এই পরিস্থিতি আসে, তবেই এই জীবনী প্রকাশ করতে পারবে এবং এর সমস্ত স্বত্ব তোমাকেই সমর্পণ করলাম। আমি গত হবার কয়েক বছর পরে আমার আশ্রমের যদি অবনতি ঘটে, যদি এই কাজে কোনও সহায়ক না জোটে, তা হলে নিঃসঙ্কোচে আমার জীবন-চরিত পুড়িয়ে ফেলবে। নিজের কার্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করতে আমি অক্ষম, তবে আমার ইচ্ছা, আমার এ যোজনার যেন অগ্রগতি হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার এ কাজ বিনষ্ট হবে না। কিন্তু ধরো যদি নিজের সমস্ত প্রযত্ন সত্যই ধ্বংস হয়ে যায়? এইজন্য আমি চাই না আমার জীবনী, আশ্রমবাসী ও আমার পরিবারবর্গের লোকেরা ছাড়া আর কেউ দেখে। আমি যে ভাবে লিখেছি আমার বিশ্বাস তুমিও সেই ভাবেই তা মেনে নেবে। এই খামের মধ্যে আর একটা খাম পাওয়া যাবে। এই খামটা কার? কী আছে এর মধ্যে? ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য আমার জীবন-চরিত পড়বার পর জানতে পারবে। সেটা জানা হয়ে গেলে এই খামটা তাই-কে দিয়ে দেবে'।

বড় খামটার মধ্যে "রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি" বিষয়ে এক প্রবন্ধ আছে। এটা আমার এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ লিখতে আমার কয়েক বছর লেগে গেছে। আমার তিরোধানের পর যত শীঘ্র সম্ভব এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হোক, এই আমার ইচ্ছা, কারণ যে পথ অবলম্বন করেছিলাম তার সমর্থন এই লেখায় পাওয়া যাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য নূতন চিন্তাধারা, নূতন বিচারের সহায়তা আবশ্যক। পরে আমাদের যে সংগ্রাম করতে হবে তা কামান-গোলা-গুলি দিয়ে নয়। সে সংগ্রাম হবে বুদ্ধি, বিচার দিয়ে। আমাদের শত্রু অন্যায়কারী রাজ নয়, আমাদের শত্রু অজ্ঞতা। এই শত্রুকে জয় করতে হলে চাই জ্ঞানের প্রচার। এইজন্য আমাকে জ্ঞানী হতে হবে। অজ্ঞানকে সজ্ঞান করবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমি যা-কিছু ইতিহাস পড়েছি, তাতে জানতে পেরেছি যে জ্ঞানের বলেই জগতের অগ্রগতি হচ্ছে। এক সময় ছিল যখন জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল আমাদের এই আর্যভূমি।

তারপর মিশরে জ্ঞানের প্রসার হয়, তারপর হয় রোমে। ক্রমশ ফ্রান্স জার্মানী ইংলণ্ড আমেরিকা জ্ঞানে অগ্রগণ্য হল। কালচক্র অনুসারে জ্ঞানের দ্বারা স্থানের পরিবর্তন হয়, সে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। জ্ঞান অবিনাশী, জ্ঞান বৃদ্ধি-শীল! যে দেশের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, সে দেশের ঐশ্বর্যও নষ্ট হয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমার তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছি। এইজন্য আমি বলছি, এই গ্রন্থ অবিলম্বে প্রকাশিত করো। এই গ্রন্থ থেকে অনেক উপকার হবে।

আমার চিন্তাধারা লোকেদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করা আমার কর্তব্য এবং তা করলেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।

এখন তৃতীয় কথা ব্যক্ত করছি— নিজের আশ্রম সম্বন্ধে। আমার পরে আমি এই কাজ তোমার হাতেই সঁপে দিচ্ছি। দেশের কল্যাণের জন্য নিজের দেহমন প্রাণ অর্পণ করো। শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক ততটুকু সময় ব্যয় করে বাকি সময়টা কোনও মহৎ-কার্যে নিয়োজিত করো। ব্যস্, আমি এই তোমাদের কাছে প্রার্থনা করি। তুমি ভাবীকালের জনক। নিজের দায়িত্ব নিজে বুঝে নাও।

যদি তোমার প্রচেষ্টা বিফলও হয় তবু নিরাশ হয়ে এই মহৎ কার্য ছেড়ে দেবে না। রামানন্দ, এই মহৎ কার্য পাঁচ দশ বছরেও পুরো হবার নয়। যেমন কৃষিকার্যে জমির ফসল বাড়ানোর জন্য মাটির কর্ষণ আবশ্যক, তাতে সারের ও জলের প্রয়োগ দরকার তেমনি আমাদের এই মহৎ কার্যের কর্মীদের এই প্রযত্ন, সারেরই সমান। ফল পাবার জন্য অনেক কর্মীদের পরিশ্রম ও তাদের আয়ুষ্কাল খাদ-রূপে ঢালতে হয় কর্মক্ষেত্রে। আমাদের রাষ্ট্রভূমি আজ অনেক দিন থেকে অকর্ষিত পড়ে রয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র এই অকর্ষিত জমির থেকেই তাদের আয়ের সংস্থান করে নিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ফসল উৎপা-দনের জন্য কয়েক পুরুষের প্রযত্নের আবশ্যকতা আছে! বন্ধুগণ! তোমাদের শতশত জীবন এই কার্যে উৎসর্গ করলে তবেই এই কর্মযজ্ঞ সফল হবে। আমাদের এই প্রযত্নের ফল ভাবীকালের হাতে যাবে। সেইজন্য সুষ্ঠু ফলের আশায় আজ পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে এবং

এই প্রয়াস আমাদের কর্তব্য। এই প্রয়াসের ফল অবশ্য পাওয়া যাবে কিন্তু সেটা আমরা পাব না, পাবে আগামী যুগের লোকেরা। এইজন্য পরিশ্রম করে যাও।

এই পত্রে মুখ্যত তোমাদের আত্মত্যাগের কথাই লিখেছি। আত্মত্যাগের আদর্শ ছাড়া কোনো ব্যক্তি যেন এ পথে না আসেন। যে পারিবারিক মোহে জড়িয়ে পড়েছে, তার কাছ থেকে কোনও বড়ো কাজ আশা করা বৃথা। রামানন্দ, তুমি আত্মত্যাগ করেছ, পিতা-মাতার স্নেহের বন্ধন ছেড়ে এই পথ বেছে নিয়েছ; সেইজন্য এই পথের মহত্ত্বের কথা তোমাকে আর কি বলব? কেবল এইটুকুই বলতে চাই, পিতা-মাতার বন্ধনের চেয়েও আর এক সূক্ষ্ম বন্ধন আছে। তাকে ছিঁড়তে গেলে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সেই বন্ধন ছিন্ন করে এই কার্যে ব্রতী হয় তার কাজ অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আমাদের মঠে যত বেশী অবিবাহিত কুমারের সমাগম হবে ততই এটা কার্যশীল থাকবে। তরুণেরা আমাদের এই কার্যের বুনিয়াদ।

এই রকমভাবে এই কার্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ বানাতে সচেষ্ট হও। পরমার্থ কাকে বলব? নিজের দেশের সর্বদা হিতসাধনই পরমার্থ। মোক্ষ কাকে বলব? নিজের দেশকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাই আমাদের মোক্ষ। এই দুই মহান উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য নিয়ত শ্রম করে যাওয়া আমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। রামানন্দ, নৃসিংহানন্দ এবং অন্যান্য বন্ধুগণ— এই আমার শেষ পত্র। আর কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত জীবিত থাকব কিন্তু আমার আত্মা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যদি সত্যই তোমরা আমাকে স্নেহ করো, তা হলে এই মঠ সম্প্রদায় আমার স্মৃতিরক্ষার্থে খুব ভালোভাবেই চালাবে। জ্ঞানের প্রচার করো, দরিদ্রের কাছে গিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জেনে নাও। এই কাজ সম্পাদন করার সময় যদি তোমাকে কারাবরণ করতে হয় বা হীন অপবাদ শুনতে হয়, তবু ধৈর্য ধারণ করবে। জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করায় আসে সত্যিকারের যুদ্ধ-বিরোধ। সেটাই আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষার সময়।

আমার দুঃখ এই যে আমি এই পরীক্ষার সময় থাকব না। তোমাদের আমি নিরুৎসাহ করবার জন্য এই-সব বলছি না। তোমাদের ধৈর্যের আগুন হাওয়ার সাহায্যে যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবং চারিদিকে এই অগ্নিশিখার উত্তাপ জ্বলে ওঠে। এক রকমের কুসংস্কার আছে যে, যদি কোনও জলাশয়ের জল বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও শুকিয়ে যায় তখন লোকে ভাবে এ-সব ভূত-পিশাচের কাণ্ড। তখন সেই ভূতকে প্রসন্ন করার জন্য কোনও পুণ্যাত্মাকে বলি দেওয়া হয়। কাজ সফল করার জন্য লোক-নিন্দা ও স্বার্থ এই দুটোকে আগে বলি দেওয়া দরকার।

এইটুকু বলাই আমার যথেষ্ট। যখন তোমরা আমার এই চিঠি পড়বে তখন আমি এই পৃথিবীতে থাকব না। আমার স্মৃতিই কেবল তোমাদের কাছে থাকবে। আমার স্মরণ যেন সর্বদা তোমাদের কাছে থাকে, এই আমার শেষ প্রার্থনা।"

আমরা এই পত্রকে ধর্মগ্রন্থরূপে মানতাম। তাঁর আদেশ আমাদের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে গেছে। ভাবানন্দকে আমরা নেতারূপেই মানতাম। কিন্তু আজ তিনি আমাদের ধর্মগুরু। পরম-গুরুরূপে প্রতিভাত হতে লাগলেন। আমরা এই পত্রকে ধর্মগ্রন্থ রূপে মেনে পরম ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের কাজ সম্পাদন করে যেতে লাগলাম। সত্যকে সাথী করে আমি এই-সব লিখছি। আজ আমাদের মঠ প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। আজ অনেক বছর হয়ে গেল, আমাদের মঠের পাঁচটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। ভাবানন্দ যে-সব সমস্যার কথা বলেছিলেন, সে-সব সমস্যা আমরা উপলব্ধি করেছি। আমাদের আশ্রমবাসীদের লোকনিন্দাজনিত অপমান সহ্য করতে হয়েছে। অনেকে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে। কেউ বা আশ্রম ত্যাগ করেছে। এ সবই অবশ্য আশ্রমের মঙ্গলের কারণ হয়েছিল। ভাবানন্দ বারো বছরের যে শর্ত দিয়েছিলেন তাঁর জীবন-চরিত প্রকাশের, সে বারো বছর পূর্ণ হয়েছে। তার পরেও আরও কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমাদের আশ্রমের উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই দেখে তাঁর জীবন-চরিত প্রকাশিত

করেছি। এই জীবন-চরিত ভাবানন্দের মতো বিনয়ী ও সংযমী ব্যক্তি লিখেছেন। এর মধ্যে আত্মপ্রশংসার অতিশয়োক্তি নেই। বরঞ্চ যেখান থেকে ভাবানন্দের কার্যকলাপ শুরু হচ্ছে, অর্থাৎ তাঁর জীবনী শুরু হচ্ছে, সেখান থেকে— পাছে আত্মস্তুতি বেশী হয়ে পড়ে, বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। মনে হচ্ছিল কোথাও কোথাও পাদটীকা দিয়ে তাঁর কার্যের বিশদ বর্ণনা করি। কিন্তু পরে ভাবলাম, এটা হয়তো করা উচিত হবে না। ভাবানন্দ এমন একটা মানুষ ছিলেন যিনি সব-কিছু নিজে করে দেখিয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনই তার উদাহরণ— যে চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে পারি—

"Behold the man !"